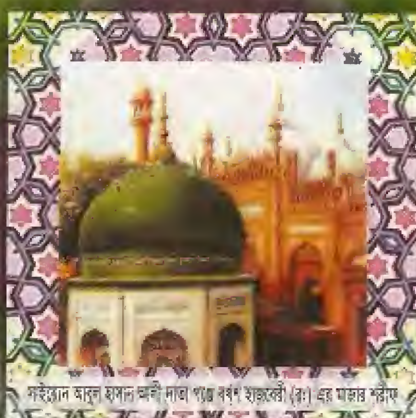
كشف المحجوب

কাশফুল মাহজুব

[মারেফতের মর্মকথা]

মূলঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখশ হাজবেরী (রঃ)



বঙ্গানুবাদ : সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- মারেফতের গোপন ভেদ
- মেশকাতুল আনওয়ার
- সিরাতুল মুস্তাকিম
- সিররুল আসরার
- ক্বিসতাসুল মুস্তাক্বীম
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ
- সূফীবাদের মর্ম বাণী
- কাসীদাতুল গাওসীয়া
- মালফুজাতে গাওসুল আযম
- আনিসুল আরোয়া
- কেয়ামত অতি নিকটবর্তী
- আল মুনকিজু মিনাদ্দালাল
- কাউলুল জামিল
- রাহাতিল মুহিব্বিন
- ফাওয়ায়েদুল ফোহাদ
- রাহাতিল কুলুব
- কাসীদা-এ-বোরদা
- তালিমে মারেফত
- খাইরুল মাজালিস
- মিনহাজুল আবেদীন
- মাকতুবাত শরীফ
- কাশফ ও কারামত
- মুমিনের জিন্দেগী
- ফতওয়ায়ে হাফতে মাসয়ালা
- সৃষ্টির রহস্য
- জা-আল হক



রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১



ISBN : 984-8604-21-0

كشف المحجوب

কাশফুল মাহজুব

মূল

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী দাতা গঞ্জে বখ্‌শ হাজবেরী (র)

বঙ্গানুবাদ

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
[বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক]

প্রকাশনায়

রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

কাশফুল মাহজুব

অনুবাদক
সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
☎ 0174 10 10 457

প্রকাশক
আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০ ☎ 01913-493311

প্রকাশকাল
১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং

হাদিয়া ঃ ৩২০ (তিনশত বিশ) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
জে. পি. কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে
আল-আকাবা প্রিন্টার্স, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার
রাজশাহী

ছালেহীন প্রকাশনী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

দেওয়ান স্টোর
বড় মসজিদ রোড, টাঙ্গাইল

বইমেলা
কুষ্টিয়া

এছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

Kasful Mahzub: Translated by Sufi Muhammad Iqbal Hossain Qadri in Bengali & Published by Rashid Book House, 6, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka- 1100, Bangladesh.

সূচির পাতা

সূচির পাতা

সূচির পাতা

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ (র)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ (র)-এর পুরো নাম শাইখ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী হাজবিরী। কিন্তু সাধারণভাবে তিনি 'গঞ্জে বখশ' ও 'দাতা গঞ্জে বখ্‌শ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৪০০ হিজরিতে গজনি শহরের সন্নিকটে হাজবীর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ উসমান জালাবী (র)। গজনির নিকটবর্তী অন্য একটি গ্রামের নাম জালাব, যেখানে হজরত সাইয়্যেদ উসমান (র) বসবাস করতেন। হজরত আলী হাজবিরী (র) হজরত ইমাম হাসান (রা)-এর বংশধর ছিলেন।

হজরত আলী হাজবিরী তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত ওলামা ও মাশায়েখের কাছ থেকে ইলমে শরীয়াত ও মারিফাত শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্য হতে হজরত শাইখ আবুল আব্বাস আশকানী (র), শাইখ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনুল মিসবাহ সঈদলানী (র), শাইখ আবুল কাসিম আবদুল করীম ইবনে হাওয়াযিন আল-কুশাইরী (র), শাইখ আবুল কাসিম ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-গুরগানী (র), আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-মারাফ দাস্তানী বুস্তামী (র), আবু সাঈদ ফাজলুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ মুহাইনী (র) এবং আবূ আহমদ মুজাফ্‌ফর ইবনে আহমদ ইবনে হামদান (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মারেফাতের দীক্ষা

হজরত শাইখ আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে হাসান খাত্তালী (র) তাঁর ইলমে মারেফাতে মুরশিদ ছিলেন। স্বীয় মুরশিদের জীবন কাহিনি বর্ণনা করে হজরত আলী হাজবিরী (র) বলেন, তিনি তাফসীর, হাদীস ও তাসাউফ তিনটি বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন। তাসাউফ-এ তিনি হজরত জুনাইদ (র)-এর

অনুসারী ও হজরত শাইখ হাজরামী (র)-এর মুরিদ ছিলেন। ষাট বছর অবধি তিনি জনসমাজ থেকে দূরে পাহাড়ে ইবাদতের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। একবার আমি তাঁকে উজু করার সময় তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন আমার মনে এ খেয়াল উদয় হয় যে, আমি একটি স্বাধীন লোক, তবে কেন আমি একজন গোলামের ন্যায় তাঁর পায়ে পানি ঢেলে দিব? এ সময় আমার পীর মুরশিদ বললেন, প্রিয় বৎস! তোমার মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা জানি। তবে জেনে রেখ যে, কোন কাজের সফলতার জন্য একটি মাধ্যম প্রয়োজন হয়। এ খেদমত মানুষের বুযর্গীর কারণ হয়ে যেতে পারে। এটাও খেয়াল রেখ যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে একজন সিপাহীর পুত্রকেও বাদশাহীর মুকুট দান করতে সক্ষম।

আধ্যাত্মিক ও রূহানী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে হজরত আলী হাজবিরী (র) সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, কোহিস্তান, আজারবাইজান, তিবরিস্তান, খুজিস্তান, কিরমান, খোরাসান, তুর্কিস্থান এবং অন্যান্য বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। এ সমস্ত দেশের অনেক বুযুর্গের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁদের খেদমতে থেকে রূহানী দীক্ষা হাসিল করেছেন। খোরাসানেই তিনি তিনশ মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আমি খোরাসানে এরূপ তিনশ বুযুর্গ দেখেছি, যাঁদের একজনই দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট।

হজরত আলী হাজবিরী বলেছেন: আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সর্ব অবস্থায় ইলমে শরীয়তের অনুসারী হতে হবে। কারণ, সুলতানে ইলম সুলতানের হালের উপর জয়ী এবং তার থেকে উত্তম হয়ে থাকে। তিনি চল্লিশ বছর ক্রমাগত বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। তথাপি কখনও জামায়াতে নামায আদায় করা ত্যাগ করেননি এবং প্রত্যেক জুমুআর নামাযের দিন কোন শহরে অবস্থান করতেন। যখন জনসমাজে আসতেন, সাধারণ মানুষের মতো চলতেন। সুফিদের বাহ্যিক আচার-আচারণ থেকে তিনি স্বীয় মুরর্শিদের ন্যায় দূরে থাকতেন।

লাহোর আগমন ও অবস্থান

হজরত আলী হাজবিরী (র) স্বীয় মুরশিদের নির্দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদ গজনির পুত্র নাসিরুদ্দীন মাসউদের শাসন আমলে ১০৩০-১০৪০খ্রি: মোতাবেক ৪২১-৪৩২ হি: লাহোর আগমন করেন। এর পূর্বে তাঁর পীরভাই হোসাইন যানজানী এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এজন্য যখন তাঁকে লাহোর গমনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি স্বীয় মুর্শিদের কাছে আরজ করলেন যে, সেখানে হোসাইন যানজানী অবস্থান করছেন। সুতরাং সেখানে আমার যাওয়ার কী প্রয়োজন রয়েছে? তাঁর শায়েখ বললেন, না, তোমাকে সেখানে যেতে হবে। হজরত আলী হাজবিরী (র) বলেন, আমি রাতে লাহোর পৌঁছি এবং ভোরে দেখতে পেলাম যে, হোসাইন যানজানীর জানাযা শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছেন। তবে লাহোরেই ছিল তাঁর প্রধান কেন্দ্র।

অবশেষে ৪৬৫ হিজরিতে তিনি লাহোরেই বেসাল প্রাপ্ত হন এবং এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়–

اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْـهِ رَاجِعُوْنَ –

নাসিরুদ্দীন মাসউদের পুত্র জহিরুদ্দৌলাহ তাঁর মাজার তৈরি করেন এবং তাঁর খানকাহ বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবর (১৫৫৫-১৬০৫ খ্রি: মোতাবেক ৯৬৩-১০১৪হি:) নির্মাণ করেন। খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী আজমিরি (র) এবং খাজা ফরিদউদ্দীন গঞ্জে শকর (র) ফয়েজ ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর মাজারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছেন।

হজরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী (র) চিল্লা শেষে রওয়ানা হওয়ার কালে এই কবিতা আবৃত্তি করেন–

گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا
ناقصاں را پیرکامل، کاملاں را رهنما

দানের ভাণ্ডার বিশ্বের আশীর্বাদ প্রভুর নূরের আধার।
অসম্পূর্ণকে পূর্ণতা দানকারী ও পূর্ণতা লাভকারীর পথপ্রদর্শক।

তখন থেকে হজরত আলী হাজবিরী (র) গঞ্জে বখ্শ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

রচনাবলি

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্শ (র) নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। কিন্তু এখন কাশফুল মাহ্জুব ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ক. কাশফুল মাহজুব; খ. মিনহাজুদ্দীন; গ. আর-রিআইয়াতু লিহুকুকিল্লাহ; ঘ. কিতাবুল ফানা ওয়াল বাকা; ঙ. আসরারুল ফারক ওয়াল মুনাত; চ. বাহারুল কুলুব; ছ. কিতাবুল বয়ান লিআহলিল আয়ান।

কাশফুল মাহজুব প্রণয়নের কারণ

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্শ (র) কাশফুল মাহজুব গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে বলেন, গজনির আবূ সাঈদ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি গ্রন্থ লেখার অনুরোধ করেন।

ক. তাসাউফের তরিকার গবেষণা;
খ. তাসাউফের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা;
গ. তাসাউফের বিভিন্ন মাযহাব ও তার বর্ণনা;
ঘ. তাসাউফের রহস্য আলোচনা;
ঙ. আল্লাহ তায়ালার মহব্বত এবং এর প্রতিক্রিয়া কিভাবে অন্তরে স্থায়ী হয়;
চ. মানুষের জ্ঞান কেন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের রহস্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় না;
ছ. আল্লাহ তায়ালার হাকিকত থেকে মানুষের নফসের মুখ ফিরিয়ে থাকা এবং আত্মা তার গুণাবলীর সাথে কেন শান্তি লাভ করে।

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্শ (র) বলেন: আমি এ প্রশ্নাবলির মাঝে ইখলাস, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সত্য অনুসন্ধানের বিষয়টি অনুভব করি। ফলে এ গ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ করি। এ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন–

"পেশাদার ও পথভ্রষ্ট সুফির আধিক্যের দরুন সত্যপথের অনুসন্ধানকারীদের সঠিক পথ নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের যুগে ইলমে হাকিকত, বিশেষত আমাদের দেশে এর চর্চা কম হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ স্বীয় নফসের অনুসরণ করে থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কাজেই আলিম, আরিফ ও পথভ্রষ্ট লোকদের আল্লাহর পথের সন্ধান দেওয়ার লক্ষ্যে এ রচনা কাজে অগ্রসর হয়েছি। অবশ্য এই বিরাট কাজ শুরু করার পূর্বে ইস্তেখারা করেছি এবং আমার অন্তর থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বস্তুগত স্বার্থ, তথা পার্থিব সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যকে মিটিয়ে দিয়েছি।"

নামকরণ

হজরত দাতা গঞ্জে বখ্শ (র) বলেন: "আমি এই কিতাবের নাম **কাশফুল মাহজুব** এই জন্য রেখেছি যে, যাতে গ্রন্থের নামে এর বিষয়বস্তু পাঠকবৃন্দ অনুধাবন করতে পারেন। বিশেষ করে, যেহেতু এই কিতাব আল্লাহর পথের বর্ণনা এবং মানুষের সামনের আল্লাহপ্রাপ্তির অন্তরায় রূপ পর্দা দূর করার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে, এ কারণে এ গ্রন্থের নাম **কাশফুল মাহজুব** রাখা হয়েছে।"

কাশফুল মাহজুব সম্পর্কে ওলীগণের মতামত

সর্বযুগে **কাশফুল মাহজুব** গ্রন্থকে ইলমে তরিকতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে মান্য করা হয়েছে।

১. হজরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (র) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন: যে ব্যক্তির কোন মুরশিদ নেই **কাশফুল মাহজুব** পাঠের মাধ্যমে সে তা পেয়ে যাবে।

২. মোল্লা জামি (র) বলেন: **কাশফুল মাহজুব** ইলমে তরিকতের প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব। এ কিতাবে ইলমে তরীকত ও মারেফাতের সমস্ত রহস্য জমা করা হয়েছে।

৩. দারাশিকো এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন: হজরত আলী হাজবিরী (র) একজন কামিল মুরশিদ ছিলেন এবং **কাশফুল মাহজুব** তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে কারো কোন সমালোচনা নেই।

৪. হজরত শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী (র) তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে **কাশফুল মাহজুব** গ্রন্থের উদ্ধিতি দিয়েছেন।

৫. হজরত জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানি (র) তাঁর মালফুজাতের বহু স্থানে **কাশফুল মাহজুব**-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহ এবং নিয়তের পরিশুদ্ধতা

আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা যেন বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করে প্রতিটি কাজ শুরু করি। কেননা কাজের পরিণতি স্বীয় ইচ্ছা এবং চেষ্টার উপর নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্য দ্বারা হয়ে থাকে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল ও তার অনুসারীদের উদ্দেশে বলেছেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ –

"যখন তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সূরা: আন্-নাহল– ৯৮)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন এবং সূরা বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা শিক্ষা দিয়েছেন। হুজুর ﷺ ও তার অনুসারীদের– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে কাজ শুরু করা শিক্ষা দিয়েছেন। বান্দা যখন আল্লাহর নাম, তার সাহায্য এবং নির্দেশ কামনা করে কাজ শুরু করে তখনই সে আল্লাহর সাহায্য, সহানুভূতি এবং সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকে।

তাছাড়া নিয়মের বিশুদ্ধতাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ কাজের পরিণতি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কাজের মধ্যে নিয়ত এতটা কার্যকরী যে নিয়তের বিভিন্নতার কারণে একই কাজের পরিণতি বিভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কাজের আকৃতি একই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন কোন মুসাফির মুকীম হওয়ার নিয়ত করা ব্যতীত বহু দিন ধরে একই শহরে অবস্থান করলে সে মুসাফিরই

থাকবে। কিন্তু সে যদি থাকার নিয়ত করে কোন শহরে উপস্থিত হয় তবে তার বাহ্য কাজকর্ম একই ধরনের হওয়া সত্বেও সে মুকিম হিসেবে পরিগণিত হবে। তেমনি নিয়ত ছাড়া কোন ব্যক্তি রোযা থেকে সারাদিন পানাহার করা হতে বিরত থাকলেও সে রোযাদারের মধ্যে পরিগণিত হবে না, কোন প্রকার পুণ্যের অংশীদারী হবে না। আর যদি রোযার নিয়তে পানাহার করা হতে বিরত থাকে তবে সে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করবে।

কোন ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ নিয়তে কোন কাজ শুরু করে কিন্তু কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কাজ সম্পাদন করতে না পারে তবে তাকে অপারগ মনে করা হবে এবং সে তার কাজের প্রতিদান পাবে। হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন– نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ মোমেনের নিয়ত তার কাজ সম্পাদন করা অপেক্ষা উত্তম। কাজ সম্পাদন করা ছাড়াও নিয়ত করায় উপকার হতে পারে। কিন্তু নিয়ত ব্যতীত কোন কাজ কোন উপকারেই আসে না। তদুপরি নিয়তের জন্য যতটা বিশুদ্ধতা এবং সরলতা থাকবে উক্ত কাজের প্রতিদানও ততটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি-বিধান সম্মুখে রেখে কাজ করে যাওয়া। কু-প্রবৃত্তির তাড়না না থাকা। মনে রেখো যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য না থাকে এবং কু-প্রবৃত্তির তাড়না থাকে উক্ত কাজে কোন প্রকার বরকত থাকে না এবং মানুষের মন সরল পথ থেকে দূরে সরে যায়। কু-প্রবৃত্তি দোযখের চাবি। কারণ, কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করেই মানুষ দোযখের দিক এগিয়ে যায়। অপরদিকে স্বীয় নফসকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পথে পরিচালনা করা এবং নিজের খেয়াল খুশিমতো না চলা বেহেশতের চাবি। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ـ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ـ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমান, পরকালের চেয়ে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে তার ঠিকানা দোযখ। আর যে স্বীয় প্রভুর কাছে উপস্থিত হতে ভয় পায় এবং (এই ভয়ে) নফসকে তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হতে বিরত রাখে তার স্থান বেহেশত।" (সূরা: আন্-নাযিয়াত– ৩৭-৪১)

তাই লোকের দেখা কর্তব্য সে যে কাজ করতে যাচ্ছে তাতে কী সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধান করে। না তাতে কোন প্রকার কু-প্রবৃত্তির তাড়না আছে। যদি দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে কাজ করা হতে বিরত থাকবে। অথবা তাতে যতটা কু-প্রবৃত্তির তাড়না থাকে তা হতে স্বীয় ইচ্ছা এবং নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিবে।

আল্লাহর পথের অন্তরায়

আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলার পথে মানুষের নিকট যেসব অন্তরায় বা বাধা বিপত্তি এসে দাঁড়ায় তাসাউফের ভাষায় তাকে হিজাব বলা হয়। তা দু'প্রকার। যথা:

১. রাইনী হিজাব;

২. গাইনী হিজাব।

রাইনী হিজাব

রাইনী হিজাব এক ধরনের সুদৃঢ় অন্তরায়– যা কখনও অপসারণ হয় না। কারণ তা সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার পর ব্যক্তির অন্তরে সিল পড়ে যায় এবং দাগ লেগে যায়। রাইন (রং লাগা) খাতাম (সিল পড়া) তাবায়া (দাগ লাগা) এই তিনটি শব্দকে একই অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন–

إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ـ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ـ

"যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে থাকে রাখ এটাতো পৌরাণিক কেচ্ছা কাহিনি। কখনও নয় বরং তাদের অপকর্মসমূহ রঞ্জিত হয়ে তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।" (কুরআন)

অপর আয়াতে এরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ـ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⊛

"যারা (যথার্থতাকে) মান্য করতে অস্বীকার করে তাদের ভয় প্রদর্শন করা হোক কিংবা না হোক তা তাদের জন্য একই সমতুল্য, তারা তাকে বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে সীলমোহর অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা পড়ে গেছে। তাদের জন্য মর্মান্তিক আজাব রয়েছে।"

(সূরা আল-বাকারা– ৬-৭)

এই সম্পর্কেই অন্য আয়াতে বলেন:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ـ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⊛

"তাদের ওয়াদা ভঙ্গের দরুন এবং এই জন্য যে তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে এবং বহু নবিকে অযথা হত্যা করেছে। আরও বলে আমাদের অন্তর গেলাফে সংরক্ষিত (অন্তঃকরণকে সংরক্ষিত বলো না) বরং তাদের অর্থহীন বস্তুকে উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণে ছাপ মেরে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান গ্রহণ করে।"

(সূরা: আন্-নিসা– ১৫৫)

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের অন্তরেই আল্লাহ তায়ালা রাইনী পর্দা টেনে দিয়েছেন। কিন্তু লোকের কৃতকার্যের কারণেই ঐ জাতীয় পর্দার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমন নয় যে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধানী ছিল। অথচ আল্লাহ তাদের উক্ত পথ পাওয়া হতে বঞ্চিত করেছেন।

তাই আল্লাহ তায়ালা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন–

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⊛

"যখন তারা নিজেরাই হীনতা অবলম্বন করেছে তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়েছেন।" (সূরা বানী ইসরাইল)

আল্লাহর নিয়ম নয় যে, অসৎ পথের পথিককে জোর জবরদস্তি করে হেদায়াত করেন। অথচ যারা স্বেচ্ছায় ও সরলান্তঃকরণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে চায় আল্লাহ অবশ্য তাদের সঠিক পথপ্রাপ্ত করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۞

"সত্যের সন্ধানীকে আল্লাহ সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।"

আরও বলেন:

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ......

"যারা ফাসেক, যারা আল্লাহর ওয়াদাকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরার পর বিচ্ছিন্ন করে দেয় আল্লাহ তাদেরই গোমরাহীতে নিমজ্জিত করেন। আল্লাহ যেই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার আদেশ দিয়েছেন তারা তাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি করে।" (সূরা আল-বাকারা– ২৬-২৭)

এই সম্পর্কে আল্লাহর নীতি হলো:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۞

"যারা আমার পথে সাধনা করে নিশ্চয় তাদের আমি আমার পথ প্রদর্শন করি।" (সূরা আল-আম্বিয়া– ৩)

বরং এই সম্বন্ধে আল্লাহর মেহেরবানি এবং অনুকম্পা এতই যে যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে তিনি তাদের অন্তঃকরণকে সঠিক পথ দেখান।

এর চেয়ে আর কী অনুগ্রহ হতে পারে যে আল্লাহ তার কিতাবকে সর্বদিক হতে সংরক্ষণ করে মানবজাতির হাতে সমর্পণ করে বলেছেন:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞

"এটি আল্লাহর গ্রন্থ তাতে কোন ধরনের সন্দেহ নেই। এটি পরহেযগারদের পথ প্রদর্শন করে।" (সূরা: আল-বাকারা– ২)

নবি করিম ﷺ এরশাদ করেছেন: মানুষ যখন কোন অন্যায় করে তখন সেই কৃত কাজের ফলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। অতপর সে যদি উক্ত পাপ থেকে তওবাহ করে এবং ভবিষ্যতে কোন পাপ কাজ করা হতে বিরত থাকে তখন অন্তঃকরণ পরিষ্কার হয়ে যায়। নতুবা সেই দাগ বাড়তে বাড়তে সমস্ত অন্তঃকরণকে ঘিরে ধরে এবং কালো করে ফেলে।

সুতরাং এর প্রতিষেধক সত্যিকারের তওবাহ। এই ব্যাপারে পরে বর্ণিত হবে।

গাইনী হিজাব

অপরদিকে গাইনী হিজাব রাইনী হিজাবের বিপরীত। এটা এক প্রকার সাময়িক হিজাব। মানুষ কিছুটা পরিশ্রম করলে এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হলেই এই বাধা দূর হয়ে যায়। যেমন উপরে বর্ণিত আয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। এই জাতীয় অন্তরায় কমবেশি সবার মধ্যেই হয়ে থাকে। তা অপসারণ করার নিয়ম হলো মানুষের সত্যিকারের আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা। তার জানামতে যেসব কাজ দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী করা হয় তা বর্জন করা। আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছেন এবং যা তার পছন্দনীয় তা দায়িত্বসহকারে পালন করা। নতুবা এটাতো সকলেরই জানা যে যেই ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী না হয়, তাকে সন্ধান করার দরকার মনে না করে এবং তা পাওয়ার জন্য শ্রমবিমুখ হয়; সে কীভাবে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে? যে ব্যক্তি নিজ অসুস্থতা সম্বন্ধে উদাসীন তার পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং বাড়ির সম্মুখে হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না করায় তবে তার পরিণতি কী হতে পারে।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"ঐ সকল লোকদের আল্লাহ তায়ালা কীভাবে হেদায়াত দান করবেন যারা ঈমান গ্রহণ করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়। অথচ সে সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে রাসূল সত্য। সব কিছুই তার কাছে প্রকাশ লাভ করেছে। এমন অত্যাচারী লোকদের আল্লাহ সঠিক পথ দেখান না।" (সূরা: আলে-ইমরান– ৮৬)

তাই ঈমানের নেয়ামত ও ধর্মের পথপ্রাপ্ত হওয়ার পর উদাসীন থাকা এবং আল্লাহর আজ্ঞানুবর্তীকে গ্রহণ না করা মানুষের পক্ষে খুবই মর্মান্তিক কাজ। মানুষ যদি তার এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান না হয় তাহলে তার জন্য সন্দেহজনক যে তার এই গাইনী হিজাব রাইনী হিজাবে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

এই দ্বিবিধ হিজাবের পার্থক্য এরূপ ভাবুন যে একটি প্রকৃতপক্ষেই পাথর যা কখনও আয়না হতে পারে না। দ্বিতীয়টি মূলত আয়না। মরিচা ধরেছে। একটু ঘষা মাজা করলেই ঠিক হয়ে যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে যেই হৃদয় পাথরের আকৃতি ধারণ করে আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক পাথরে পরিণতি করেন না। বরং মানুষ নিজে এমন পথের অনুসারী হয় যেই পথ উক্ত অবস্থায় পরিণত করে। নতুবা যথার্থতা তো এই যে–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ـ

"সকল শিশুই ইসলামের প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে।"
(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

এই দুনিয়া পরীক্ষাগার

এই সম্পর্কে দ্বিতীয় স্মরণযোগ্য বিষয় হলো– আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে মানুষের জন্য পরীক্ষাগার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এটা পরীক্ষা গৃহ এবং আমানতের ক্ষেত্র। এখানে পুরস্কৃত বা তিরস্কার করা হবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়াকে পর্দার গৃহে রেখেছেন এবং এর সম্পূর্ণ যথার্থতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করে রেখেছেন। মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য যতটি পর্দা অপসারণের দরকার ছিল আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তা সরিয়ে দিয়েছেন।

অতপর আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۞

"আমি মানবসম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেছি এখন তাদের ইচ্ছা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক কিংবা অকৃতজ্ঞ হোক।" (সূরা দাহর– ৩)

فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"আর যারা আমার হেদায়াতের অনুসারী হবে তাদের জন্য কোন ধরনের ভয়ভীতি নেই। কিন্তু যারা অকৃতজ্ঞ এবং আমার আয়াতে অবিশ্বাসী তারা চিরকাল দোযখের আজাব ভোগ করবে।" (সূরা আল-বাকারা– ৩৮-৩৯)

সহজ পথ

অতঃপর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে এই পৃথিবীতে যেই কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেই কাজের দায়িত্ব যাকে অর্পণ করেছেন তা তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যদি মানুষ স্বীয় ভ্রান্তি দ্বারা নিজের স্বভাব ও প্রকৃতিকে বক্র না করে তাহলে তার স্বভাবের জন্য ঐসব পথ অবলম্বন করাই সহজসাধ্য হয় যা আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন। কেননা, এসব পথ তাঁরই প্রস্তাবিত যিনি মানবজাতির স্রষ্টা এবং আকৃতি দাতা। কুরআন মজীদে এই পথকে "সহজ পথ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব পথ মানুষের স্বভাবগত পথ।

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় নবিকে সম্বোধন করে বলেছেন: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى আমি اَلْيُسْرٰى কে আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় চলে এবং আল্লাহভীতির পথকে অনুসরণ করে এবং মঙ্গলের সততা স্বীকার করে তার জন্য আমি اَلْيُسْرٰى কে সহজ করে দেব।"

এরই ব্যাখ্যাস্বরূপ মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন–

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ –

"সকলের জন্য ঐ পথকে সহজ করে দেয়া হয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

তাই এই পথের অনুসারী হতে মানুষের কু-প্রবৃত্তি, বিগড়ানো স্বভাব এবং নিয়তের ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্য কিছু যেন অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। অন্যথায় আল্লাহর বন্দেগির পথ তো মূলে নিজের আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের একান্ত কাম্য বিষয় ও তার প্রকৃতি; স্বভাব ও প্রয়োজনের অনুকূলে।

সত্যানুসন্ধানীর জন্য পথ প্রদর্শক

অতপর মহানবি ﷺ-এর তিরোধানের পর মানবজাতিকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা সত্যের সন্ধানীদের সরল পথে পরিচালনা করার জন্য এই মানবজাতির মধ্যেই একটি দলকে নিয়োগ করে রেখেছেন যারা তাদের সর্বক্ষণ সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন।

এই ব্যাপারে হুজুর ﷺ সুসংবাদ জ্ঞাপন করেছেন–

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْخَيْرِ وَالْحَقِّ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ –

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় কেয়ামত পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের পথে বহাল থাকবে।"

আরও বলেন:

لَايَزَالُ فِىْ اُمَّتِىْ اَرْبَعُوْنَ عَلٰى خُلُقِ اِبْرَاهِيْمَ –

সকল যুগে আমার উম্মতের মধ্যে কমপক্ষে চল্লিশ জন ব্যক্তি হজরত ইবরাহীম (আ)-এর চরিত্রে চরিত্রবান থাকবে।

কাজেই যে কোন ব্যক্তিই সঠিক পথের সন্ধানী হবে এবং সৎ নিয়তে সেই পথে চলতে ইচ্ছুক হবে তার জন্য এই সুসংবাদ যে সে কখনও সৎ পথের সন্ধান পেতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং সেই পথে থাকার সাথি পাওয়া হতেও বঞ্চিত হবে না। অবশ্য শর্ত হলো তার নিয়ত সৎ ও সরল হতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তি তার বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে ভালো উকিল এবং রোগের চিকিৎসার লক্ষ্যে ভালো ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

মানুষের আচরণ-ধর্ম

এই পথের প্রথম পদক্ষেপ হলো সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য এলম তথা জ্ঞানার্জন করা। কারণ, সঠিক জ্ঞান না থাকলে কেউ সঠিক পথের সন্ধান পায় না। কিন্তু বিপদ হলো আমাদের যুগে বিশেষিত আমাদের দেশে এলমের প্রতি লোক উদাসীন, সবাই কুপ্রবৃত্তির ভক্ত এবং আল্লাহর প্রতি অনাসক্ত। এই যুগের আলেমরা পর্যন্ত সত্যের বিরোধী। এই যুগের লোক প্রবৃত্তির তাড়নাকেই শরীয়ত হিসেবে আখ্যায়িত করে। প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি লালায়িত ও লালসার নাম সম্মান, অহংকার করার নাম এলম, লোক দেখানো ইবাদতের নাম তাকওয়া, হিংসা দূর করার পরিবর্তে অন্তরে পোষণ করে রাখার নাম সহনশীলতা তর্ক-বিতর্ক এবং অতিশয় হীনতার সাথে সংগ্রাম করার নাম মহানতা, মুনাফেকীর নাম বৈরাগ্য, মুখে যা আসে তা বলাকে মারেফাত, বিলাসিতার নাম আল্লাহ প্রেম, নাস্তিকতার নাম দরবেশী, আল্লাহকে অস্বীকার করার নাম ফানা আর হুজুর ﷺ-এর শরীয়তকে পরিত্যাগ করার নাম তরিকত রেখেছে।

এমনকি সৎপথের পথিকগণ অজ্ঞদের দাপটে এমনভাবে সনাক্ত হয়ে রয়েছেন যেরূপ খোলাফায়ে রাশেদার পর নবি পরিবার মারওয়ানের বংশধরদের চাপে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে হজরত আবু বকর ওয়াস্তি কী সুন্দর বলেছেন– আমাদের এমন যুগের সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে যুগের মানুষের মাঝে না ইসলামী আদব আছে, না জাহেলিয়াতের স্বভাব আছে। আর না আছে মানবসুলভ চরিত্র।

ফলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কে আছে যে বিগত যুগকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম? এজন্য প্রথম পদক্ষেপ সঠিক জ্ঞানার্জনের দ্বারাই আরম্ভ হয়। অতএব আমরা এলম ও এলম অর্জনের অধ্যায় দ্বারাই আরম্ভ করব। আল্লাহ সাহায্যকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোন প্রকার সামর্থ্য নেই।

জ্ঞানার্জন করা

জ্ঞানার্জন করা ফরজ

দীন হোক কিংবা দুনিয়া, বিদ্যা ছাড়া মানুষ কিছুই লাভ করতে পারে না। তাই হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ ـ

"সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।"

আরও বলেন: "চীন দেশে হলেও সেখানে গিয়ে জ্ঞানার্জন কর।"

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۞

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে ভয় করেন।"
(সূরা: আল-ফাতির– ২৮)

আরও এরশাদ করেন:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۞

"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সমীপে হাজির হতে ভয় পায় তার জন্য দুটি জান্নাত।" (সূরা: আর-রহমান– ৪৬)

যেন আল্লাহভীতি জান্নাতের চাবি। আর এই ভীতি এলম বা জ্ঞান হতেই সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ধর্মে যেই জ্ঞানার্জনকে ফরয বলা হয়েছে তা দ্বারা পার্থিব সকল বিদ্যাকে বুঝায় না। কেননা পৃথিবীতে নানা প্রকার বিদ্যা রয়েছে। আর

একজনের পক্ষে সর্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করা যেমন সম্ভব নয় তেমন ফরজও নয়। যেই জ্ঞানার্জনকে ফরজ বলা হয়েছে তা হলো শরীয়ত এবং ফরজ ওয়াজিব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। এটা ব্যতীত শরীয়ত বুঝার জন্য যা কিছু শিক্ষার দরকার তা শিক্ষা করা এমনিভাবেই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অঙ্ক, ভূগোল, রাজনীতি আইন, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি। কারণ, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং ধর্মীয় জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এটা ছাড়া অন্যান্য প্রকার জ্ঞানার্জন করা ভালো। কিন্তু ফরজ নয়।

যে বিদ্যার্জন মানুষের জন্য অহিতকর তা অর্জন করা আল্লাহ ফরজ করেন নি। বরং আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ـ

"তারা এমন কিছু শিক্ষা করে যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক; উপকারী নয়।" (সূরা: আল-বাকারা– ১০২)

হুযুর ﷺ বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ ـ

"হে আল্লাহ! যেই জ্ঞানার্জন অহিতকর আমি তোমার নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

কাজেই এই জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করা হতে দূরে থাকাই উচিত।

এলম ও আমল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

স্মরণ রাখ যে এলমের সাথে সাথে আমল করা জরুরী। এলম ব্যতীত আমল এবং আমল ব্যতীত এলম কোন উপকারেই আসে না। যে এলমের সাথে আমল না থাকে তা অজ্ঞতারই নামান্তর।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۞

"আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায় আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে বর্জন করেছে যে ঐ সম্বন্ধে যেন তাদের কোন জ্ঞানই নেই।"
(সূরা: আল-বাকারা– ১০১)

এতে প্রমাণিত হয় যে আমলবিহীন এলমের অধিকারী বিদ্বান হিসেবে পরিগণিত নয়। এটা দ্বারা তার কোন উপকার সাধন হয় না। আমলবিহীন শুধু এলম যদি উপকারী হতো তাহলে আল্লাহ একথা বলতেন না যে–

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۞

"এমন কথা কেন বল যা কার্যকরী কর না? মনে রেখো আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে ব্যক্তি যা বলে অথচ তা সম্পাদন করে না।" (সূরা: আস্-সফ– ২-৩)

হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ: (١) عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ (٢) وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ (٣-٤) وَعَنْ

مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِىْ مَا اَنْفَقَهُ (٥) وَمَاذَا عَمِلَ فِىْ مَا عَلِمَ -

ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন– পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন রেহাই পাবে না।

১. তার আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে যে, কোন কাজে তার সময় ব্যয় হয়েছে;

২. যৌবন সম্বন্ধে যে, কোন কাজে সে যৌবন ব্যয় করেছে;

৩-৪. ধনসম্পদ সম্বন্ধে যে, কীভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে।

৫. সে তার এলম মোতাবেক আমল করেছে কি না?

অতএব জেনে রাখুন আমলবিহীন এলম কোন কাজেই আসবে না। এখনও যখন আপনার হাতে সময় রয়েছে তখন জেনে রাখুন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আপনার জন্য কী কী ফরজ ও ওয়াজিব করেছেন। কিন্তু আপনি তার প্রতি উদাসীন। তার বিপরীত কত বিষয় এমনও রয়েছে যার ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং তাকে অপছন্দ করেছেন। তথাপি আপনি তার সাথে জড়িত এবং তাতেই নিমজ্জিত।

আমল ছাড়া এলম যেমন উপকারী নয় তেমনি এলম ব্যতীত আমলও কোন কাজে আসে না।

হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَلْمُتَعَبِّدُ بِلاَ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِى الطَّارِ -

"না বুঝে ইবাদতকারী কুলুর বলদের ন্যায়।"

এতে প্রমাণিত হয় যে– অবুঝ ইবাদতকারী আবেদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারে না। দেখুন কোন ব্যক্তি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে

থাকল। অথচ সে জানে না রোযা কী? আবার কেউ বেশ টাকা পয়সা সদকা করল কিন্তু সে জানে না এই দান সদকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। তাহলে কি এটা ইবাদতের মধ্যে পরিগণিত হবে? না, হবে না। এসব কাজকে ইবাদতের মধ্যে পরিগণিত করার জন্য তাকে নিশ্চয় জানতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ। তথাপি এই জানার সাথে সাথে তাকে ইবাদত করার এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করার নিয়তও করতে হবে।

শুধু এটাই নয় বরং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী আমল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয় না। এলম মোতাবেক আমল যত বেশি করবে পথও ততটা উন্মুক্ত হবে। যখনই সে আমল করা বন্ধ করে দিবে তখনই তার চলার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

হজরত ইবরাহীম আদহাম (র) একবার পথ চলাকালীন একটি পাথরের উপর লেখা দেখতে পেলেন, আমাকে উল্টিয়ে দেখ। তিনি পাথরটি উল্টিয়ে দেখতে পেলেন তাতে লেখা রয়েছে:

اَنْتَ لاَتَعْمَلُ بِمَا تَعْلَمُ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ -

"তুমি যা অবগত আছ যদি সেই অনুযায়ী কাজ না কর তবে তোমার যা জানতে ইচ্ছা আছে তা জানার উৎসাহ কোথা হতে সৃষ্টি হবে?"

অতএব এলম ও আমল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। একদিকে এলম দ্বারা বিশুদ্ধভাবে আমল করার পথ উন্মুক্ত হয়; জায়েয নাজায়েয এবং ভালো-মন্দ জানার জ্ঞান জন্মে। অপরদিকে জ্ঞাত বিষয়ে আমল করার অভ্যস্ত হলে এলম দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং আরও অধিক জ্ঞানার্জনের পথ প্রসারিত হয়।

এলমের প্রকারভেদ

জ্ঞান বা এলম দুই প্রকার– আল্লাহ সম্পর্কীয় ও পার্থিব বৈষয়িক। আল্লাহ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে তার নিজস্ব সত্তা, তার গুণাবলি এবং তার সাথেই সম্পৃক্ত ও প্রতিষ্ঠিত। তার জ্ঞান সীমাতীত ও অসীম। তিনি সর্বজ্ঞানী। বিদ্যমান বা অবিদ্যমান সব কিছুই তার জ্ঞানের মাঝে সীমিত।

কুরআন বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

"আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।" (সূরা বাকারা– ২৩১ ও সূরা: মায়িদাহ– ৯)

আরও বলেন–

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞

"আল্লাহর জ্ঞান সকল বস্তুকে ঘিরে রেখেছে।" (সূরা: তালাক– ৭৩)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۞

"তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ব্যাপারেই পরিজ্ঞাত।"

(সূরা: আল-আনআম– ৭৩)

পার্থিব বৈষয়িক বা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জ্ঞান। এটা যেমন অর্জিত হয় তেমন বিলোপও হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۞

"বান্দা আল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার হতে কোন কিছুকেই তার আয়ত্বে আনতে সক্ষম নয়। তবে এতটা সম্ভব যতটা তিনি দেওয়ার ইচ্ছা করেন।"

(সূরা: আল-বাকারা– ২৫৫)

আরও বলেন:

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

"তোমাদের খুবই কম জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

(সূরা: বানী ইসরাঈল– ৮৫)

এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে– সৃষ্টির কোন কিছুই আল্লাহর সাথে তার জ্ঞানের অংশীদার নয়। ফলে তালেবের (অনুসন্ধানীর) কর্তব্য আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হেদায়াতকে পথের আলোস্বরূপ ভাবা এবং মনে রাখা যে আল্লাহ তার কাজকর্ম সব কিছুই দেখেন।

সুতরাং মানুষের এলম ও আমলের একটি প্রকাশ্য এবং আর একটি অপ্রকাশ্য দিক আছে। যেমন কালেমা শাহাদতের প্রকাশ্য দিক হচ্ছে– তাকে মুখে উচ্চারণ করা এবং তার সত্যতা স্বীকার কর। অপ্রকাশ্য বা বাতেন দিক হলো– তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে তাতে ঈমান আনা। বাতেনী হাকিকতের বিদ্যমানতা ব্যতীত প্রকাশ্য বা জাহেরী সাজসজ্জা কপটতা। অপরদিকে বাহ্যিক দিক সুন্দর না রেখে শুধু বাতেনের দাবি করা– বেদীনি এবং যিন্দেকী। তরিকতপন্থীগণ বাতেনহীন জাহেরকে 'নাকস' এবং জাহের ব্যতীত বাতেনকে 'হাওয়াস, বলেন। ফলে সত্যের সন্ধানীর জন্য জাহের ও বাতেন উভয়কে দুরস্ত করাই প্রয়োজন।

ফরজ বিদ্যা

যে ইলম শিক্ষা করা ফরজ তা দ্বিবিধ– ইলমে হাকিকত ও ইলমে শরীয়ত।

ইলমে হাকিকত

ইলমে হাকিকতকে ইলমে উসূলও বলা হয়। তার তিনটি মৌলিক বিষয়।

১. আল্লাহর সত্তা, তার একত্ব এবং শিরকের সীমা জ্ঞান।

২. আল্লাহর গুণাবলি এবং তাঁর আহকাম ও ফরমানের হুকুম এবং

৩. আল্লাহর কার্যাবলি এবং তাঁর হেকমত সম্পর্কীত জ্ঞান।

আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রত্যেক জ্ঞানবান এবং বালেগের জন্য এ কথা জানতে হবে যে আল্লাহ বিদ্যমান, তিনি সর্বক্ষণ আছেন এবং থাকবেন, তার জন্য কোন দিক নির্দিষ্ট নেই, স্থান নির্দিষ্ট নেই। তার ক্ষয় নেই সীমা নেই, উদাহরণ নেই, কোন প্রকার জাত নেই। তিনি সবখানে বিরাজমান, তিনি সব কিছু দেখেন, সব কিছু শ্রবণ করেন। তিনি সকলের মনের কথা জানেন। সৃষ্টি করায় কেউ তার অংশীদার নেই। কোন কাজে তার অংশীদার হওয়া তো দূরের কথা তার সম্মুখে নিঃশ্বাস ফেলার কারও ক্ষমতা নেই। তিনি সকলের স্রষ্টা; সবকিছু তার সৃষ্টি।

আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কীয় জ্ঞান হলো, তার যাবতীয় সিফাত তার জাতের সাথে বিদ্যমান এবং চিরস্থায়ী। কিন্তু না আছে তার অংশ আর না তা পৃথক। তিনি উপাস্য ও একমাত্র উপাস্য চিরঞ্জীব। সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী। প্রতি বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। যা ইচ্ছা তাই করেন। তার প্রতিটি কথা সত্য, তার প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। অন্যান্য যাবতীয় হুকুম আহকাম তার হুকুম আহকামের অধীনস্থ।

আল্লাহর কার্যাবলি সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে, যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র তিনি। হায়াত, মওত, ধনদৌলতের উন্নতি অবনতি যাবতীয় কিছু আল্লাহর কাজ। এর সকল কাজই তার কার্যকারকের স্মারক চিহ্ন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞

"এসব লোক কি দেখে না যে আমি উট কিরূপে সৃষ্টি করেছি; নভোমণ্ডলকে কীভাবে উন্নত করেছি, পাহাড়কে কীভাবে স্থির রেখেছি এবং জমিনকে কীভাবে বিছিয়ে দিয়েছি।" (সূরা: আল-গাশিয়াহ–১৭-২০)

আরও এরশাদ করেন:

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ ۞

"জমিন ও আসমানের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের ক্রমাগতভাবে আগমনে জ্ঞানবানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা: আলে-ইমরান– ১৯০)

এসব কিছু চোখ খুলে দেখলে এবং এসব কিছু মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখলে অবশ্য তুমি বুঝতে পারবে এসব যার সৃষ্টি তিনিই একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

১। فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। (সূরা: মুহাম্মাদ–১৯)

২। فَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ مَوْلٰكُمْ জেনে রেখো আল্লাহই তোমাদের প্রভু। (সূরা: আল-আনফাল– ৪০)

৩। وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ আল্লাহকে আঁকড়িয়ে থাক, তিনিই তোমাদের মালিক। (সূরা: আল-হজ্জ– ৭৮)

৪। اُعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই।
(সূরা: আল-আরাফ– ৫৯)

৫। قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۞ اَللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ আপনি বলুন, আল্লাহ এক। তিনি অমুখাপেক্ষী; তার কোন সন্তান নেই, কোন পিতা নেই। তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। (সূরা: ইখলাস– ৪)

০৬। مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا তার না আছে স্ত্রী আর না আছে সন্তান। (সূরা: জিন– ৩)

০৭। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তার সমকক্ষ আর কেউ নেই।
(সূরা: শুরা– ১১)

০৮। وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ পূর্ব পশ্চিমে সব কিছুই আল্লাহর। যেদিক তুমি চেহারা ফিরাবে সেই দিকেই আল্লাহ।
(সূরা: আল-বাকারা– ১১৫)

০৯। لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ তার কোন পুত্র নেই এবং তার রাজত্বে তার কোন অংশীদারও নেই। (সূরা: বানী ইসরাঈল– ১১১)

১০। وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ একমাত্র আল্লাহই জমিন আসমানের প্রভু এবং জমিন ও আসমানের মাঝে যা কিছু পাওয়া যায় তাদেরও প্রভু। তিনি প্রতিটি বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা: আল-মায়িদাহ– ১৭)

১১। اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ জেনে রেখ! সৃষ্টি তাঁরই এবং বাদশাহীও তাঁরই। (সূরা: আল-আরাফ– ৫৪)

১২। اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।
(সূরা: আল-বাকারা– ১৮১)

১৩। اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ আল্লাহ অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন। (সূরা: আল-মায়িদাহ– ৭)

১৪। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
(সূরা: বুরূজ– ১৬)

১৫। اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ যখন তিনি কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন তখন নির্দেশ দেন "হয়ে যাও" আর তৎক্ষণাৎ তা অস্তিত্বে এসে যায়।
(সূরা: মারিয়াম– ৩৫)

১৬। قَوْلُهُ الْحَقُّ তাঁর প্রতিটি কথা সত্য।
(সূরা: আল-আনআম– ৭৩)

১৭। اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তোমাদের প্রভু শাস্তি দেওয়ায় ব্যাপারে অতি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং ক্ষমা ও মেহেরবানি করায়ও মহান। (সূরা: আল-আনআম– ১৬৫)

১৮। إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর পাকড়াও খুবই কঠিন। (সূরা: বুরূজ- ১২)

১৯। وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ তিনি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান। (সূরা: ইউসুফ- ৯২)

২০। وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ তিনি সীমাহীন ক্ষমাশীল এবং মহব্বতকারী। (সূরা: বুরূজ- ১৪)

শরীয়তী ইলম

ইলমে শরীয়তেও তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে।

১. আল্লাহর কিতাব।
২. রাসূলের সুন্নত।
৩. উম্মতের এজমা।

শরীয়তের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহর কিতাবের মুহকামাত (সুদৃঢ়) আয়াত। তার উদ্দেশ্য হলো আকায়েদ, ফরজ এবং আদেশ নিষেধ সম্পর্কীত সকল আয়াত যার অর্থ, উদ্দেশ্য, দাবি নির্ধারণ করতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۞

"তাদের মাঝে এক তো আয়াতে মুহ্কামাত যা কিতাবের মূল ভিত্তি। অপরটি মুতাশাবেহাত (যার বুঝ-ব্যবস্থায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে)।" (সূরা: আলে-ইমরান- ৭)

যেখানে এবং যেই মাসয়ালায় কোন ধরনের সন্দেহ বা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাকে মুহকামাতের কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখতে হবে যে

কোন অবস্থা মুহকামাতের নিকটতম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা অধিক নিকটবর্তী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তা-ই সঠিক হবে।

শরীয়তের অপর রোকন বা স্তম্ভ হলো মহানবি ﷺ এর সুন্নত। অর্থাৎ হুজুর ﷺ এর তরিকা। আল্লাহর আহকাম এবং তার সঠিক উদ্দেশ্য জানা মানুষের জন্য একই সঠিক পন্থা হলো মহানবি ﷺ এর সত্তা। অর্থাৎ মহানবি ﷺ এর বাণী, কর্ম এবং সমর্থন। আল্লাহ তায়ালা বড়ই কৃপা করে হাদীস ও চরিত গ্রন্থে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۞

"আল্লাহর রাসূল তোমাদের যা দান করেন তা গ্রহণ কর; আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা: আল-হাশর- ৭)

আরও ঘোষণা করেছেন:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۞

"(হে নবি!) আপনি লোকদের বলে দিন যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং মাফ করে দিবেন।"

শরীয়তের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে- এজমায়ে উম্মত। এজমায়ে উম্মত শরীয়ত হওয়ায় প্রমাণ হুজুর ﷺ এর পবিত্র বাণী।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ ۞

"আমার উম্মত কখনও গোমরাহীতে একতাবদ্ধ হবে না। তোমরা বড় দলের সঙ্গে থাকবে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۞

"সঠিক পথ প্রকাশ লাভ করার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করে তাকে আমি তার অনুসৃত পথে পরিচালনা করব এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"

প্রকাশ্য যে, سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ "ঈমানদারদের পথ" অর্থ ইসলামের পথ যাতে সকল ঈমানদার কিংবা তাদের অধিকাংশ একমত।

ইলমের সাথে চিন্তার আবশ্যকতার গুরুত্ব

ইলমের সাথে চিন্তা করাও প্রয়োজন। কারণ, চিন্তা ও দূরদর্শিতা ছাড়া মানুষের মধ্যে না সঠিক বুঝ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় আর না তা ব্যতীত ইলম মানুষের জীবনের উপর কোন প্রকার গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

তাই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন–

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

"এক মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা ষাট বছরের (নফল) ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

মানবীয় জ্ঞানের পরিধি

কোন ব্যক্তি বা পৃথিবীর সকল লোক মিলেও নিজের এবং অন্যান্য লোকের নিকট সে যতই জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হোক কিন্তু তার সেই জ্ঞানের একটি পরিধি আছে। যেই মূল জ্ঞান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত, তার

সম্মুখে লোকের জ্ঞানের কোন দাম নেই। মানুষের জ্ঞানের অবস্থা তো এই যে সমস্ত মানুষ সংঘবদ্ধভাবেও আল্লাহর পৃথিবীর একটি অনু পরিমাণ বিষয়ের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার দাবি করতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতা এখানেই যে সে জেনে রাখুক যে মোটের উপর সে কিছুই জানে না।

যেমন মহানবি ﷺ আল্লাহর কাছে আরজ করেছেন–

لَا أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার গুণগান করতে অক্ষম।"

আল্লাহ তো শুধু তার নেয়ামত ও বাণী সম্বন্ধে বলেছেন:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۞

"তোমরা যদি শুধু আল্লাহর নেয়ামতের সংখ্যা গণনা করতে থাক, তাহলে অপারগ হবে।" (সূরা: ইব্রাহীম– ৩৪)

আল্লাহ তায়ালা আরও ঘোষণা করেন:

لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۞

"প্রভুর বাণী লেখার জন্য যদি সাগরসমূহের পানি কালিতে পরিণত হয় তথাপি আমার প্রভুর বাণী লেখা শেষ হবে না। যদিও তার সাথে আরও এমন অনেক সাগর মিলিত করা হয়।" (সূরা: কাহফ– ১০৯)

...নের উপর সঠিক ইলমের প্রতিক্রিয়া

হাতেম (র) বলেন: আমি যখন চারটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলাম তখন থেকে অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রয়োজন আর আমার অবশিষ্ট থাকল না।

লোকেরা প্রশ্ন করল: উক্ত চার প্রকার ইলম কী? তিনি বললেন:

১. যখন থেকে আমি জানতে পারলাম যে আমার জীবিকা আমার জন্য বন্টন করে রাখা হয়েছে এবং কোন অবস্থায়ই তা কমবেশি হবে না তখন থেকে আমি আমার জীবিকার বিষয় নিয়ে কোন ধরনের চিন্তা-ভাবনা করতাম না।

২. আমি জানতে পারলাম যে আমার প্রতি আল্লাহর যে দাবি রয়েছে আমি ব্যতীত অন্য আর কেউ তা পূরণ করতে পারবে না, তখন থেকেই আমি উক্ত দাবি পূর্ণ করায় লিপ্ত হলাম।

৩. যখন আমার প্রত্যয় জন্মিল যে মৃত্যুর হাত থেকে কোন ভাবেই রেহাই পাব না, তখন থেকে আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছি।

৪. যখন থেকে আমি জানতে পারলাম যে আমার একজন আল্লাহ আছেন এবং তিনি আমার সকল কাজের খবর রাখেন, তখন থেকে আমি ঐসব কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি যার জন্য রোজ হাশরে তার দরবারে আমাকে লজ্জিত হতে হবে।

কথিত আছে, বসরার একজন জ্ঞানীলোক তার বাগানবাড়িতে যান। সেখানে তার মালীর সুন্দরী স্ত্রীর উপর তার দৃষ্টি পড়ে। বাদশাহ মালীকে কোন কাজের অজুহাতে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন: ঘরের জানালা কপাট বন্ধ কর। মালীর স্ত্রী বলল: একটি ব্যতীত আমি আর সকল দরোজা বন্ধ করেছি।

বাদশাহ বললেন: সেটা আবার কোন দরোজা?

মালীর স্ত্রী বলল: যে দরোজা দিয়ে আল্লাহ সবকিছু দেখেন।

বাদশাহ তার কথায় লজ্জিত হয়ে মালীর স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চেয়ে ফিরে চললেন।

বর্জনযোগ্য ধর্মীয় নেতা

শায়খুল মাশায়েখ হজরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআজ (র) বলেন–

اِجْتَنِبُوْا صُحْبَةَ ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ مِّنَ النَّاسِ - الْعُلَمَاءِ الْغَافِلِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ الْمُدَاهِنِيْنَ وَالْمُتَصَوِّفَةِ الْجَاهِلِيْنَ -

তিন প্রকার লোকের সংশ্রব থেকে দূর থাক

১. অলস আলেম;

২. মোটা তাজা এবং লোক দেখানো সাধু এবং

৩. জাহেল সুফি।

গাফেল বা অলস আলেম পার্থিব লাভ-লোকসানই যাদের লক্ষ্য এবং অন্যায় অত্যাচারী শাসকবৃন্দের দরবারে ঘুরাফেরা করে মানুষের সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে লালায়িত, বুযুর্গানে দীন এবং আলেমদের ঘৃণা করা এবং হিংসা ও ঝগড়া বিবাদ যাদের পছন্দ। ধোঁকাবাজ ও লোক দেখানো দরবেশ– প্রকাশ্যে দরবেশ ভেতরে ভেতরে লোভ-লালসার বান্দা। কোন ব্যক্তি তার পছন্দসই কাজ করলে এবং তা শরীয়ত বিরোধী হলেও সেই ব্যক্তির প্রশংসা করে। আবার, কেউ শরীয়ত সিদ্ধ কাজ করলেও তা যদি তার মনঃপূত না হয় তবে সে তার নিন্দাবাদ করে। মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করে নিজের শিকারে পরিণত করে।

জাহেল সুফি– এরা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিদের সংশ্রবে থেকে ধর্ম-কর্মের শিক্ষা গ্রহণ করে না। সত্য-মিথ্যায়, হক না-হকে পার্থক্য করার কোন জ্ঞান তাদের নেই। তারা নিজেরাই সুফি হয়ে বসে।

কেবল ইলম হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়

এটাও মনে রাখতে হবে যে শুধু ইলম মানুষের হেদায়াতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। হাকিকত ও শরীয়তের ইলম হেদায়াতের মাধ্যম এবং মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান তাতে সাহায্যকারী হয়। হেদায়াত অনসন্ধানীর ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় জ্ঞান লাভ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলে জ্ঞান লাভ করা ছাড়াও বিনয়তার সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থীও হতে হবে। আলেম হোক কিংবা সুফি শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যই প্রয়োজন। শরীয়তের জ্ঞানার্জন করা ছাড়া কেউ আলেম, দরবেশ বা সুফি হতে পারে না এবং হওয়ার দাবি৩ করতে পারে না।

দরিদ্র্যতা : দরবেশী

আল্লাহর কাছে দরিদ্র এবং দরবেশের মর্যাদা খুবই উন্নত। হুজুর ﷺ দোআ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং দরিদ্রের সাথেই আমাকে হাশরের মাঠে উঠাইও।"

হুযুর ﷺ আরও এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করবেন:

اِيْتُوْا مِنِّىْ اَحْبَابِىْ فَيَقُوْلُ الْمَلٰۤئِكَةُ مَنْ اَحْبَابُكَ فَيَقُوْلُ اللهُ اَلْفُقَرَآءُ وَالْمَسَاكِيْنُ ـ

"আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিবেন আমার বন্ধুগণকে আমার নিকটে পেশ কর। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন, আপনার বন্ধু কারা? আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করবেন, ফকির ও মিসকিন।"

কিন্তু ফকির এবং মিসকিন বলতে ঐসব ব্যক্তিকে বুঝায় যারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে দুনিয়া লাভের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাজ ও দাসত্বের জন্য আত্মোৎসর্গ করে থাকেন। যেমন আসহাবে সুফ্ফা সর্বক্ষণ মসজিদে নববিতে থেকে মহানবি ﷺ-এর নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকতেন। তারা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যাবতীয় আসবাব উপকরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহতে আত্মসমর্পিত থাকেন এবং তাঁরই সাথে প্রেমপ্রীতির বাঁধন দৃঢ় করেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বন্ধু তাদের থাকে না।

এ জাতীয় লোকের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۞

"তোমাদের আল্লাহর ওয়াস্তের দান এবং খেদমত পাওয়ার যোগ্য ঐসকল দরিদ্র ব্যক্তি যারা আল্লার কাজে এমনভাবে আবদ্ধ যে চলে ফিরে দৌড় ঝাঁপ দ্বারা নিজেদের জীবিকা অর্জনে অসমর্থ তাদের ব্যক্তিত্ব দেখে অপরিচিত লোকেরা মনে করবে যে তারা খুব সম্পদশালী।" (সূরা: আল-বাকারা– ২৭৩)

এসব লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তার রাসূলকে এরশাদ করেছেন–

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۞

"যারা রাতদিন স্বীয় প্রভুর ইবাদত বন্দেগিতে আত্মনিয়োজিত এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।" (সূরা: আল-আনআম– ৫২)

ফকিরীর আসল সম্পদ বৈরাগ্য অথচ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। বরং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং অমুখাপেক্ষী হওয়া। যেহেতু তাসাউফের পরিভাষায় সুফি ঐ ব্যক্তি যে জাগতিক বিষয়বস্তু হতে অমুখাপেক্ষী। তার নিকট কিছু থাকুক কিংবা না থাকুক উভয় অবস্থায়ই তার মধ্যে যেন কোন প্রকার পরিবর্তন না আসে। তার কাছে কোন সম্পদ না থাকলেও যেন সে তাকে নিঃসম্বল মনে না করে এবং সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেন নিজেকে ধনী মনে না করে। বরং নিঃস্ব অবস্থায় আরও সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ, ফকির যতটাই দরিদ্র হবে তার হাল' ততটাই প্রকাশ লাভ করবে– অলসতা কম হবে। তাই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

بَطْنُ جَائِعٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ سَبْعِيْنَ عَابِدًا عَاقِلًا –

"অনাহারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সত্তর জন জ্ঞানবান দরবেশ অপেক্ষাও উন্নত পর্যায়ের প্রিয় ব্যক্তি।"

আরো বলা হয়েছে–

اَلْجُوْعُ طَعَامُ اللهِ فِى الْاَرْضِ –

"ক্ষুধা এই দুনিয়ায় আল্লাহর আহার্য বস্তু।"

প্রকৃত ফকির

একজন বুযুর্গ বলেছেন:

لَيْسَ الْفَقِيْرُ مَنْ خَلَا مِنَ الزَّادِ اِنَّمَا الْفَقِيْرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمُرَادِ –

"সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি ফকির নয় বরং যেই ব্যক্তি পার্থিব লোভ-লালসার প্রতি অনাসক্ত সে-ই আসল ফকির।"

হজরত শিবলী (র) বলেন:

اَلْفَقِيْرُ مَنْ لَايَسْتَغْنِىْ بِشَىْءٍ دُوْنَ اللهِ –

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে শান্তি না পায় সেই আসল ফকির।"

হজরত রোয়াইম ইবনে মুহম্মদ (র) বলেন:

مِنْ نَعْتِ الْفَقِيْرِ حِفْظُ سِرِّهٖ وَصِيَانَةَ نَفْسِهٖ وَاَدَاءِ فَرِيْضَتِهٖ –

"নিজের রহস্য হেফাজতে রাখা, নিজের নফসের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা এবং যথারীতি ফরজ আদায় করা– এসব গুণাবলিই ফকিরীর মাহাত্ম্য।"

তাই আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় কিছু হতে দূরে থাকাই ফকিরী। সমস্ত

অঙ্গ-প্রতঙ্গকে নাফরমানী হতে বাঁচিয়ে রাখা এবং যাবতীয় অনুচিত কাজ করা থেকে বিরত রাখাই ফকিরী। ধনসম্পদ ও দারিদ্র্যতা এই দু'য়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এই সম্বন্ধে বুযুর্গদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু আমি (গ্রন্থকার) বলি এটা একটি অনর্থক তর্ক। গনী বা সম্পদশালী আল্লাহর একটি নাম আর তিনি এর জন্য উপযুক্ত সত্তা। সৃষ্টি এই নামে আখ্যায়িত হতে পারে না। হাঁ তবে যদি রূপক ভাবে কাউকে গনী বলা হয় তবে জায়েয। আল্লাহ স্বয়ং সত্তায় গনী, তিনি উপকরণের স্রষ্টা। তার সম্পদের জন্য না কোন উপকরণ আছে আর না তার প্রয়োজন হয়।

বান্দার সম্পদ আল্লাহর দান– বান্দার শ্রম সাধনা উপলক্ষ বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। আল্লাহই প্রকৃত গনী এবং প্রশংসনীয়।" (সূরা: আল-ফাতির– ১৫)

আরও বলেন:

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۝

"আল্লাহই প্রকৃত গনী তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী এবং দরিদ্র।"

(সূরা: মুহাম্মদ– ৩৮)

অতএব বান্দা জন্মগতভাবেই দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। ফলে ধনী হোক অথবা দরিদ্র উভয় অবস্থায়ই মানুষ পরীক্ষার বিষয়বস্তু। মানুষের কর্তব্য দরিদ্রাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা এবং স্বচ্ছলতার সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তায়ালা হজরত আইউব (আ)-কে বিপদের কালে ধৈর্যধারণের জন্য উৎকৃষ্ট বান্দা নামে অভিহিত করেছেন। এ কারণে দেখা যায় আইউব (আ) এর ধৈর্য এবং সুলায়মান (আ) এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উভয়ই আল্লাহর কাছে সমমর্যাদাসম্পন্ন। যেহেতু সম্পদ ও দরিদ্রতা আল্লাহর দান। উভয় অবস্থায়ই

তাকে বরণ করে নেয়া ফকিরীর একটি বড় গুণ।

আমার ওস্তাদ হজরত কাসেম কুশাইরী বলেছেন: মানুষ ধনসম্পদ এবং দরিদ্রতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং এটাকে নিজেদের একটি মত ও পথরূপে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ যদি আমাকে সম্পদ দান করেন তবে আমি অকৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর যদি দরিদ্র করেন তাহলে লোভী ও মুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে ধৈর্যধারণ করব।

মেকী দরিদ্র

যে ব্যক্তি দরিদ্র বা দরবেশ নয় বরং কৃত্রিম দরবেশ সেজে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়ায় এবং লোকেও তাকে তাই মনে করে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন ব্যক্তি চরম জঘন্য এবং নীচ ও হীন। যে কাজেই লোককে আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে রাখে তা সম্মান নয় ররং জঘন্যতম হীনতা। বুযুর্গগণ সবসময় তাদের মুরিদদের এই ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধান করে দিতেন। হজরত জোনায়েদ (র) দরবেশদের নসিহত করেন:

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَآءِ إِنَّكُمْ تُعْرَفُوْنَ بِاللّٰهِ وَتُكْرَمُوْنَ بِاللّٰهِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَكُوْنُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِذَا خَلَوْتُمْ بِهٖ ـ

"হে দরবেশকুল। তোমরা আল্লাহ ওয়ালা নামে পরিচিত; আল্লাহ ওয়ালা হিসেবেই মানুষেরা তোমাদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তোমরা যখন নির্জনে আল্লাহর সম্মুখে থাক তখন চিন্তা করে দেখ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কতটা বিশুদ্ধ।"

শায়খ আবু সাঈদ (র) বলেন:

اَلْفَقِيْرُ هُوَ الْغَنِىُّ بِاللّٰهِ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পদশালী সে-ই আসল দরবেশ।"

যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয় তখন তার আর কিছুই দরকার হয় না। আর যখন দূরে থাকে তখন তার স্বস্তি থাকে না।

তাসাউফ

তাসাউফের বাস্তবতা ও প্রকৃতি

হজরত মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন:

اَلتَّصَوُّفُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِى الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِى التَّصَوُّفِ ـ

"তাসাউফ সৎ স্বভাবের নাম। মানুষের চরিত্র যত উন্নত হবে তার তাসাউফও ততটা বৃদ্ধি পাবে।"

আখলাকের দু'টি শ্রেণি

আখলাক বা সৎ চরিত্রের দু'টি শ্রেণি রয়েছে। প্রথম স্রষ্টার সাথে সৎ স্বভাব অপরটি সৃষ্টির প্রতি সদ্ব্যবহার।

১. আল্লাহর সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ এই যে, বান্দা আল্লাহর বিধানে রাজি থাকবে। তার কোন কাজেই অভিযোগ করবে না। তার সকল আদেশ-নিষেধ আনত মস্তকে মেনে নিবে।

২. সৃষ্টির সাথে সৎ স্বভাবের অর্থ হচ্ছে: সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তায়ালা তাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অবশ্য তা পালন করবে এবং নিঃস্বার্থভাবেই আদায় করবে।

হজরত মারতায়াশ (র) বলেন: সৎ স্বভাবের নামই হচ্ছে তাসাউফ। তা তিন প্রকার।

ক. মহান আল্লাহর প্রতি সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ তার সকল আদেশ-নিষেধ তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানার্থে বিনা বাক্যব্যয়ে মান্য করা।

খ. সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ বয়স্কদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা। ছোটদের প্রতি স্নেহ করা এবং সমবয়সীদের সাথে সমান ব্যবহার করা (নিঃস্বার্থভাবে)।

গ. শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য না করা।

হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র) বলেন:

اَلتَّصَوُّفُ مَبْنِىٌّ عَلٰى ثَمَانِ خِصَالٍ ـ اَلسَّخَاءُ وَالرِّضَاءُ وَالصَّبْرُ وَالْاِشَارَةُ وَالْغُرْبَةُ وَلَبْسُ الصُّوْفِ وَالسِّيَاحَةُ وَالْفَقْرُ اَمَّا السَّخَاءُ فَلِاِبْرَاهِيْمَ وَاَمَّا الرِّضَاءُ فَلِاِسْمَاعِيْلَ وَاَمَّا الصَّبْرُ فَلِاَيُّوْبَ وَاَمَّا الْاِشَارَةُ فَلِزَكَرِيَّا وَاَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِيَحْيٰى وَاَمَّا لُبْسُ الصُّوْفِ فَلِمُوْسٰى وَاَمَّا اَلسِّيَاحَةُ فَلِعِيْسٰى وَاَمَّا الْفَقْرُ فَلِمُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ❁

তাসাউফের ৮টি নিদর্শন। যথা: সাখাওয়াত, রেজা, সবর, ইশারাত, গুরবাত, পশমী পোশাক, সিয়াহাত এবং আল-ফাকর।

১. সাখাওয়াত (দানশীলতা)। এর উদাহরণ হজরত ইবরাহীম (আ)। তিনি তাঁর এবং পুত্রের জীবন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

২. রেজা (আল্লাহর সন্তুষ্টি)। এর উদাহরণ হজরত ইসমাঈল (আ)। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

৩. সবর (ধৈর্য) এর প্রতীক হজরত আইউব (আ)। নিজের চোখের সামনে পরিবারের সকলকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখে এবং নিজের সর্ব শরীর কীটে খেয়ে ফেলার পরও তিনি কোনদিন অধৈর্য হন নি।

৪. ইশারাত (ইঙ্গিত) এর উদাহরণ হজরত যাকারিয়া (আ)। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ইঙ্গিত ইশারায় কাজ সম্পাদন করতেন।

৫. গুরবাত (অপরিচিত হওয়া) এর উদাহরণ হজরত ইয়াহ্ইয়া (আ) তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের দেশেও অপরিচিত ছিলেন।

৬. পশমী পোশাক পরিধান– হজরত মূসা (আ) পশমী পোশাক ব্যবহার করতেন।

৭. সিয়াহাত (ভ্রমণ) এর উদাহরণ ছিলেন হজরত ঈসা (আ)। তিনি একটি পানপাত্র ও একটি চিরুনী সাথে নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে একজনকে আঙ্গুল দিয়ে চুল বিন্যাস এবং অঞ্জলি ভরে পানি পান করতে দেখে পান পাত্র এবং চিরুনীও ফেলে দিয়েছিলেন।

৮. আল-ফাকর (দরিদ্রতা) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুজুরে আকরাম । সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীর সকল সম্পদের চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন পেট ভরে খাওয়া এবং দুই দিন অনাহারে থাকাকেই তিনি অধিক পছন্দ করলেন। আবার তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থায়ই মৃত্যু দান কর এবং দরিদ্রদের সাথে হাশর কর।

প্রকৃত সুফির গুণাবলি

তাসাউফ (تصوف) ও সুফি (صوفى) শব্দ দুটি মূলে ছাফা (صفا) তথা পবিত্রতা ধাতু থেকে নির্গত। তার বিপরীত শব্দ হলো كدر বা كدورت অপরিচ্ছন্নতা। তাই যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র; আচার ব্যবহার সুন্দর করে, স্বভাবকে অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর দাসত্ব করার গুণাবলি নিজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নেয় সে-ই সুফি এবং তাসাউফধারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়। অতএব সুফির আসল কাজ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে বিলীন করে দেওয়া এবং পৃথিবীর প্রতি নির্লিপ্ত এবং অনাসক্ত হওয়া। হজরত আবু বকর (রা)-এর মাঝে যে এই দুইটি স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

হজরত আবু বকর (রা) এর মধ্যে উক্ত দু'টি স্বভাব যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ এতেই দেখা যায় যে মহানবি এর ইন্তিকালের পর মদিনাবাসী মুসলিম পাগল প্রায় হয়ে গেলেন। এমনকি তারা সুষ্ঠু চিন্তাধারার ক্ষমতাও অনেকটা হারিয়ে ফেললেন। যার দরুন হজরত ওমর (রা) খোলা তরবারি হাতে পাগলের মতো বলেছিলেন যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন আমি এই তরবারি দ্বারা তার মস্তক ছিন্ন করে ফেলব।

হজরত আবু বকর (রা) এই সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বললেন–

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ
رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهٗ حَىٌّ لَايَمُوْتُ ـ

"তোমরা যারা মুহাম্মদের ইবাদত করছ তারা জেনে রেখ মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যারা মুহম্মদের প্রভুর ইবাদত করছ তারাও জেনে রেখ যে তিনি জীবিত; তিনি অমর তার মৃত্যু নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অর্থ যুক্ত কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ـ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ۞

"অন্যান্য নবিদের মতো মুহাম্মদও আল্লাহর একজন রাসূল। তার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তবে কি তোমরা (ধর্ম হতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাবে?" (সূরা: আলে-ইমরান– ১৪৪)

হজরত আবু বকরের বাণী ও আল্লাহর এরশাদ শুনে সত্যের উপাসকদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। হজরত ওমর (রা) উন্মুক্ত তরবারি দূরে ফেলে দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

এই দু'টি বস্তু হতে হজরত আবু বকর (রা) এর অন্তর একেবারে শূন্য ছিল। এর প্রমাণে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে হজরত আবু বকর তাঁর যথা সর্বস্ব মহানবি ﷺ এর দরবারে এনে হাজির করলেন। মহানবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আবু বকর! তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ?" হজরত আবু বকর স্মিত হাস্যে আরজ করলেন: "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত এবং অনুসরণ।"

এই দুটি বিষয়ই তাসাউফ এবং সুফিদের আসল সম্পদ। হজরত জুননূন মিসরি (র) বলেন:

اَلصُّوْفِىُّ اِذَا نَطَقَ بَانَ نُطْقُهُ عَنِ الْحَقَائِقِ وَاِنْ سَكَتَ نَطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْعَلَائِقِ ـ

"যে সত্য বলে এবং যার প্রতিটি পশম এই সাক্ষ্যদান করে যে দুনিয়ার কোন প্রকার আসক্তি তার মাঝে নেই সে-ই সুফী।"

শ্রেণিবিন্যাস

তাসাওউফের মতে সুফী তিন ভাগে বিভক্ত।

১. যে স্বীয় সত্তাকে সত্যের মাঝে বিলীন করে দেয় এবং যার মধ্যে কোন ধরনের অপবিত্রতা ও সংকীর্ণতা না থাকে সে সুফী।

২. যে সাধন-ভজন দ্বারা এমন স্তর লাভ করার চেষ্টা করে এবং তার চাহিদা অনুযায়ী নিজে নিজকে এবং নিজের আচার ব্যবহারকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে তাকে মুতাসাওয়েফ বলা হয়।

৩. যে ব্যক্তি পৃথিবীর ধনসম্পদ; মানসম্মান অর্জন করার উদ্দেশ্যে সুফিদের বেশ ধারণ করে, অথচ তাসাউফের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই তাকে মুসতাসাওয়েক বলা হয়।

এই তৃতীয় প্রকারের লোকদের ব্যাপারে সুফিদের অভিমত হলো: এরা মাছির মতো হীন এবং ঘৃণিত, পার্থিব লোভ-লালসার দাস। নেকড়ে বাঘ যেমন ছাগ পালের মাঝে ঢুকে তাদের ধ্বংস সাধন করে এরাও তেমনি জনসাধারণের সাথে মেলামেশা করে তাদের ঈমান নষ্ট করে।

তাসাউফের আবশ্যকতা

তাসাওউফের প্রমাণের আলোচনার সমাপনান্তে হজরত আলী হাজবিরী প্রথমে তাসাউফ অস্বীকারীদের উত্তরে আবুল হাসান আবু শাহ্নার উক্তি উদ্ধৃত করেন যে–

اَلتَّصَوُّفُ الْيَوْمَ اِسْمٌ وَلَا حَقِيْقَةٌ وَقَدْ كَانَ حَقِيْقَةً ۞

"আজকাল তো তাসাউফ একটি কথার কথা মাত্র, তার পক্ষে কোন যথার্থ যুক্তি নেই। কিন্তু সাহাবাকেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের আমলে তার যথার্থতা ছিল। নিঃসন্দেহে ঐ যুগে তাসাউফ নামে কিছু ছিল না কিন্তু আসল বিষয়বস্তু ঠিকই ছিল।"

এই উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করার পর হজরত আলী হাজবিরী বলেন: তাসাউফ সম্পর্কে তোমরা যা বল তা যদি বর্তমান অবস্থা দেখে বল তাহলে আমরাও তার সমর্থক। তাসাউফকে অস্বীকার করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত যদি নাম নিয়ে হয় তবে তা দূষণীয় নয়। কারণ তার মূল বিষয়বস্তু যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে নাম নিয়ে কোন ঝগড়া বিবাদ বা একগুয়েমী নেই।

আর যদি তার আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অস্বীকার কর তাহলে স্মরণ রেখো তা দ্বারা শরীয়তকে অস্বীকারই করা হয় না বরং মহানবি ﷺ এর প্রশংসনীয় ফজিলত এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসনীয় গুণাবলিকেও অস্বীকার করা হবে। কারণ এই জাতীয় অস্বীকার করার পর ধর্মের সব কিছুতেই রিয়াকারী দেখায়। ধর্মের মূল বিষয়বস্তু তো আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অস্বীকার করলে ধর্ম আর কোথায় থাকল? হ্যাঁ; এখন যদি তোমরা তাকে স্বীকার কর এবং তা যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে আমরা তাকেই তাসাউফ বলবে।

হজরত আবুল হাসান (র) বলেন:

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رُسُوْمًا وَلَا عُلُوْمًا وَلٰكِنَّهُ الْاَخْلَاقُ ـ

"তাসাউফ কোন নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বা বিদ্যার সনদপত্রের নাম নয়। বরং সচ্চরিত্র ও সদ গুণাবলির নামই তাসাউফ।"

আবুল হাসান নূরী (র) বলেন:

اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالْفُتُوَّةُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالسَّخَاءُ وَبَذْلُ الدُّنْيَا ـ

"কুপ্রবৃত্তি, লোভ-লালসার দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকা; অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং পার্থিব লৌকিকতা থেকে দূরে থাকার নামই তাসাউফ। নিজের ধনসম্পদ অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া এবং দুনিয়াকে অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার নামই তাসাউফ।"

হজরত আবু হাফ্স হাদ্দাদ নিশাপুরী (র) বলেন:

اَلتَّصَوُّفُ كُلُّهٗ اَدَبٌ وَلِكُلِّ وَقْتٍ اَدَبٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ اَدَبٌ وَلِكُلِّ حَالٍ اَدَبٌ فَمَنْ لَزِمَ اٰدَابَ الْاَوْقَاتِ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَمَنْ ضَيَّعَ الْاٰدَابَ فَهُوَ بَعِيْدٌ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ الْقَبُوْلَ ـ

শরীয়তের নির্দেশ পালন করা এবং পূর্ণ শিষ্টতা রক্ষা করার নামই তাসাউফ। যে ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্তের আদব বা শিষ্টতা মান্য করে চলে সে মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। আর যে তা মেনে চলে না সে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

সুফিদের পোশাক-পরিচ্ছদ

গুদরী (এক জাতীয় পোশাক) সাধারণত সুফিদের পোশাক। গুদরী পরিধান করা তাদের মতে সুন্নত। বর্ণিত আছে–

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ الصُّوْفَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ ـ

"হজরত নবি করিম ﷺ পশমী কাপড় ব্যবহার করতেন এবং গাধায় আরোহণ করতেন।"

হুযুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

عَلَيْكُمْ بِلُبْسِ الصُّوْفِ تَجِدُوْنَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ـ

"তোমরা পশমী কাপড় পরিধান কর। তাতে তোমরা হৃদয়ে ঈমানের স্বাদ পাবে।"

মহানবি ﷺ হজরত আয়েশা (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لَا تُضَيِّعِ الثَّوْبَ حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ ـ

"হে আয়েশা। কাপড়ের অপচয় করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরিধান করবে।"

হজরত ওমর (রা) এর কাপড়ে ত্রিশ ত্রিশটি তালি লাগানো থাকত। তিনি বলতেন, যে কাপড়ের মূল্য কম তা-ই ভালো কাপড়। হজরত হাসান (রা) বলেছেন: আমি বদর জিহাদে সত্তরজন সাহাবাকে পশমী কাপড় পরিধান করে জিহাদ করতে দেখেছি। হজরত আবু বকর (রা)-ও পশমী কাপড় পরতেন। হজরত হাসান বসরি বলেন– আমি হজরত সালমান (রা)-কে পশমী কাপড় পরিধান করতে দেখেছি।

হজরত ওয়ায়েজ করনি সম্পর্কে হজরত ওমর, আলী ও হরম ইবনে আব্বাস (রা) বলেন– আমরা তাকে তালিযুক্ত পশমী কাপড় পরিধান অবস্থায় দেখেছি। হজরত হাসান বসরী, মালেক ইবনে দীনার এবং সুফইয়ান ছাওরী এরা সকলেই পশমী পোশাক পরিধান করতেন। মুহম্মদ ইবনে আলী

তিরমিযি তার গ্রন্থ তরিকুল মাশায়েখে লেখেছেন– ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথম দিকে পশমী পোশাক পরিধান করতেন এবং নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। এমনকি তিনি মহানবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলেন এবং মহানবি ﷺ তাকে এরশাদ করলেন– তোমার কি কর্তব্য নয় যে তুমি আমার সুন্নতকে পুনর্জীবিত করার জন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করবে? সাথে সাথেই তিনি নির্জনবাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু এরপরও তিনি মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন না।

হজরত ইবরাহীম আদহাম (র)-ও তালিযুক্ত পশমী কাপড় পরতেন। একবার তিনি পশমী কাপড় পরিধান করেই হজরত ইমাম আবু হানীফার খেদমতে উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্রগণ তাকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতে লাগলেন। ইমাম আবু হানীফা তার পরিচয় তুলে ধরে বললেন, ইনি আমাদের নেতা ইবরাহীম আদহাম। ছাত্রগণ ভাবলেন, ইমাম সাহেব ঠাট্টা করছেন। কিন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন ইমাম সাহেব তো কখনও ঠাট্টা করেন না। অথচ ইনি কীভাবে নেতা হলেন? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন: তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকে নেতা হয়েছেন। আর আমরা নিজেদের কর্মেই ব্যস্ত থাকি।

উপর্যুক্ত হাদীস ও বুযুর্গদের কার্যকরী উদাহরণ ছাড়াও সুফিদের নীতি মহানবি ﷺ এর এই বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মহানবি ﷺ ঘোষণা করেছেন: "যে ব্যক্তি অন্য জাতির চাল-চলন গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যে পরিগণিত।" যেহেতু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশই ছেঁড়া-ফাটা তালিযুক্ত জামা পরেন সেহেতু আল্লাহর বান্দাদের কর্তব্য তাদের অনুসরণ করা আর এটাই সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার পন্থা। এরা বলেন– আমরা আমাদের বাহ্য দিক আল্লাহওয়ালাদের ন্যায় সজ্জিত করি এবং যা কিছু করণীয় করার চেষ্টা করি যেন আমাদের অভ্যন্তরও তাদের মতো হয়ে যায়।

আরও বলেন: আল্লাহওয়ালাদের পোশাক পরলে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সজাগ সতর্ক থাকবে। আর এই সাহায্য করা এভাবে সম্ভবপর যে, আমরা যদি আল্লাহওয়ালাদের মতো পোশাক পরিধান

করে তাদের কৃতকর্মের কোন বিপরীত কাজ করি তাহলে সবাই আমাদের এ কাজের বিরোধিতা করবে এবং বদনাম করবে। এভাবে আমরা আমাদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হব।

গুদরী আমাদের কাছে অতি প্রিয় পোশাক। আমরা গুদরী ও গুদরী পরিধানকারীকে ভালোবাসি।

কারণ হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ –

“যে যেই লোক বা জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হাশরের দিন সে ঐ ব্যক্তি বা জাতির সাথে উঠবে।”

অতএব এই তরিকার শায়খগণ নিজেরাও গুদরী পরিধান করেন এবং তাদের মুরিদদেরও পরিধান করার নির্দেশ দেন, যেন তারা আল্লাহওয়ালাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তাদের রক্ষা করেন।

গুদরী পরিধান করার শর্তাবলি

এই কথা ভুললে চলবে না যে পেশাদার সুফিদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা প্রকৃতপক্ষে তরিকতপন্থী যারা গুদরী পরিধান করা এবং তাদের মুরিদদের পরিধান করানো অত্যাবশ্যক ভাবেন তাদের মতে গুদরী পরিধান করা এবং কাফন পরিধান করা একই বিষয়। কাফন পরিধান করা এবং গুদরী পরিধান করার জন্য একই শর্ত। যেমন মানুষ দুনিয়া হতে এভাবে হাত গুটিয়ে গুদরী পরিধান করেন যেমনভাবে লোক দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাফন পরিধান করে। তারা পার্থিব লোভ-লালসা এবং স্বাদ আহ্লাদ হতে পৃথকতা অবলম্বন করে পুরো জীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে নিযুক্ত করেন। যেমন আল্লাহর পথে সাধনা করার এমন উদাহরণ যে গুদরীধারী তার প্রাণসহ যাবতীয় কিছু আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত। গুদরী পরার আসল নিয়ম যা শায়খগণ প্রচলিত করেছেন তা এই যে মুরিদ যখন ঐ পর্যায়

পৌঁছে তখনই পীর তাকে এই পোশাক দ্বারা ভূষিত করেন তখন থেকে মুরিদও গুদরীর হক আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

তাই শায়েখ নিয়ম হচ্ছে যখন কোন মুরিদ পরকালের প্রার্থী হয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন তিনি মুরিদকে তিন বছর ধরে আদব শিক্ষা দান করেন এবং তাকে তরিকতের সাথে চলার নিয়ম কানুন শিক্ষা দেন। মুরিদ যদি পীরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তবে তার সৌভাগ্য। আর যদি উত্তীর্ণ না হতে পারেন তাহলে পীর বলে দেন কোন তরিকত তোমাকে গ্রহণ করছে না। এই তিন বছরের এক বছর আল্লাহর সৃষ্টির খেদমত করার আদেশ দেন। দ্বিতীয় বছর আল্লাহর হক আদায় এবং তৃতীয় বছর স্বীয় অন্তঃকরণকে হেফাজত এবং পবিত্র করার কাজে লিপ্ত থাকার নির্দেশ দান করেন।

আল্লাহর সৃষ্টির হেফাজতের জন্য দরকার কোন প্রকার তারতম্য না করে সকলকে সমানভাবে সেবা করবে এবং নিজকে তাদের খাদেম মনে করবে। সকলকে নিজের চেয়ে বড় ভাববে এবং তাদের খেদমত করাকে ওয়াজিব মনে করবে। নতুবা নিজকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা এক বিপদ। সুতরাং এই অহংজ্ঞান অবশ্য পরিত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহর দাসত্ব এবং খেদমত মানুষ ঐ সময়ই সঠিকভাবে করতে পারে যখন তার সকল স্বাদ আহ্লাদ পার্থিব হোক বা পারলৌকিক সবকিছু ত্যাগ করতে পারে এবং সকল দিক হতে নিস্পৃহ হয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতে পারে।

অন্তরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পবিত্রকরণ লোকে ঐ সময়ই করতে পারে যখন সে পার্থিব অন্যান্য কিছু হতে অবসর হয়ে পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

যখন এই তিনটি শর্ত পূর্ণ হয়ে যায় তখনই মুরিদকে গুদরী পরতে দেওয়া হয়। কেননা, উপরে বর্ণিত মতে গুদরী পরিধান করা কাফন পরিধান করার সামান্তর।

তরিকত ও ধর্মে একনিষ্ঠতার ভিত্তি পোশাক নয়

কিন্তু গুদরী পরিধান করা বা মুরিদকে পরিধান করানোর ব্যাপারে লক্ষণীয় যে তাসাউফ, তরিকত এবং ধর্মে অন্তরঙ্গতা থাকা কোন ধরনের পোশাকের উপর নির্ভরশীল নয়। তার ভিত্তি হলো মানুষের আমল এবং তার কলব বা আত্মার অবস্থা। যে ব্যক্তি তরিকতের সাথে পরিচিত তার আমিরানা পোশাকও গরিবানা পোশাকে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি তরিকতের সাথে কোন সম্বন্ধ রাখে না তার গুদরীই কেয়ামতের দিন তার জন্য ধ্বংসের কারণস্বরূপ হবে।

হে গুদরীধারী! তোমার যদি এই ইচ্ছাই হয় যে আল্লাহ তোমাকে চিনুন, তাহলে তিনি তোমার এই পোশাক ব্যতীতই তোমাকে চিনিবেন। আর যদি তোমার এই মনস্কামনা হয় যে তোমার এই পোশাক দেখে তোমাকে মানুষেরা আল্লাহর ওলি বলুক, তুমি মানুষের নিকট সুফি নামে পরিচিত হও তখন তোমার দ্বিবিধ অবস্থার যে কোন এক অবস্থা হবে। অর্থাৎ তুমি যদি সত্যিকারের ওলি হও তাহলে এটা হবে তোমার রিয়া। আর যদি ওলি না হও তবে তা হবে তোমার মুনাফেকী।

আর যে ব্যক্তির কাজকর্ম তার বাহ্য আকার প্রকার আর পোশাক পরিচ্ছদ অনুযায়ী না হয় তবে তার ঐ পোশাকই সাক্ষ্যদান করবে যে সে মিথ্যুক। আর এ কথাই বলবে যে তার পোশাক নির্মল নয় বরং ধোঁকাবাজী। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ـ

"তাদের উদাহরণ তাওরাত বাহকদের মতো। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে নি। তারা কিতাববাহক গাধার ন্যায়।"

এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে বাহ্য পরিবর্তনের চেয়ে প্রথমে অভ্যন্তর পরিষ্কার হওয়াই অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়ত হুজুর ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য বিশেষ কোন পোশাক নির্ধারণ করে দেন নি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের জীবন। তখন যা সহজলভ্য ছিল তা-ই পরতেন। অবশ্য তাকওয়া পরহেযগারীর বিরোধী কোন প্রকার পোশাক পরতেন না। অর্থাৎ এমন পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দিয়েছেন– যাতে সতর ঢাকে, খুবই জাঁকজমকপূর্ণ বা অতি হীন না হয়। যে পোশাক পরিধান করলে অহঙ্কার না আসে মেয়েলী ধরনের না হয় এবং মেয়েদের পোশাকে পুরুষালী ঢং যেন না হয়। আবার এমন বিজাতীয় পোশাকও পরবে না যাতে হীনম্মন্যতা প্রকাশ পায়। নিজের ভেতর বাহির একই সাজে সজ্জিত না করে লৌকিকতা অবলম্বন করা ইসলাম কখনও পছন্দ করে না।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَنْعَمَ نِعْمَةً عَلٰى عَبْدٍ اَحَبَّ اَنْ يُّظْهِرَ اَثَرُهَا عَلَيْهِ ـ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কোন প্রকার নেয়ামত দিয়ে থাকেন তখন তিনি চান যে উক্ত নেয়ামতের প্রতিক্রিয়া তার ওপর প্রকাশ লাভ করুক।"

মহান আল্লাহ কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ـ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ۞

"হে নবিবর! আপনি তাদের বলুন আল্লাহ যা তাঁর বান্দার জন্য হালাল করে দিয়েছেন– তা কে হারাম করে দিল? আর কে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস নিষিদ্ধ করল? আপনি ঈমানদারদের বলে দিন প্রকৃতপক্ষে এসব কিছু ঈমানদারদের জন্য এবং কেয়ামতের দিন তো শুধু তাদের জন্যই হবে।"

(সূরা: আল-আরাফ– ৩২)

সঠিক ও মধ্যমপন্থা

যেহেতু আমি আলী ইবনে ওসমান জালাবি পোশাক সম্পর্কে এইমত ও পথের অনুসারী যে যেই পোশাকে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জতা নেই যখন যা সহজলভ্য হয় তা-ই পরি। যখন কাবা পাই তখন তা পরিধান করি আবার যখন গুদরী পাই তখন তা-ই পরি। আবার যখন কিছুই না পাই তখনও আলহাম্দু লিল্লাহ।

বরং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো কোন কিছুকে স্বভাবে পরিণত না করা। কেননা স্বভাবসিদ্ধ বস্তু মানুষের প্রিয়ে পরিণত হয় এবং এটাই তার ধর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

خَيْرُ الصِّيَامِ أَخِيْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

"যত প্রকার নফল রোযা রয়েছে তন্মধ্যে আমার ভাই হজরত দাউদ (আ) এর নফল রোযাই উৎকৃষ্ট।"

সাহাবায়ে কেরাম বললেন: তা কেমন রোযা? এরশাদ করলেন: তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফতার করতেন যাতে রোযা রাখা না রাখার স্বভাব নফসের না হয় এবং যার দরুন তিনি নফসের ক্রীড়নকে পরিণত না হন।

আমার পীর আবুল ফজল মুহম্মদ ইবনে হাসান খাতলী (র) এরও এই অভ্যাস ছিল। তিনি সুফিদের পোশাক পরা হতে দূরে থাকতেন। তিনি যা পাইতেন তাই পরতেন। হজরত মোওয়াইয়েদ (র)-ও এই নীতির অনুসারী ছিলেন। শায়খ মুহম্মদ ইবনে হানীফ (র) একাধিক্রমে বিশ বছর ধরে চট পরিধান করেছিলেন। প্রতি বছরে চারটি চিল্লা করতেন। প্রতি চিল্লায় হাকিকতের জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে একখানি করে গ্রন্থ রচনা করতেন।

তার সমসাময়িক একজন আলেম মুহম্মদ ইবনে যাকারিয়া পারস্যে থাকতেন। তিনি কখনও গুদরী পরিধান করতেন না। মুহম্মদ ইবনে হানীফের কাছে জিজ্ঞেস করলেন: গুদরী পরিধান করার শর্ত কী?

তিনি জবাব দিলেন: সাদা জামা যা মুহম্মদ যাকারিয়া পরিধান করেন। স্মরণ রেখো তার জন্য ঐ পোশাক পরিধান করা এমনই ওয়াজিব যেমন আমার জন্য টচ পরিধান করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ঐটি এবং আমার জন্য এটি দান করেছেন।

মালামত বা নিন্দাবাদ

মালামাতের আভিধানিক অর্থ তিরস্কার, ভর্ৎসনা করা। এখানে মালামত শব্দের অর্থ হচ্ছে নিজের প্রতি ভর্ৎসনা টেনে আনা। তরিকতের মাশায়েখদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আত্মসংশোধন এবং নফসের শিষ্টতার লক্ষ্যে মালামতের পথ অনুসরণ করে থাকেন। তারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না করে প্রকাশ্যে এমন কিছু কাজ করেন যেন লোক তাদের মন্দ বলে এবং কষ্ট দেয়। তারা বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহর প্রেমিক এবং সত্যের অনুসারীকে ভর্ৎসনা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারও প্রতি কোন ধরনের অন্যায় উৎপীড়ন না করে লোকের নিকট হতে নিন্দাবাদ পাওয়াকে আল্লাহর নিকট প্রশংসনীয় হওয়ার সোপান মনে করেন।

তারা তাদের এই নীতির প্রমাণস্বরূপ দলিল পেশ করেন যে মহানবি ﷺ যিনি সত্যবাদীদের নেতা ও ইমাম। যতদিন তার নিকট ওহি অবতীর্ণ হয় নি ততদিন তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার নিকটই সৎলোক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। মানুষেরা তাকে সত্যবাদী, বিশ্বাসী এবং আল-আমীন বলত। কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ তাকে স্বীয় বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করলেন তখন তারা তাকে সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও আমীন নামে ডাকত তারা তাকে যাদুকর; পাগল এবং মিথ্যাবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে থাকে। নানা প্রকার অশ্লীল কথা বলে দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করে দিল।

তথাপি তারা তাদের কথায় প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেন।

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۞ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۞

আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ ভর্ৎসনাকারীদের ভর্ৎসনার কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। এই গুণ আল্লাহর মেহেরবানি ব্যতীত কারও মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না।
(সূরা: আল-মায়িদাহ- ৫৪)

কাজেই আমরা নিন্দাবাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছি।

এই সম্প্রদায়ের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন নিয়ম হলো- যে তাকে স্মরণ করবে; অন্যকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে পড়ে থাকবে যাবতীয় সৃষ্টিই তার ক্ষতিসাধনে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা বলেন, এই অবস্থা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা ও খাছ মেহেরবানির ফল এই যে এভাবে তিনি তার বন্ধুদের অন্যের দৃষ্টি থেকে গোপনে রাখেন। এমনকি তাদের হেফাজতের এমন সুব্যবস্থা করেন যে তারা নিজেরা স্বীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলি দেখতে পান না যেন তারা অহঙ্কারী, গর্বিত হয়ে ধ্বংস হয়ে না যান।

কাজেই আল্লাহ তায়ালা মালামত সৃষ্টি করার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে নফসে লাওয়ামা (ভর্ৎসনাকারী নফস) সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেন এটাই সত্যের সন্ধানীকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তার খারাপ কাজের দরুন নফসে লাওয়ামা যেন তাকে ভর্ৎসনা করে। আবার সওয়াবের কাজ করলেও যেন ভর্ৎসনা করে যে, তোমার এই পুণ্যের কাজ যথারীতি সম্পাদন হয় নি বরং ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এ কারণে করেছেন যে এই পথের পথিকদের জন্য অহঙ্কার ও গর্ব করা অপেক্ষা ক্ষতিকারক আর অন্য কোন কিছু নেই। অহঙ্কার ও গর্বের একমাত্র প্রতিষেধক হলো নিজকে নিন্দাবাদ বা ভর্ৎসনা করা।

দুটি কারণে মানুষের মধ্যে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় প্রথমত: তার কোন কাজ মানুষের কাছে খুবই পছন্দনীয় হয় এবং লোকে তার কৃতকর্মের জন্য তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

দ্বিতীয়ত: তার কাজ তারই কাছে ভালো মনে হয় এবং তজ্জন্য নিজে নিজকে প্রশংসার পাত্র মনে করে। ফলে তার মধ্যে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

ফলে আল্লাহ তায়ালা তার বন্ধুদের প্রতি অতি মেহেরবান হয়ে এই দুটি দ্বারই রুদ্ধ করে দেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন মানুষেরা তাকে পছন্দ করে না। আর যে ব্যক্তি নিজে নিজকে পছন্দ করে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না। ইবলীস নিজের কাজ নিজে পছন্দ করে বলেছিল- أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ "আমি তার অপেক্ষায় ভালো।" এ কারণে সে আল্লাহর লানতে ডুবে গেল।

হজরত আদম (আ)-কে না ফেরেশতাগণ পছন্দ করলেন আর না শয়তান। আর না তারা নিজে নিজকে পছন্দ করলেন। যার দরুন আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম (আ)-কে পছন্দ করলেন। ফেরেশতাগণ হজরত আদম (আ)-কে পছন্দ না করার কারণস্বরূপ বললেন:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۞

আপনি কি আদমকে এজন্য সৃষ্টি করবেন যে, সে দুনিয়াতে গিয়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? (সূরা আল-বাকারা- ৩০)

ইবলিস বলল:

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞

আমি আদম অপেক্ষা উত্তম, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। (সূরা: আল-আরাফ- ১২)

হজরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۞

হে আমার প্রভু! আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাব।
(সূরা: আর-আরাফ- ২৩)

যার দরুন আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরকে খিলাফত দান করে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করলেন।

মানুষের পক্ষ হতে নিন্দাবাদ পাওয়ার বাহ্য কারণ এই যে, সাধারণত তাদের আভ্যন্তরীণ দোষের দরুন তারা আল্লাহর বন্ধুদের চিনতে সক্ষম হয় না। তাই হাদীসে বর্ণিত আছে, নবি করিম ﷺ হজরত জিব্রাঈল (আ) হতে এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহ পাক হতে শুনেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَوْلِيَائِيْ تَحْتَ قَبَائِيْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ اِلَّا أَوْلِيَائِيْ ۞

আমার বন্ধু আমার জামার আস্তিনের মধ্যে থাকে। আমি ও আমার বন্ধুগণ ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারে না।

মালামাত তথা তিরস্কারের শর্ত

শায়খগণ বলেন, মালামাতের জন্য কয়েকটি শর্ত থাকতে হবে। যেমন– নিন্দাবাদ করার জন্য মানুষদের এমনভাবে প্রস্তুত বা অগ্রণী করতে হবে যেন এতে শরীয়তের কোন ধরনের অনিষ্ট না হয়। এজন্য কবীরা গুনাহ তো দূরের কথা, এমনকি সগীরা গুনাহ করাও বৈধ নয়। যে কোন অবস্থায় শরীয়ত পালন করা কর্তব্য।

হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, একবার তিনি হেজাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। শহরবাসী তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিপুল প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং এক স্থানে সমবেত হলো।

হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) লোকদের এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ করে মনে মনে আংশকা করলেন যে, আমার প্রতি মানুষজনের এ সম্মান প্রদর্শন আমার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে। এ কারণে তিনি বাজারে পৌঁছামাত্র থলে থেকে একটি রুটি বের করে সবার সামনে খাওয়া আরম্ভ করলেন। এটা ছিল রমজান মাস। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে আহার করতে দেখে সবাই বিমুখ হয়ে ফির গেলো। শুধু তাঁর সাথে আগত একজন মুরিদই থেকে গেল। মূলত তাঁর এ কাজ শরীয়ত বিরোধী

ছিল না। কারণ তখন তিনি মুসাফির ছিলেন। মুসাফিরের জন্য সফরের অবস্থায় রোযা না রাখাও জায়েয আছে।

তবে আমরা এখন এমনই এক সময় অতিক্রম করছি যখন লোকের নিন্দাবাদ শোনার জন্য বাহ্যত কোন দোষের কাজ করারও দরকার হয় না। বর্তমানে কেউ যদি লোকের নিন্দাবাদ শুনতে ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যেন দু' রাকাত নফল নামাযে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। অথবা সারাদিন নামাযে কাটিয়ে দেয় এবং অন্যদেরও এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাহলে সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়ে যাবে।

সঠিক পন্থা

আমি আলী ইবনে উসমান জালারীর মত হলো এই যে, লোকের নিন্দালাভের কামনা করা উচিত নয়। কেননা এটা রিয়ার মধ্যে গণ্য। আর রিয়া হলো মুনাফিকী বা কপটতা। যেমন রিয়াকারী ব্যক্তি মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্য কৃত্রিমতার সাথে কোন একটি পথ অবলম্বন করে থাকে, তেমনি নিন্দা কুড়ানোর অভিপ্রায়েও এমন কোন পথ অবলম্বন করে থাকে যেন মানুষ তাকে দোষারোপ করে। অতএব বাহ্য দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় ব্যক্তিই আল্লাহ ব্যতীত মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা কুড়ানোর জন্য আগ্রহী। আসল দরবেশ ঐ ব্যক্তি যাঁর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক থাকে না, তাঁর কোন কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সাধিত হয় না। তিনি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর পথে চলেন এবং দীনি কোন কাজই বর্জন করেন না। লোকে তাঁর কাজের প্রশংসা করবে কিংবা নিন্দা করবে, এজন্য তিনি কোন কাজেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۞

তারা কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করে না।

নবি করিম ﷺ কখনো মানুষের নিন্দালাভের জন্য কোন কাজ করেন নি। তিনি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য চেষ্টা করতেন।

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, একদল নিজেরাই মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অন্তরে এ ধারণা পোষণ করে যে, মানুষ তার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ। এ ধারণা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তুমি নিজকে বিরাট কিছু ভাবা পরিত্যাগ কর। তোমাকে কেউ দেখবে না। বিপদ বাইরে নয়, বরং তোমার অভ্যন্তরে। এর থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা কর। দুনিয়া হতে দূরে থেকে আল্লাহর পথে চল, মানুষ তোমার সম্পর্কে যা বলে, তা বলতে দাও।

হজরত শায়খ আবূ তাহের হেরাতী (র) একদিন গাধায় আরোহণ করে বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর একজন মুরিদ গাধার লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছিল। এক লোক উঁচু আওয়াজে বলতে লাগলো, দেখ! যিন্দীক পীর এসে গেছে। মুরিদ একথা শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে ঐ লোককে মারার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। অপরপক্ষে ঐ ব্যক্তির সাথিরাও একইভাবে আক্রমণে উদ্যত হলো। এ সময় শায়খ মুরিদকে বললেন, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং চুপ থাক, তবে আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলব যাতে তোমার সকল দুঃখ দূরীভূত হয়ে যাবে। এতে মুরিদ চুপ হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছার পর শায়খ মুরিদকে একটি বাক্স আনতে বললেন, বাক্স খোলার পর দেখা যায় এতে অনেকগুলো পত্র রয়েছে। তিনি মুরিদকে বললেন, এগুলো পড়ে দেখ, কেউ আমাকে শায়খুল ইসলাম বলে আখ্যা দিয়েছে। আবার কেউ শায়খ জকী, কেউ জাহেদ, কেউ শায়খ হারামাইন ও অন্যান্য উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছে। অথচ আমি এর কোন উপাধিরই উপযুক্ত নই। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাকে উপাধি দিয়েছে। যদি ঐ ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুযায়ী আমাকে একটি উপাধি দিয়ে থাকে, এতে আমাদের ঝগড়া করার কী দরকার?

আল্লাহর পথে একনিষ্ঠভাবে চলতে গিয়ে যদি কেউ তার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, যদি এটাকে বিপদ না ভেবে পরীক্ষা মনে করে এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে বলে বিশ্বাস রাখে, তবে এর মাধ্যমে এমন কিছু লাভ হয় যা অন্য কোন উপায়ে হয় না।

একবার আমি (আলী ইবন উসমান জালাবী) কোন বিপদে পড়ে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে নানা প্রকার চেষ্টা ও তদবীর করলাম কিন্তু কোনভাবেই উদ্ধার পেলাম না। এর আগে অপর একটি বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি হজরত শায়খ আবূ ইয়াযীদ (র)-এর কবরে খাদেমের কাজ করি। এতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বর্তমান সমস্যার জন্য আমি অনবরত তিন মাস তাঁর কবরে খেদমত করি। প্রত্যক দিন তিনবার গোসল এবং ত্রিশবার উজু করি। কিন্তু আমার সমস্যার কোন সমাধান হলো না। অবশেষে আমি খোরাসানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায় আমি এক খানকায় হাজির হলাম। সেখানে সুফিদের একটি দল অবস্থান করছিল। আমার গায়ে ছিল মোটা চটের গুদরী, হাতে লাঠি এবং একটি পাত্র। খানকার সুফিগণ কেউ আমার পরিচিত ছিল না। তারা আমাকে অবজ্ঞার নজরে দেখতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ব্যক্তি আমাদের তরিকাভুক্ত নয়। তবে এটা তারা সঠিকই বলছিল যে, আমি তাদের দলভুক্ত নই। রাত অতিবাহিত করার জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে সেখানে থাকতে হয়েছে। তারা আমাকে এক কোণে বসতে দিয়ে খাবার জন্য একখানা শুকনো রুটি এনে দিল। অতঃপর তারা দোতালায় গিয়ে ভোজনে লিপ্ত হলো। তাদের সুস্বাদু খাবারের সুগন্ধ আমার নাকে আসছিল। তারা আমার ব্যাপারে যে বিরূপ সমালোচনা করছিল তার আওয়াজও আমার কানে আসছিল। অবশেষে তারা তরমুজ খেয়ে খোসাগুলো আমার দিকে নিক্ষেপ করছিল। মনে হচ্ছিল যে, আমাকে এভাবে ঠাট্টা করে তারা আনন্দ উপভোগ করছিল।

আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার পোশাক না পরতাম তা হলে ঐ সুফিদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হতাম। কিন্তু এ সময় আমার সব কিছুই ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাই তারা আমাকে যতই উৎপীড়ন করছিল, আমি ততই আনন্দিত হচ্ছিলাম। অবশেষে ফল হলো এই যে, তাদের উৎপীড়ন করার মধ্যেই আমার সমস্যা ও বিপদের সমাধান হয়ে গেল যার জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার করে সফরে বের হয়েছিলাম।

হজরত উসমান (রা)-এর ঘটনা

যদি কোন বুযুর্গ স্বীয় নফস এবং অন্যকে সংশোধন ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করে, যাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় কিন্তু মানুষ এটাকে হীন কাজ মনে করে, তথাপি এতে দূষণীয় কিছু নেই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন হজরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে স্বীয় খেজুর বাগান থেকে এক বোঝা লাকড়ি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর অধীনস্থ চাকর ও অন্যান্য লোকজন ঐ দৃশ্য দেখে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা তো আপনার খেদমতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আছি।

হজরত উসমান (রা) বললেন:

أُرِيْدُ اَنْ اُجَرِّبَ نَفْسِىْ ۞

আমি ইচ্ছা করেছি, আমার নফসকে একটু পরীক্ষা করে নিই যে, এ কাজে নফস কি কোন অপমান বোধ করে?

মূলত তাঁর এ কাজের দ্বারা জনগণকে এটাই বুঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন বৈধ ও হালাল কাজ করলে এর দ্বারা মানুষের সম্মানের কোন লাঘব হয় না, বরং পাপ কর্ম ও আল্লাহর নাফরমানী দ্বারা মানুষের সম্মান হ্রাস পায় এবং মনুষ্যত্বের বিলোপ ঘটে।

খোলাফায়ে রাশেদীন (র) তরিকতের ইমাম ছিলেন

হজরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সুফিদের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম তথা পথ প্রদর্শক হলেন আমিরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি হলেন ইসলামের মুকুট, আহলে তাজরীদের[১] ইমাম এবং আহলে তাফরীদের[২] বাদশাহ। শায়খগণ তাঁকে সাহেবে মোশাহাদার অগ্রণী হিসেবে গণ্য করেছেন। কঠোর স্বভাব, কর্ম-নিপুণতার জন্য হজরত উমর (রা)-কে সাহেবে মোজাহাদার অগ্রণী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। হজরত আবু বকর (রা)-এর সাহেবে মোশাহেদা হওয়ার প্রথম প্রমাণ হলো এই যে, তাঁর রিওয়ায়েত ও হিকায়েত (বর্ণনা কাহিনি) খুবই কম। কথায় স্বল্পতা তাঁর সাহেবে মোশাহাদা হওয়ার আলামত। কেননা মোশাহাদায় কথা কম হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো এই যে, তিনি রাতের নামাযে অনুচ্চঃস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং হজরত উমর (রা) উচ্চঃস্বরে তিরাওয়াত করতেন। মহানবি ﷺ হজরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রাতের নামাযে কেন অনুচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত কর? তিনি বললেন:

أَسْمَعُ مَنْ أُنَاجِيْهِ ـ

আমি ঐ আল্লাহকে শুনাচ্ছি যিনি চুপে চুপে বললেও শ্রবণ করে থাকেন এবং যিনি আমার থেকে দূরে নন।

---

১. اهل تجريد দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যাঁরা সামান্যতম অপবিত্রতা ও দর্যতা থেকেও মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন।

২. اهل تفريد দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ভুল ও শুদ্ধকে পৃথক করে নেন।

যখন হজরত উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর! তুমি উচ্চঃস্বরে কেন কুরআন তিলাওয়াত কর?

তিনি জবাব দিলেন:

اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ اَىِ النَّائِمَ وَاُطْرِدُ الشَّيْطَانَ ـ

আমি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে বিতাড়িত করি।

হজরত আবূ বকর (রা)-এর জবাব ছিল মোশাহাদার এবং হজরত উমর (রা)-এর উত্তর ছিল মোজাহাদার প্রমাণ।

হজরত আবূ বকর (রা) কত উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন এর প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মহানবি ﷺ তাঁর সম্পর্কে হজরত উমর (রা)-কে একবার বলেন:

هَلْ اَنْتَ اِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِىْ بَكْرٍ ـ

তোমার পুণ্য আবূ বকরের সমস্ত পুণ্যের একটির সমান।

ইমাম মালিক (র) তাঁর 'মুয়াত্তা' নামক হাদীসে হজরত আবূ বকর (রা)-এর চরিত্র ও ফজিলতের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

১. হজরত আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ

كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ـ فَقَالَ

اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا عَلٰى مَنْ يُدْعٰى

مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ

الْاَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ تَكُوْنُ مِنْهُمْ ـ

যে ব্যক্তি আরকান-আহকাম আদায় করে যথাযথভাবে নামায আদায় করবে, তাকে বেহেশতের 'বাবুস সালাত' হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদ করবে, তাকে জান্নাতের 'বাবুল জিহাদ' হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি সদকা প্রদানে অগ্রগামী থাকবে, তাকে বেহেশতের 'বাবুস্ সাদাকাহ' হতে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে রোযা আদায় করবে, তাকে জান্নাতের 'বাবুর রাইয়্যান' হতে আহ্বান করা হবে। এ বাণী শুনে হজরত আবু বকর (রা) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! যাকে ঐ সমস্ত দরোজা হতে আহ্বান করা হবে তার আর কি চাওয়ার আছে? এমন কোন সৌভাগ্যবান হবে কি যাকে এর সকল দরোজা হতেই আহ্বান করা হবে? মহানবি ﷺ বললেন: হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে।

২. আম্মাজান হজরত আয়িশা (রা) বলেন–

رَاَيْتُ ثَلٰثَةَ اَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِىْ حُجْرَتِىْ فَقَصَصْتُ

رُؤْيَاىَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ـ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدُفِنَ فِىْ بَيْتِهَا قَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ

هٰذَا اَحَدُ اَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا ـ

আমি (আয়িশা) স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনটি চাঁদ আমার ঘরে পতিত হয়েছে। আমি আমার স্বপ্নের কথা হজরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। হজরত আয়িশা (রা) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁকে আমার ঘরে দাফন করা হয়। তখন হজরত আবূ বকর (রা) আমাকে বলেন, এ হচ্ছে তোমার চন্দ্রসমূহের মধ্যে একটি। ইনিই হলেন সবচেয়ে উত্তম।

এখানে উল্লেখ্য যে, হজরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে অপর যে দু'জনকে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন হজরত আবূ বকর (রা) এবং হজরত উমর (রা)।

৩. হজরত যায়দ ইবনে আসলাম (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন:

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) دَخَلَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْذِبُ لِسَانَهٗ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ مَهْ؛ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هٰذَا اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ ـ

একবার হজরত উমর (রা) হজরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছেন। এটা দেখে হজরত উমর (রা) বলেন, হায় হায়! এটা আপনি কী করছেন? আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। হজরত আবূ বকর (রা) বলেন, যে অনিষ্টের দরুন আমি বিপদগ্রস্ত, তা এ জিহ্বার কারণেই হয়েছে।

৪. হজরত আবূ নজর (রা) বলেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِشُهَدَاءِ اُحُدٍ: هٰؤُلَاءِ اَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ـ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلَسْنَا بِاِخْوَانِهِمْ؟ اَسْلَمْنَا كَمَا اَسْلَمُوْا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوْا ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، بَلٰى وَلٰكِنْ لَا

اَدْرِىْ مَا تُحْدِثُوْنَ بَعْدِىْ ـ قَالَ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ بَكٰى، قَالَ اَئِنَّا لَكَائِنُوْنَ بَعْدَكَ ـ

উহুদ যুদ্ধে শাহাদতবরণকারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন: আমি তাঁদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করব। হজরত আবূ বকর (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের মধ্যে গণ্য হব? তাঁদের ন্যায় আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাঁদের ন্যায় আমিও জিহাদ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ, তুমি এসব কিছুই করেছ, তবে আমি জানি না তুমি আমার পর কি করবে? বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে হজরত আবূ বকর (রা) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন এবং বলেন, আপনার পরও কি আমি জীবিত থাকব?

৫. হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) বলেন:

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رض قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فِىْ كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ، فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ ـ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ خُذُوْا هٰذَا الثَّوْبَ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ قَدْ اَصَابَهٗ مِشْكٌ اَوْ زَعْفَرَانُ، فَاغْسِلُوْهُ ثُمَّ كَفِّنُوْنِىْ مَعَ ثَوْبَيْنِ اٰخَرَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَمَا هٰذَا؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اَلْحَىُّ اَحْوَجُ اِلَى الْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ وَاِنَّمَا هٰذَا لِلْمَهْلَةِ ـ

হজরত আবূ বকর (রা) মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় হজরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, মহানবি ﷺ-এর কাফনে কয়টি কাপড় ব্যবহার করা হয়? হজরত আয়িশা (রা) বলেন, সুহুলের তিনটি সাদা চাদর। হজরত আবূ বকর (রা) বললেন, এই কাপড়গুলো নাও। এতে মিশ্‌ক কিংবা জাফরান লাগানো আছে, তা ধুয়ে নিবে। অন্য আর দু'খানা কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন পরাবে। হজরত আয়িশা (রা) বলেন, এত পুরাতন কাপড় দিয়ে কেন কাফন দেব? হজরত আবূ বকর (রা) বলেন, মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিতদের জন্য নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি। কাফনতো রক্ত ও পুঁজের জন্য।

হজরত আবূ বকর (রা) বলতেন–

دَارُنَا فَانِيَةٌ وَاَحْوَالُنَا عَارِيَةٌ وَاَنْفَاسُنَا مَعْدُوْدَةٌ وَكَسْلُنَا مَوْجُوْدَةٌ ـ

আমাদের এ ঘরবাড়ি অস্থায়ী, আমাদের পার্থিব উপকরণসমূহ ধারস্বরূপ, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসসমূহ সীমিত। তথাপি আমরা পরকালকে ভুলে গিয়েছি, অলসতায় ডুবে রয়েছি।

তাঁর এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মূলত যে ঘরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এর নির্মাণ ও অগ্রগতিকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে বৃথা পরিশ্রম ও কষ্ট করা, যে পার্থিব উপকরণ নিজের নয়, তার উপর ভরসা করা, যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা নির্ধারিত এবং যে কোন মুহূর্তে অকস্মাৎ শেষ হয়ে যেতে পারে, তার উপর নির্ভর করা এবং তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া বোকামী ব্যতীত আর কী হতে পারে?

হজরত আবূ বকর (রা) তাঁর মুনাজাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দরবারে আরজ করতেন–

اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ لِىَ الدُّنْيَا وَزَهِّدْنِىْ عَنْهَا ـ

হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও, তবে এর ঘূর্ণাবর্তে নিমগ্ন হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর।

অর্থাৎ দুনিয়ার আসবাবপত্র ও এর আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহ আমাকে দান কর। যেন আমি খুব আন্তরিকতার সাথে তোমার সন্তুষ্টির কাজ করতে সক্ষম হই, তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে পারি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদের মধ্যে গণ্য হতে পারি। তবে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও এমন মহব্বত থেকে রক্ষা কর যার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তোমার থেকে দূরে চলে যাব।

হজরত আবূ বকর (রা) পৃথিবীর প্রতি কিরূপ অনাসক্ত ছিলেন এবং তাঁর দরবেশী কত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ছিল তা তাঁর খিলাফতপূর্ব ভাষণের মাধ্যমেই বুঝা যায়। তিনি বায়য়াতে খিলাফতের পর বলেন:

وَاللهِ مَاكُنْتُ حَرِيْصًا عَلَى الْاِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا كُنْتُ فِيْهَا رَاغِبًا وَلَا سَاَلْتُهَا اللهَ قَطُّ فِىْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَمَالِىْ فِى الْاِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ ـ

আল্লাহর কসম! আমি দিন ও রাতের এক মুহূর্তও এ খিলাফতের আশা পোষণ করিনি। এমন কি এর জন্য আমি আমার মধ্যে কোন প্রকার আনন্দবোধও করি নি। কখন আমি এর জন্য প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি নি। এমনকি খিলাফতে আমার জন্য কোন সুখ-শান্তি আছে বলেও আমি মনে করি নি।

অতঃপর তিনি বলেছেন–

اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنْ عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ ـ

আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকি, তোমরাও ততদিন আমার অনুগত থাকবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী

করি, তবে আমার নির্দেশ পালন করা তোমাদের উপর জরুরী ও ওয়াজিব নয়।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে كمال صدق তথা পরিপূর্ণ সত্যতা দান করেন তখন তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন এবং আল্লাহ তাঁকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। যদি ফকির হওয়ার নির্দেশ আসে তবে ফকির হয়ে যান। আর যদি আমির হওয়ার নির্দেশ আসে তাহলে আমির হয়ে যান। মোটকথা আল্লাহর নির্দেশের কাছে তিনি আপাদমস্তক নত করে দেন, আত্মসমর্পণ করেন।

এটাই ছিল হজরত আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা। এমনকি তিনি একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতিই অনুগত ছিলেন না; বরং তিনি মুসলমানদের হেদায়েতের লক্ষ্যে বলেছেন, যদি তাঁর দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হয়, তবে কেউ যেন তাঁর অনুগত না থাকে। এ কারণেই তিনি শরীয়ত ও হাকিকতের স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমাম বা নেতা ছিলেন।

হজরত উমর ফারুক (রা)

গুদরী পরিধান এবং কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করার দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনীন হজরত উমর (রা) ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। ধর্মীয় জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা ও আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন থাকাই ছিল হজরত উমর ফারুক (রা)-এর বৈশিষ্ট্য। মহানবি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন–

اَلْحَقُّ يَنْطِقُ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ ـ

উমরের মুখ থেকে সত্য কথাই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তিনি আরো বলেছেন–

قَدْ كَانَ فِى الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ مِنْهُمْ فِىْ اُمَّتِىْ فَعُمَرُ ـ

পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে মুহাদ্দিস (ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী) ছিলেন। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ তা হয় তবে তিনি হবেন হজরত উমর (রা)।

হজরত উমর ফারুক (রা)-এর মর্যাদা এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হজরত জিব্‌রাঈল (আ) নবি করিম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে বললেন–

قَدِ اسْتَبْشَرَ يَا مُحَمَّدُ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ ـ

হে মুহাম্মদ! উমরের ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আসমানবাসী আনন্দ উৎসব প্রকাশ করছে।

১. ইমাম মালিক (র) তাঁর হাদীসগ্রন্থ মুয়াত্তায় হজরত উমর (রা)-এর সীরাত অংশে হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সূত্রে বলেছেন–

رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرُقَعٍ ثُلْثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ

হজরত আনাস (রা) বলেছেন, আমি হজরত উমর (রা)-কে খিলাফতকালে তাঁর দু' কাঁধে তিন তালিযুক্ত জামা পরিধান করতে লক্ষ করেছি।

২. অন্য এক রেওয়ায়েতে হজরত আনাস (রা) বলেন–

رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَطْرَحُ لَهٗ مَاءٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَاْكُلُهٗ حَتّٰى يَاْكُلَ حَشْفَهَا ـ

আমি হজরত উমর (রা)-কে খিলাফত আমলে দেখেছি যে, তাঁর কাছে কিছু খেজুর পড়ে আছে এবং তিনি সেগুলো খাচ্ছেন। এর মাঝে কিছু শুকনা ও খারাপ খেজুরও ছিল। তিনি শুকনা ও খারাপ খেজুরও খাচ্ছিলেন।

৩. হজরত আনাস (রা) আরো বলেছেন–

خَرَجْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ حَائِطاً وَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَبَيْنِىْ وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِىْ جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، بَخْ بَخْ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهَ اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ ـ

আমি একদিন হজরত উমর (রা)-এর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার পথে একটি প্রাচীর ঘেরা স্থানে পৌছলাম। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীরের আড়াল ছিল। এ অবস্থায় আমি শুনছিলাম তিনি নিজকে লক্ষ করে বলেছেন, হে খাত্তাবের পুত্র উমর! তোমার উচিত তাকওয়া অর্জন করা এবং সৎপথে চলা। অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবেন।

৪. হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বর্ণনা করেন, একদিন হজরত উমর (রা) দুধ পান করেন। দুধ তাঁর খুব পছন্দ হওয়ায় তিনি প্রদানকারীকে জিজ্ঞেস করেন, এ দুধ তুমি কোথায় পেয়েছ? লোকটি জবাব দিল, অমুক ঝরনার পাশে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকটি সরকারি উট পানি পান করানোর জন্য আনা হয়েছিল। রাখাল ঐ উটের দুধ দোহন করে আমাকে কিছু দিয়েছিল। আমি আপনাকে উক্ত দুধ থেকে কিছুটা পান করতে দিয়েছি। এ কথা শুনেই হজরত উমর (রা) মুখের ভিতর আঙুল প্রবেশ করালেন এবং বমি করে দুধ ফেলে দিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, সদকার (সরকারি) উটের দুধ ঐ মুসাফির ব্যক্তির জন্য পান করা বৈধ ছিল এবং হজরত উমর (রা)-এর জন্যও ছিল সম্পূর্ণ বৈধ। এতে শরীয়ত বা নৈতিকতার দিক থেকে কোন অনিষ্ট বা দোষ ছিল না। কিন্তু হজরত উমর (রা) এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ সতর্কতা এজন্য অবলম্বন করেছেন যে, যাতে তাঁর কাজ দ্বারা সরকারি সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে কেউ বৈধতার সুযোগ গ্রহণ না করে। এ থেকে হজরত উমর (রা)-এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং আল্লাহর মহব্বতে তাঁর আন্তরিকতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার অনুমান করা যায়।

৫. হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার হজরত উমর (রা)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ এবং উবায়দুল্লাহ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেইরাক গিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা বসরার গভর্নর হজরত আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁদের দেখে খুব সন্তুষ্ট হন এবং আদর আপ্যায়ন করেন। অতঃপর বলেন, আমার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু করার চেষ্টা করতাম যা তোমাদের উপকারে আসে। তবে হাঁ, আমার কাছে বায়তুল মালের (সরকারি) কিছু টাকা আছে যা আমি আমিরুল মুমিনীনের কাছে প্রেরণ করব। এ টাকা দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পার। তাঁরা বললেন, যদি এরূপ হয়, তবে ভালই হবে।

হজরত আবু মূসা আশআরী (রা) উক্ত টাকা তাঁদের প্রদান করেন এবং তা খলিফার নিকট পৌছে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে এ টাকা তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য হজরত উমর (র)-কে পত্র দিয়ে অবহিত করেন। হজরত আবদুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ ঐ টাকা দিয়ে বসরা থেকে কিছু পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং মদিনায় এনে তা বিক্রি করেন। এতে তাঁরা কিছু লাভবান হন। এরপর যখন তাঁরা ঐ টাকা হজরত উমর (রা)-এর কাছে প্রদান করেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ পরিমাণ টাকা কি সকল সৈন্যকে প্রদান করা হয়েছে? তাঁরা উত্তরে বললেন, না, দেওয়া হয় নি। তখন হজরত উমর (রা) বলেন, তোমরা খলিফার পুত্র বলেই তোমাদের হজরত আবু মূসা আশআরী এ সুযোগ দিয়েছেন। অতএব লাভসহ সমস্ত টাকা জমা দাও।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোন কথা বললেন না। তবে হজরত উবায়দুল্লাহ আরজ করলেন, আমিরুল মুমিনীন! এটা কি ঠিক হবে? যদি লোকসান হতো কিংবা সবই নষ্ট হয়ে যেত, তবে তো আমাদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।

হজরত উমর (রা) বললেন, না! সবই ফিরিয়ে দিতে হবে। এবারও হজরত আবদুল্লাহ (রা) চুপ রইলেন এবং হজরত উবায়দুল্লাহ (রা) তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আমার মতে তাদের লভ্যাংশ দেওয়া যেতে পারে। হজরত উমর (রা) লভ্যাংশ প্রদানের বিষয়টি গ্রহণ করেন। সুতরাং মূল টাকাসহ লভ্যাংশের অর্ধেক তাঁদের নিকট থেকে আদায় করেন এবং লাভের বাকি অর্ধেক উভয়কে প্রদান করেন।

এদ্বারাও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত উমর (রা) কিরূপ সতর্ক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

৬. হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) মদিনায় দুর্ভিক্ষের বছরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

হজরত উমর (রা)-এর খিলাফতের আমলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন হজরত উমর (রা) প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন পর্যন্ত জনগণ পূর্বের মতো স্বচ্ছলতার সাথে পানাহার করতে না পারবে, ততদিন আমি ঘি অথবা ঘি দ্বারা তৈরি কোন খাদ্য গ্রহণ করব না।

৭. ইমাম মালিক (রা) তার হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন–

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بَلَدَ رَسُوْلِكَ ـ

হজরত উমর (রা) মুনাজাত করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার পথে জীবন উৎসর্গ করার সৌভাগ্য দান কর এবং তোমার রাসূলের শহরেই যেন মৃত্যুবরণ করতে পারি-এ মুনাজাত কবুল কর।

হজরত উমর (রা) আরও বলেছেন, তাকওয়ার মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত ধর্মের অনুসারী হওয়ার মাঝে গৌরব ও মর্যাদা, চরিত্রবান হওয়াই বাহাদুরি; বীরত্ব বা কাপুরুষতা অন্তরের বিষয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, দান করেন। কাপুরুষ অবশ্য বিপদে পিতা-মাতাকেও ত্যাগ করে পলায়ন করে। অপরদিকে বীরপুরুষ একজন অপরিচিত ব্যক্তির জন্যও রুখে দাঁড়ায়।

হজরত উমর (রা) বলতেন, নির্জনতা অবলম্বনের মাঝেই আরাম ও শান্তি নিহিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জনসমাজ ছেড়ে অরণ্যবাসী হয়ে যেতে হবে। নির্জনতা দু'প্রকার।

১. মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করা;

২. মানব সমাজে বাস করে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কলবকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা।

এ অবস্থায় যে ব্যক্তি সমাজে বাস করেও তাদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে। এটা হলো খুব উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থা। এ অবস্থার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ছিলেন হজরত উমর (রা)। দৃশ্যত তিনি খিলাফত ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তবে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল মহান আল্লাহ সাথে। এজন্য তিনি নির্জনতাকে আরাম ও শান্তির উপায় বলেছেন। অন্যথায় তিনি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দিনের জন্যও নির্জনতা অবলম্বন করেন নি।

সুফি ও হাকিকত অন্বেষণকারীগণ দুনিয়ার সঙ্গে যতটা সম্পর্ক রাখে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে ততটাই বিপদ ও পরীক্ষা মনে করে থাকে। এ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা কখনও আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে বিরত থাকে না। ফলে হজরত উমর (রা) বলেন–

دَارٌ اُسِّسَتْ عَلَى الْبَلْوٰى فَلاَ بَلْوٰى مُحَالٌ ـ

যে ঘরের ভিত্তি পরীক্ষার উপর রাখা হয়, তাতে পরীক্ষা ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই।

হজরত উমর (রা)-এর এ বাণী সত্য অন্বেষণকারী ও সুফিদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে শান্তি ও আরামের কোন স্থান নেই। যেমন হাদীসে কুদসীতে মহানবি ﷺ বলেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি আরাম ও শান্তি বেহেশতে রেখে দিয়েছি, মানুষ তা পৃথিবীতে খোঁজ করে। সুতরাং মানুষ তা এখানে পাবে কিভাবে? সুতরাং যিনি আরাম ও শান্তি অন্বেষণকারী হবেন না, তাঁর উচিত এ পৃথিবীতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অন্বেষণ করা। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগার হতে বের হওয়ার পরই তিনি পরম শান্তি লাভ করবেন। যে শান্তি শুরু হয়ে কখনও শেষ হবে না।

হজরত উসমান জুন নুরাইন

হজরত উসমান ইবনে আফফান (রা) লজ্জা ও শরমে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সুফি সম্প্রদায়ের ইমাম।

তিনি এই পর্যায়ে কিরূপ উন্নত স্তরের অধিকারী ছিলেন তা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ ও আবু কাতাদার চাক্ষুষ প্রমাণেই দেখা যায় যে, তারা উভয়ে বলেন: হরবুদ্দার এর দিন আমরা হজরত উসমান (রা) এর নিকট ছিলাম।

বিদ্রোহীগণ তার দ্বারপ্রান্তে সমবেত ছিল। তার গোলামগণ বিদ্রোহীদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারণ করল।

হজরত উসমান (রা) বললেন: তোমাদের মোকাবেলা করার কোন দরকার নেই। অধিকন্তু যারা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে আমি তাদের আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্তি দান করব।

বর্ণনাকারীদ্বয় বলেন: এই অবস্থা দেখে আমরা আমাদের জীবন বাঁচানোর জন্য ফিরে গেলাম। পথিমধ্যে হাসান ইবনে আলীর সাথে দেখা হলো। তিনি হজরত উসমানের নিকট যাচ্ছিলেন।

তিনি কেন যাচ্ছেন তা দেখার জন্য আমরাও আবার তার সাথে সাথে চললাম।

হজরত হাসান সেখানে পৌঁছে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আক্ষেপ করার পর বললেন: আমিরুল মোমেনীন! আমরা আপনার নির্দেশ ছাড়া অস্ত্রধারণ করতে পারি না। আপনিই সত্যিকারের খলিফা। আপনার আদেশ পেলেই আমরা আপনার শত্রু নিধন করে আপনাকে বিপদমুক্ত করতে পারি।

জবাবে হজরত উসমান (রা) বললেন:

يَا ابْنَ اَخِىْ ارْجِعْ وَاجْلِسْ فِىْ بَيْتِكَ حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِىْ اِهْرَاقِ الدِّمَاءِ ـ

"তোমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে বসে থাক। আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। অনর্থক রক্তারক্তি করা আমি পছন্দ করি না।"

হজরত ইবরাহীম (আ) কে নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় যে অবস্থা হয়েছিল হজরত উসমান (রা) এর অবস্থাও ঠিক তেমনই ছিল। অর্থাৎ হজরত ইবরাহীম (আ) কে যখন নমরুদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য তৈরি করল তখন হজরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন আমার দ্বারা আপনার কোন খেদমত থাকলে বলুন আমি প্রস্তুত আছি।

হজরত ইবরাহীম (আ) বললেন: দরকার আছে বৈকি? কিন্তু আপনার নিকট নেই।

হজরত জিবরাঈল (আ) অতিশয় চঞ্চল হয়ে বললেন: তবে আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করুন।

হজরত ইবরাহীম (আ) বললেন:

حَسْبِىْ مِنْ سُوَالِىْ عِلْمُهٗ بِحَالِىْ ـ

"তার নিকট তো বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি আমার সুবিধা-অসুবিধা সব কিছুই প্রত্যক্ষ করছেন।"

অতএব হজরত ইবরাহীম (আ) ও হজরত উসমান (রা) এর অবস্থায় মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। হজরত জিবরাঈল (আ) যে প্রয়োজনে হজরত ইবরাহীম (আ) এর কাছে আগমন করেছিলেন হজরত হাসান (রা)ও ঠিক তেমন প্রয়োজনে হজরত ওসমান (রা) এর কাছে আগমন করেছিলেন। উভয়েই এক প্রকার জবাব দিয়েছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটা ছিল যে হজরত খলীলুল্লাহ (আ) মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং হজরত ওসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

এখানে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে মুক্তির সম্পর্ক বাকার (অমরত্ব) সাথে ফানা বা ধ্বংসের সাথে নয়। আর ধ্বংসের সম্পর্ক ফানার সাথে বাকার সাথে নয়। যে ব্যক্তি পার্থিব নশ্বর এবং সীমিত জীবন এবং সম্পদের পরিবর্তে পরকালের অবিনশ্বর এবং সীমাহীন যিন্দেগী ও সম্পদ অর্জন করে সেই মুক্ত এবং সফলকাম। আবার যে ব্যক্তি পরকালের সীমাহীন সুখ সম্ভোগ এবং চিরস্থায়ী জীবন ও যৌবনের পরিবর্তে নশ্বর পৃথিবীর নশ্বর সুখ শান্তিকে পাওয়ার জন্য আগ্রহী সে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আল্লাহর পথে জান মাল কুরবান করায়, এখলাসের সাথে ইবাদত বন্দেগি করায় হজরত ওসমান (রা) এর স্থান অনেক উচ্চ ছিল এবং এই পথের পথিকদের তিনি ছিলেন অগ্রসেনা।

হজরত আলী আল মুরতাজা (রা)

আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) তরিকতপন্থীদের নেতা ও ইমাম ছিলেন। হাকিকতের নীতি নির্ধারণে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মহানবি ﷺ তার সম্বন্ধে বলেছেন:

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا –

"আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দ্বার। তার স্বার্থত্যাগ এবং উৎসর্গ ছিল উদাহরণাতীত।"

মক্কার কাফেরগণ যে রাতে হুজুর ﷺ-কে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল হজরত আলী (রা) সেই রাতে নবিজীর বিছানায় শয়ন করেন যেন তিনি নির্বিঘ্নে মক্কা থেকে চলে যেতে পারেন এবং বিছান খালি দেখে কাফেরদের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হতে না পারে। তার এই কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন: বিপদে ধৈর্যধারণে এবং ইলমে তরিকতে খলিফা হজরত আলী (রা) আমাদের নেতা ছিলেন। একবার কোন ব্যক্তি আরজ করলেন, আমিরুল মুমিনীন। আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

হজরত আলী (রা) বললেন, তোমার পরিবার পরিজনের প্রতিই যেন তুমি সর্বদা লিপ্ত না থাক। মনে রেখো তোমার পরিবারের লোক যদি আল্লাহর বন্ধু হয় তাহলে আল্লাহ তাদের কখনও কষ্ট দিবেন না। আর যদি তারা শত্রু হয় তবে তোমার সাথে তাদের সম্পর্ক কী?

তার এই কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে এমন সম্পর্ক রাখবে না যাতে আল্লাহর পথে চলার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বরং অন্যান্যদের সম্পর্ক যেন আল্লাহর সম্পর্কের আজ্ঞাধীন ও অনুগামী হয়। আল্লাহর নির্দেশ যেন বিনা প্রতিবাদে প্রতিপালন করা হয়। আল্লাহ যে অবস্থায় রাখেন তাতেই রাজি-খুশি থাকবে।

হজরত মুসা (আ) কে দেখুন। তিনি যখন গভীর জঙ্গলে একটু আগুনের জন্য দিশেহারা ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাকে এক কঠিন কাজ করার আদেশ দিলেন:

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۝

ফেরআউনের নিকট যাও! সে অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে পড়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার নিয়ত কি বিশুদ্ধ হবে না?

হজরত মূসা (আ) আল্লাহর হুকুম পাওয়ামাত্র লাঠি হাতে রওয়ানা হলেন।

হজরত ইবরাহীম (আ) কে হুকুম দিলেন তোমার স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে পানি ও খাদ্যহীন মরুভূমিতে রেখে এসো। হজরত ইবরাহীম (আ) বিনা দ্বিধায় তপ্তমরুভূমিতে স্ত্রী ও প্রাণাধিক পুত্রকে রেখে আসলেন।

একবার কোন এক ব্যক্তি হজরত আলী (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন: সবচেয়ে হালাল রুজি কী?

তিনি বললেন: তোমার অন্তর আল্লাহকে এভাবে পায় যে তিনি ছাড়া সবকিছু হতে তুমি বে-পরওয়া হয়ে যাও। তার সম্পর্কে এমন অনেক সূক্ষ্ম এবং রহস্যময় ঘটনা বর্ণিত আছে।

নবি পরিবারের তরিকতের ইমাম

হজরত হাসান ইবনে আলী (রা)

হজরত হাসান (রা)-ও তাঁর পিতার মতো তরিকতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তার সততা এতেই প্রমাণিত হয় যে যখন কদরিয়া এবং মোতাযেলা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতবাদ জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে তখন হজরত হাসান বসরি (র) প্রখ্যাত আলেম ও ওলি হওয়া সত্ত্বেও হজরত হাসান (রা) এর কাছে পত্র লিখেন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا ابْنَ رَسُوْلَ اللهِ وَقُرَّةَ عَيْنِهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ، اَمَّا بَعَدُ: فَاِنَّكُمْ مَعَاشِرُ بَنِىْ هَاشِمٍ كَالْفُاْكِ الْجَارِيَةِ فِىْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَمَصَابِيْحِ الدُّجٰى وَاَعْلَامُ الْهُدٰى وَالْاَئِمَّةِ الْقَادَةِ الَّذِيْنَ مَنْ تَبِعَهُمْ نَجٰى كَسَفِيْنَةِ نُوْحٍ الْمَشْحُوْنَةَ الَّتِىْ يَؤُلُ اِلَيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَيَنْجُوْ فِيْهَا الْمُتَمَسِّكُوْنَ فَمَا قَوْلُكَ يَا ابْنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ حَيْرَتِنَا فِىْ الْقَدْرِ وَاخْتِلَافِنَا فِى الْاِسْتِطَاعَةِ لِتَعَلُّمِنَا بِمَا تَاكَّدَ عَلَيْهِ رَاُيُكَ فَاِنَّكُمْ ذُرِيَّةٌ

بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ بِعِلْمِ اللهِ عَلِمْتُمْ وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَلَى النَّاسِ ـ وَالسَّلَامُ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান এবং তার চোখের শীতলতা। আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আরজ এই যে আপনারা বনী হাশেমের বংশধর গভীর সমুদ্রে চলমান নৌকার ন্যায়। আপনারা এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র, এমন পথপ্রদর্শক এবং ইমাম ও নেতা যে যারা আপনাদের তাবেদারী করে তারা হজরত নূহ (আ) এর নৌকায় আরোহীদের ন্যায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং আমরা জীবরিয়া ও কদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ নিয়ে যে বিপদে আপতিত ঐ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী? আপনি হুজুর ﷺ এর বংশধর। আপনারা আল্লাহর জ্ঞান হতে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আল্লাহ আপনাদের রক্ষক ও সাক্ষী। আপনারা সমস্ত সৃষ্টির রক্ষক এবং সাক্ষী।

এই পত্রের জবাবে হজরত হাসান ইবনে আলী (রা) লিখলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ اِنْتَهٰى اِلَى كِتَابِكَ عِنْدَ حَيْرَتِكَ وَحَيْرَةُ مَنْ زَعَمْتَ مِنْ اُمَّتِنَا وَالَّذِىْ عَلَيْهِ رَاْئِىْ اِنَّ مَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى فَقَدْ كَفَرَ ـ وَمَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِىْ عَلَى اللهِ فَقَدْ فَجَرَ ـ اِنَّ اللهَ لَايُطَاعُ بِاِكْرَاهٍ وَلَا يُعْطِىْ بِغَلْبَةٍ وَلَا يُمْهِلُ الْعِبَادَ فِىْ مُلْكِهٖ لٰكِنَّهُ الْمَالِكُ لِمَا يُمْلِكُهُمْ وَالْقَادِرُ عَلٰى مَاعَلَيْهِ قَدْرُهُمْ ـ فَاِنِ ائْتَمَرُوْا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

اِخْتِيَارًا وَلَالَهُمْ عَنْهَا مُشْبِعًا وَاِنْ .... بِالْمَعْصِيَّةِ وَشَاءَ اَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ فَتَحَوَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فِعْلٌ وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ حَمْلُهُمْ عَلَيْهَ اِجْبَارًا وَلَا اَلْزَمُهُمْ اِكْرَاهًا اِيَّاهَا بِاِحْتِجَاجِهٖ عَلَيْهِمْ اِنْ عَرَّفَهُمْ وَمَكَّنَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيْلَ خُذُوْا مَا دَعَوْهُمْ اِلَيْهِ وَاتْرُكُوْا مَانَهَاهُمْ عَنْهُ وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ـ وَالسَّلَامُ ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। পর সমাচার আপনার পত্র পেয়েছি যাতে আপনার ও অন্যান্যদের হয়রান পেরেশানীর কথা উল্লেখ করেছেন। এই মাসয়ালার ব্যাপারে আমার অভিমত এই যে– যে ব্যক্তি ভালো-মন্দে আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে অবিশ্বাসী সে ব্যক্তি কাফের। আর যে স্বীয় কৃত পাপের বোঝা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেয় সে বদকার। মূলত আল্লাহ তায়ালা কাউকে পাপ-পুণ্য করার জন্য বাধ্য করেন না। আবার তিনি তার রাজ্যে কাউকেও স্বাধীন ভাবে ছেড়েও দেন না।

আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল কিছু এবং তার আয়ত্বাধীন সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা যদি বান্দাকে তার অনুগত হওয়ার জন্য বাধ্য করতেন তাহলে তার ইচ্ছাধীন কোন কাজ থাকত না এবং অনুগত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকত না। আর যদি তাকে পাপ না করা হতে বিরত রাখতে ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি তার পাপ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতেন। ফলে এ অবস্থায় বান্দার কোন কিছু করা বা না করা সমান হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পাপ পুণ্য করা না করার জন্য বাধ্য করেন নি।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞান ও মারেফত দান করে তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। তাই আপনি ঐ পথ অবলম্বন করুন যে পথে চলার

জন্য আল্লাহ আপনাকে হুকুম দিয়েছেন। আর যা করা হতে বিরত থাকতে বলেছেন তা করা হতে বিরত থাকুন। খেয়াল রাখবেন আল্লাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে বাজিমাত করতে পারবেন না। তিনিই সর্বাবস্থায় জয়ী।

অপর একটি ঘটনায় দেখা যায় তিনি কত বড় ধৈর্যশীল ও সহনশীল ছিলেন। একবার তিনি কুফায় অবস্থানকালে জংলি প্রাকৃতির এক আরব এসে তাকে ইচ্ছামতো গালাগালি শুরু করে দিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর? না তোমার কোন ধরনের অসুবিধা আছে? কিন্তু সে সেই কথায় কর্ণপাত না করে তার বাপ-মা তুলে তাকে গালাগালি করতে লাগল।

হজরত হাসান (রা) তার ভৃত্যকে বললেন: ঘরে যে টাকার থলে আছে তা এনে এই ব্যক্তিকে দাও। তিনি তাকে টাকার থলে দিয়ে বললেন, ভাই! এই সময় আমার কাছে এর অধিক কিছু নেই। যদি থাকত অবশ্য তোমাকে দান করতাম।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে উক্ত আরব বিস্মিত হয়ে গেল এবং বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের সন্তান। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে চলে গেল।

হজরত হুসাইন (রা)

হজরত হুসাইন (রা) যাবতীয় বিপদাপদ বরণকারী কেবলাহ ও নেতা।

সকল তরিকতপন্থী তার হালের সঠিকতা সম্বন্ধে একমত। যখন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তখন তিনি সেই সত্যের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু সত্য যখন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তখন তিনি অস্ত্রধারণ করলেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবন, ধনসম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজন আল্লাহর পথে উৎসর্গ করলেন।

হুজুর ﷺ তাঁকে অত্যধিক আদর করতেন। হজরত ওমর (রা) বলেন: একবার আমি গিয়ে দেখি হুজুর ﷺ হজরত হুসাইনকে পিঠের ওপর বসিয়ে নিজের মুখে লাগামের মতো একটি সূতা দিয়ে তা হজরত হুসাইনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে হামাগুড়ি দিয়ে উটের মতো চলতেছেন।

এই দৃশ্য দেখে আমি বললাম– نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكَ يَاعَبْدَ اللهِ "হুসাইন! কতই না উত্তম তোমার এই উট।"

হুজুর ﷺ হাসতে হাসতে এরশাদ করলেন– نِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ يَاعُمَرُ "ওমর ! সওয়ারীও খুব ভালো।"

হজরত হুসাইন (রা) খুবই সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: اَشْفَقُ الْاِخْوَانِ عَلَيْكَ دِيْنُكَ তোমার ধর্ম তোমার ভাইয়ের অপেক্ষা তোমার প্রতি অতি মেহেরবান।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের মঙ্গল কামনা করে, সর্বদা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং কখনও অন্যায় করতে আদেশ দেয় না; সেই-ই প্রকৃত ভাই। এই পর্যায়ে কোন ভাই ধর্মের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় উপকারীকে আপন করে নেয়, সে-ই প্রকৃত ভদ্র ও জ্ঞানী। উপকারীর নির্দেশমতো চলা এবং তার কথার অবাধ্য না হওয়াই জ্ঞানীর পরিচয়।

কথিত আছে এক ব্যক্তি একদিন তার কাছে এসে বলল, হে রাসূল তনয়! আমি খুবই গরিব। আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘরে ক্ষুধার্ত রয়েছে। আপনি আজ রাতে খাবারমতো কিছু তাদের দিন।

সম্ভবত তার ঘরেও সেদিন খাওয়ার মতো কিছু ছিল না। ফলে তিনি বললেন, তুমি বস! আমার জীবিকাও আসছে। যদি আসে তবে তোমাকে দেব।

তখন এক ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসে বলল, হজরত মুয়াবিয়া আপনাকে সালাম দিয়ে বলেছেন: বর্তমানে এটা দ্বারাই আপনি কাজ চালিয়ে নিন পরে আরও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হজরত হুসাইন (রা) পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রাই ঐ ব্যক্তিকে দান করে বললেন: আমরা কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত। আমি দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছি এবং নিজেদের চাহিদা খুব কমিয়ে দিয়েছি। দুঃখের বিষয় আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো এবং আমি এর বেশি কিছু দিতে সক্ষম হলাম না।

হজরত যইনুল আবেদীন (র)

তিনি উৎপীড়িতদের নেতা এবং তার সমসাময়িকদের চেয়ে সর্বাধিক ইবাদতগুজার ছিলেন। হাকিকতের কাশফ এবং ধর্মের সূক্ষ্মতা বর্ণনায় তিনি ছিলেন খুবই বিচক্ষণ। তার নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– "সর্বাধিক ধার্মিক কে?"

তিনি উত্তর দিলেন:

مَنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يَحْمِلْهُ رِضَاهُ عَلَى الْبَاطِلِ وَاِذَا سَخِطَ لَمْ يَخْرِجْهُ سَخْطُهُ مِنَ الْحَقِّ ـ

"যে ব্যক্তি স্বচ্ছল ও সুখী থাকা সত্ত্বেও অন্যায় পথ গ্রহণ না করে এবং রাগান্বিত হলে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন না করে।"

কারবালা ময়দানে যখন হজরত ইমাম হুসাইন (রা) তার সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনসহ শহিদ হন তখন হজরত যয়নুল আবেদীন ছাড়া আর কোন পুরুষ জীবিত ছিলেন না। তিনিই ছিলেন তখন তার পরিবারের রমণীদের দেখাশুনা করার একমাত্র অভিভাবক। কিন্তু তখন তিনি মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা অবসানের পর পরই যখন তাকে উটের খালি পিঠে আরোহণ করে ইয়াযিদের দরবারে হাজির করা হলো তখন তাকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল– "হে আলী! রহমতের গৃহের বাসিন্দা! বল তোমার অবস্থা কী? কেমন আছ?

হজরত যয়নুল আবেদীন জবাব দিলেন–

اَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمِنَا بِمَنْزِلَةِ قَوْمِ مُوْسَى مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَهُمْ فَلَا نَدْرِىْ صَبَاحَنَا مِنْ مَسَاءِنَا مِنْ حَقِيْقَةِ بَلَاءِنَا ـ

হজরত মূসা (আ) এর গোত্র ফেরআউনের হাতে যে অবস্থায় ছিল আমার অবস্থাও আমার জাতির হাতে তেমনি। ফেরআউন যেমন হজরত মূসার গোত্রের সন্তান-সন্ততিকে পিতৃহীন করত মহিলাদের বিধবা করত আমার অবস্থাও তদ্রূপ। এই বিপদ ও পরীক্ষার সময় আমি বলতে পারি না কখন রাত হয় আর কখন দিন আসে। যা হোক সর্বাবস্থায়ই আমি আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করছি।

বর্ণিত আছে, মুসলিম জাহানের খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান একবার হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। কাবা তাওয়াফ করার পর তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কিন্তু লোকের এত ভিড় ছিল যে তিনি কোনমতেই হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে সক্ষম হলেন না। অপারগ হয়ে তিনি সেখান থেকে ফিরে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভিড় কমার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তখন হজরত যয়নুল আবেদীন সেখানে আগমন করেন। তার পরিধানে ছিল পাক পবিত্র পোশাক। দেহ হতে আতরের সুগন্ধি ছড়িয়ে চারদিক মোহিত করে তুলেছিল। তার পবিত্র মুখমণ্ডল সূর্যের মতো দীপ্তমান। তিনি তওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে এগিয়ে গেলেন। তাকে আসতে দেখে সমস্ত লোক দুই ভাগে ভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। তিনি অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় সরে না গেলেন ততক্ষণ পর্যন্ত একটি প্রাণীও স্বীয় স্থান হতে নড়াচড়া করল না বরং সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে থাকল।

খলিফা হেশামের সাথে সিরিয়া থেকে যারা এসেছিল তারা জিজ্ঞেস করল– কে এই যুবক? মানুষজন আপনার কোন পরওয়া করল না। অথচ আপনি আমিরুল মোমেনীন তাঁকে এত সম্মান করল।

হিশাম প্রথম থেকেই এই ঘটনা দেখছিলেন আর ফুলছিলেন। তার কাছে এই মহান ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তার শাহী মর্যাদায় আঘাত হানল। ফলে তিনি ঈর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমি তো তার পরিচয় অবগত নই যে তিনি কে?

হিশামের সভাকবি ফরযদক সেখানে ছিলেন। হিশামের ঈর্ষান্বিত কথা শুনামাত্র তার ঈমানী-জোশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বললেন– আপনি তার পরিচয় জানেন না? তবে আমার কাছে তার পরিচয় শুনুন। এই বলে তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীনের প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করে শুনালেন তা একদিকে যেমন তার নবি পরিবারের প্রতি ভক্তির পরিচয় বহন করে– তেমনি তা আরবি সাহিত্যের এক মহামূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে। এই কবিতার কিছুটার অর্থ এখানে দেওয়া হলো :

هَذَا الَّذِىْ تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَ طَأْتَهُ

وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

তিনি এমন ব্যক্তি যার পদচিহ্ন বাতহা উপত্যকা, এই গৃহ হরম এবং হরমের এলাকার বাইরের সকল লোকেই চিনে।

هٰذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِمْ

هٰذَا التَّقِىُّ النَّقِىُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বান্দার সন্তান। তিনি সর্বাপেক্ষা পরহেযগার, সকলের চেয়ে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং সকলের চেয়ে সঠিক ও সৎ।

هٰذَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ اِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ

بِجَدِّهٖ اَنْبَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمَ

তুমি যদি তাকে না চিন তাহলে শুনে রাখ তিনি ফাতেমা যাহরার নয়নের আলো, তার সম্মানিত নানার উপরই নবুয়তের ধারা শেষ হয়েছে।

يَبِيْنُ نُوْرُالدُّجٰى عَنْ نُوْرِ طَلْعَتِهٖ

كَالشَّمْسِ يَنْجَابُ عَنْ اَشْرَاقِهَا الظُّلَمُ

তিনি এমন ব্যক্তি যার কপালস্থ নূরের আলোতে অন্ধকার এমনভাবে দূরীভূত হয়ে যায় যেমন সূর্যালোকে অন্ধকারের অবসান ঘটে।

يُغْضِىْ حَيَاءً وَ يُغْضٰى مِنْ مَهَابَتِهٖ

فَمَا يُكَلِّمُ اِلاَّ حِيْنَ يَبْتَسِمُ

তিনি এমন ব্যক্তি যিনি লজ্জাবশত সদা-সর্বদা মাথা নত করে থাকেন। আর তার মর্যাদার প্রতি খেয়াল করে কেউ তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।

اِذَا رَاَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا

اِلٰى مَكَارِمِ هٰذَا يَنْتَهِى الْكَرَمُ

তিনি এমন ব্যক্তি যাকে দেখে মক্কাবাসী এক বাক্যে বলে উঠে দান-দক্ষিণা এবং প্রশংসনীয় মর্যাদা তার পর্যন্ত এসেই খতম হয়ে গেছে।

يَنْمِىْ اِلٰى ذُرْوَةِ الْعِزِّ الَّتِىْ قُصِرَتْ

عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْاِسْلَامِ وَالْعَجَمِ

তিনি ইজ্জত ও শান-শওকতের এমন শিখরে পৌঁছেছে যে আরব ও অনারবের কোন ব্যক্তিই সেই শীর্ষস্থানে আরোহণ করতে পারে নি।

مَنْ جَدُّهٗ دَانَ فَضْلُ الْاَنْبِيَاءِ لَهٗ

وَفَضْلُ اُمَّتِهٖ دَانَتْ لَهُ الْاُمَمُ

তিনি এমন ব্যক্তি যার নানা নবিদের সরদার এবং যার উম্মত সকল উম্মতের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। তুমিও তার উম্মত।

يَكَادُ يُمْسِكُهٗ عِرْفَانُ رَاحَتِهٖ

رُكْنُ الْحَطِيْمِ اِذَا مَاجَاءَ يَسْتَلِمُ

এটা অসম্ভব নয় যে তিনি যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন তখন হাজরে আসওয়াদও তার সুগন্ধি পেয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করবে।

মোটকথা তিনি হিশামের নিকট তার বহু প্রশংসা করলেন এবং তৎসহ নবি পরিবারের অন্যান্যদের প্রশংসাও করলেন। ফরযদকের মুখে বনী হাশিম গোত্রের লোকের স্তুতি শুনে বনী উম্মিয়া খলিফা হিশামের সর্বশরীর ঘামে ভিজে গেল। হেশাম সাথে সাথে হুকুম দিলেন, ফরযদককে নজরবন্দী করে রাখা হোক।

হজরত যয়নুল আবেদীন (র) ফরযদকের নির্ভীকতা এবং ঈমানের প্রতি অবিচলতার কথা শুনে অতিশয় প্রীত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দীদশার কথা জানতে পেরে দুঃখও প্রকাশ করলেন। তিনি ফরযদকের সান্ত্বনার জন্য বার হাজার দেরহাম এই সংবাদসহ পাঠিয়ে দিলেন যে, হে আবু কারাশা! আমি অক্ষম এবং অভাবগ্রস্ত! এর চেয়ে বেশি থাকলে অবশ্য আমি তোমাকে দিতাম।

ফরযদক সেই টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং আরজ করে পাঠালেন যে, আমি পার্থিব কোন লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে এই কাজ করি নি। আমি এই পর্যন্ত বাদশাহদের মিথ্যা স্তুতি গেয়ে পাপের পাল্লাই ভারী করেছি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এই কাজ করেছি। আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান পাওয়া এবং রাসূল পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব রাখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

হজরত যয়নুল আবেদীন এই সংবাদ পেয়ে সেই অর্থ পুনরায় তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন– আবু কারাশা! তুমি যদি সত্যই আমাদের ভালোবাস তাহলে এটা গ্রহণ কর। কারণ, আমি তা আল্লাহর ওয়াস্তেই নিজস্ব সম্পদ হতে তোমাকে দান করেছি। এখন আমি তা আর ফিরিয়ে নিতে অক্ষম। অতঃপর কবি ফরযদক তা গ্রহণ করলেন।

ইমাম জাফর সাদেক (র)

ইমাম জাফর সাদেক হজরত হুসাইন (র) এর পৌত্র এবং যয়নুল আবেদীন (র) এর পুত্র। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং আল্লাহর কালামের সূক্ষ্মতা বর্ণনার ক্ষেত্রে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। তার দ্বারা বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছিল।

একবার খলিফা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তিনি খলিফার দরবারে উপস্থিত হলে খলিফা আসন ছেড়ে ওঠে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং সম্মানের সাথে তার পাশে বসিয়ে "আমি আপনাকে এখানে আসার আদেশ করে কষ্ট দিয়েছি"– বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর তাকে সম্মানের সাথে বিদায় করলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর দরবারীগণ বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি তো হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে এনেছিলেন। তবে কেন এত সম্মান দেখালেন?

খলিফা বললেন– তিনি যখন আমার দিকে আসছিলেন তখন আমি দেখলাম তার ডানে বামে অতিকায় ভয়ঙ্কর দুটি বাঘ। তারা যেন আমাকে বলছে– যদি তুমি তার কোন ক্ষতি কর তাহলে তোমাকে আমরা ফেড়ে ফেলব।

অপর এক খাদেম বলেন– তিনি রাতের ইবাদত বন্দেগি শেষ করে উচ্চঃস্বরে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করার সময় বলতেন– হে মাবুদ! হে আমার প্রভু! রাত এসেছে। দুনিয়ায় বাদশাহদের কর্মতৎপরতা থেমে গেছে। আকাশে তারকা দেখা দিয়েছে। সমস্ত জগত সুপ্ত, যেন জনমানবহীন এই পৃথিবী। মানুষের কোন শব্দ নেই– চোখ নিদ্রিত।

বনী উমাইয়াও আরামের ক্রোড়ে শায়িত। তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তুমি! হে আমার প্রভু! তুমি জাগ্রত! তুমি চিরঞ্জীব, প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞাত এবং সতর্ক। নিদ্রা ও তন্দ্রা তোমার নেই। যে ব্যক্তি তোমার এই গুণাবলি সম্বন্ধে অজ্ঞ সে তোমার নেয়ামত পাওয়ার উপযোগী নয়। তোমার রহমতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। তোমাকে আহ্বানকারী তোমার

প্রশংসাকারী কখনও তোমার দ্বার হতে শূন্য হাতে ফিরে আসে না। জমিন ও আসমানের যা কিছু সে তোমার নিকট কামনা করে সে তা হতে বঞ্চিত হয় না।

মৃত্যু, কবরের আজাব এবং হিসাব কিতাবের কথা যখন আমার স্মরণে আসে তখন কীভাবে আমি এই পৃথিবীতে হাসিমুখে থাকতে পারি? আমার যা কিছু সবই তোমার নিকট কাম্য। তুমি আমাকে মৃত্যুর সময় শান্তি দান কর যেন সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। হিসাবের কালে এমন খুশি দান কর যেন সব কষ্ট দূর হয়ে যায়।

উক্ত গোলাম বলেন: তিনি প্রতি রাতে এমন দোয়া করতেন এবং আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করতেন। একদিন আমি তাকে বললাম, হে আমার নেতা! আপনি আর কতদিন এমনভাবে ক্রন্দন করতে থাকবেন।

তিনি এরশাদ করলেন: হে আমার বন্ধু! হজরত ইয়াকুব (আ)-এর এক ছেলে হারিয়ে যান। তিনি তাঁর জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর কারবালা ময়দানে আমি আঠার জন আপন লোক হারিয়েছি। তাই আমার প্রভুর সমীপে ফরিয়াদ করা থেকে আমি কীভাবে বিরত থাকতে পারি?

আবু মুহাম্মদ জাফর ইবনে সাদেক

তিনি হজরত যয়নুল আবেদীনের নাতি এবং হজরত জাফর সাদেকের পুত্র। তিনি তার কথার মাধুর্য এবং বিনয়তার জন্য সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলতেন:

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ اَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ ـ

"যে আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয়েছে সে পার্থিব যাবতীয় কিছুর অমুখাপেক্ষী হয়েছে।"

কেননা, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে তার অন্তরে অন্য কোনকিছুর স্থান হতে পারে না।

তিনি আরও বলেছেন:

لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ اِلَّا بِالتَّوْبَةِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدَّمَ التَّوْبَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الاية

"তওবা ছাড়া ইবাদত হয় না। আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের পূর্বে তওবার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন 'তওবাকারী এবং ইবাদতকারী'। ফলে ইবাদত করার পূর্বে অবশ্য তাওবা করতে হবে এবং পাপ করা হতে বিরত থাকতে হবে। তওবা প্রথম এবং ইবাদতের সর্বশেষ স্তর। প্রথম স্তর অতিক্রম করা ছাড়া শেষ স্তরে কীভাবে পৌছা সম্ভব।"

এটাও প্রকাশ্য যে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় পাপ ও অন্যায়ের প্রতি তাকায় না ততক্ষণ পর্যন্ত না তওবা করায় মনোযোগী হয় আর না তওবা করার সৌভাগ্য হয়। কাজেই ব্যক্তির কর্তব্য স্বীয় দোষাবলি ও পাপরাশির প্রতি লক্ষ করা। এজন্যই হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُ بِعُيُوْبِ نَفْسِهِ ـ

"আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তখন তার পাপ ও অন্যায়ের প্রতি তার মন সজাগ করে দেন।"

ইমাম মুহম্মদ জাফর সম্বন্ধে বর্ণিত আছে– একদিন তিনি তার গোলামদের সাথে বসা ছিলেন। তিনি তার গোলামদের উদ্দেশে বললেন, আস আমরা ওয়াদাবদ্ধ হই যে, আমাদের মধ্যে যে কিয়ামতের দিন মুক্তি পাবে সে অন্যের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।

তাঁর দাসগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান। আপনার আবার অন্যের সাহায্যের কী দরকার? আপনার মহান নানাজিই তো সবার জন্য সুপারিশ করবেন।

তিনি বললেন: আমি আমার কৃত পাপের দরুন কীভাবে আমার নানাজির সামনে গিয়ে মুখ দেখাব?

একবার হজরত দাউদ তায়ী তার দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমার মনের কালিমা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন এবং আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন: হে আবু সুলায়মান! আপনি তো আপনার যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক। আপনার আবার উপদেশের কী প্রয়োজন?

হজরত তায়ী বললেন: হে রাসূলের সন্তান। সৃষ্টিকুলের উপর আপনাদের মরতবা। সুতরাং আপনাদের নসিহত আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক।

জবাবে ইমাম সাহেব বললেন: হে আবু সুলায়মান! আমার ভয় হচ্ছে যে আমার মহান নানাজি আমাকে পাকড়াও করেন কি না? যে আমি কেন পূর্ণভাবে তার অনুসরণ করি নি। আল্লাহর কাছে বংশের কোন মর্যাদা নেই। সৎকর্মই তার নিকট গ্রহণযোগ্য।

এটা শুনে হজরত দাউদ তায়ী কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, নবুয়তের পানি দ্বারা যাঁর সৃষ্টি, যার আপাদমস্তক পুণ্যে সুসজ্জিত, হুজুর ﷺ যাঁর নানা, হজরত ফাতেমা যাঁর মা তিনিই যখন পরকালের ভয়ে অস্থির ও পেরেশান তখন হে দাউদ! তোমার মতো লোক কোন গণনায় পড়বে?

আসহাবে সুফ্ফা (রা)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও আহলে বাইতের পর আসহাবে সুফ্ফা তরিকতপন্থীদের ইমাম। তাঁরা মহানবি ﷺ-এর সাহাবা ছিলেন– তারা পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতেন। মহানবি ﷺ এর অভিপ্রায় মোতাবেক তাদের খেদমত গ্রহণ করবেন, এই নিয়তে তারা জীবনপণ করে রেখেছিলেন। দিন-রাত তারা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন, তাদের ফজিলত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে–

لَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ـ

যারা দিন-রাত আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে– তাদের স্বীয় সাহচর্য হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। (সূরা: আল-আনআম– ৫২)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى اَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَرَاٰى فَقْرَهُمْ وَجُهْدَهُمْ وَطِيْبَ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَا اَصْحَابَ الصُّفَّةِ فَمَنْ بَقِىَ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ اَنْتُمْ عَلَيْهِ رَاضِيًا بِمَا فِيْهِ فَاِنَّهُمْ رُفَقَائِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

"একদিন হুজুর ﷺ আহলে সুফ্ফার কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, অর্ধাহার এবং অনাহারে থাকা সত্ত্বেও তারা আনন্দিত। তিনি তাদের বললেন: হে আহলে সুফ্ফা! তোমাদের ও আমার ঐসব উম্মতদের জন্য সুসংবাদ যে যারা তোমাদের পর তোমাদের মতো থাকবে তারা আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে।"

আসহাবে সুফ্ফা এবং তাদের প্রশংসনীয় কার্যাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

০১. মুহম্মদ মুখতার বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) আল্লাহর কাছে অতি মর্যাদাসম্পন্ন মুয়াজ্জিন।

০২. আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসি (রা)। আল্লাহর বন্ধু ও হুজুর ﷺ এর অবস্থাদির রহস্য ভাণ্ডার।

০৩. আবু উবাইদাহ আমের ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে জার্‌রাহ (রা)। মুহাজির ও আনসারদের নেতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানী ছিলেন।

০৪. আবু তাফীতান আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)। ইসলাম গ্রহণ করার দরুন ভয়ানক শাস্তি পেয়েছিলেন।

০৫. আবু মাসউদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দাহযলী (রা) প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

০৬. উতাবাহ ইবনে মাসউদ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাই। পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।

০৭. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) তিনি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করা থেকে বিরত থাকতেন।

০৮. খাব্বাব ইবনে আর্‌ত। অতিশয় পরহেযগার, ইসলাম প্রচারক এবং বিপদে ধৈর্যশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তার মুশরিক মালিক তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল।

০৯. সুহাইব ইবনে মান্নান (রা) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গিত ব্যক্তি ছিলেন।

১০. উতাবাহ ইবনে গাযওয়ান (রা)। পুণ্যের মোতি এবং কানায়াত তথা অল্পে তুষ্টির বাহাদুর ছিলেন।

১১. জায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা)। হজরত ওমর (রা) এর ভাই। পার্থিব সম্পর্ক ত্যাগ করে শুধু আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত ছিলেন।

১২. আবু কাবাশাহ (রা)। হুজুর ﷺ এর আযাদকৃত গোলাম।

১৩. আবুল মারছাদ কেনানা হাসীন আদুবী (রা) খোদাগত প্রাণ সাহাবা!

১৪. সালেম (রা)। হুজায়ফা ইয়ামনীর আজাদকৃত দাস।

১৫. আকাশাহ ইবনে হাসীন (রা)। আল্লাহর আজাবকে অত্যন্ত ভয় করতেন এবং আল্লাহ বিরোধী পথ হতে দূরে থাকতেন।

১৬. মাসউদ ইবনে রবী কারী (রা)। মুহাজির ও আনসারদের প্রিয়পাত্র এবং বনী ওকারের গোত্রপতি ছিলেন।

১৭. আবু জর জুনদব ইবনে জুনাদাহ গেফারি (রা)। কৃতজ্ঞতায় হজরত ঈসা এবং প্রেমে হজরত মূসার ন্যায় ছিলেন।

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)। হুজুর ﷺ-এর বাণী সংরক্ষণকারী ছিলেন।

১৯. সাফওয়ান ইবনে বায়দা (রা)।

২০. আবু দারদা উয়াইম ইবনে আমের (রা)– পূত-পবিত্র।

২১. আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনযার (র)। হুজুর ﷺ এর পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন।

২২. আবদুল্লাহ ইবনে বদর জুহনী (র)। ভদ্রতায় সমুদ্রের পরশমণি তাওয়াক্কুলের ঝিনুকের মোতি।

এছাড়া আরও বহু আসহাবে সুফফা ছিলেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় তাদের নাম উল্লেখ করা হলো না।

এ কথা নির্ঘাত সত্য যে, সাহাবায়ে কেরামের জামানা অন্যান্য সকল জামানা হতে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং তারাও সর্বকালের লোকের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের পর তাদের পরবর্তী লোকদের মর্যাদা।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ –

"আমার যুগই সর্বোৎকৃষ্ট। এরপর তার পরবর্তী এবং এরপর তার পরবর্তী যুগ।"

কুরআন পাকে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۞

"ঐসব মুহাজির এবং আনসার যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারাও যারা তাদের পর বিনা প্রতিবাদে ইসলাম গ্রহণ করেছে– তারা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা: আত্-তওবাহ– ১০০)

এঁদেরই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল নমুনাস্বরূপ দেখিয়েছেন। অতএব তারা যে ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাবেয়ীনদের মধ্যে তরীকতের ইমাম

হজরত ওয়ায়েস করনি (র)

হজরত ওয়ায়েস করণি (র) মহানবি ﷺ-এর সময় জীবিত ছিলেন। কিন্তু মহানবি ﷺ এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। তার একটি কারণ হচ্ছে তার মাতা বয়োবৃদ্ধা এবং দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি মাকে একা রেখে মহানবি ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত মহানবি ﷺ কে না দেখেই তার প্রতি এত মহব্বত ও ভালবাসা ছিল যে যখন তিনি জানতে পারলেন যে উহুদ যুদ্ধে মহানবি ﷺ এর দাঁত মোবারক শহিদ হয়ে গেছে তখন তিনি একটি একটি করে নিজের সমস্ত দাঁত ফেলে দেন। কারণ, তিনি জানতে পারেন নি যে, মহানবি ﷺ এর কোন দাঁত শহিদ হয়েছিল। তাই ভয় পেয়ে ছিলেন– হুজুর ﷺ এর দর্শনে ঠিক থাকতে পারবেন কিনা?

হুজুর ﷺ ও তাকে দূর থেকে ভালোবাসতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এরশাদ করেছিলেন– করনে ওয়ায়েস নামক এক ব্যক্তি আছে। কেয়ামতের দিন তার সুপারিশে আল্লাহ তায়ালা রবীয়া ও মুজার গোত্রের মেষ পালের পশমের সমপরিমাণ আমার উম্মতকে মাফ করবেন।

অতঃপর তিনি হজরত ওমর ও হজরত আলী (রা)-এর উদ্দেশে বললেন– তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে। তাঁর দেহ মধ্যাকৃতি, মাথায় দীর্ঘ কেশ, বা দিকে দেরহাম পরিমাণ সাদা দাগ। কিন্তু তা কুষ্ঠ নয়। তার হাত ও বাহু ও তেমন সাদা দাগ। যখন তোমাদের সাথে তার দেখা হবে তখন তোমরা তাঁকে আমার সালাম দিবে এবং আমার উম্মতের জন্য দোয়া করতে বলবে।

হুজুর ﷺ ও হজরত আবু বকর (রা) এর ওফাতের পর হজরত ওমর যখন খলিফা হন তখন তিনি হজরত আলীকে সাথে নিয়ে হজ্জ করতে মক্কা যান। খুতবা দেওয়ার সময় হজরত ওমর (রা) বললেন: হে নজদবাসী! তোমরা দণ্ডায়মান হও। নজদবাসী দণ্ডায়মান হলে হজরত ওমর (রা) বললেন: তোমাদের মাঝে কেউ করনবাসী আছ কি? করনবাসী অগ্রসর হলে তিনি ওয়ায়েস করনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

তারা বলল: আমিরুল মুমিনীন। ওয়ায়েস নামক এক পাগল ব্যক্তিকে আমরা চিনি সে লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে বাস করে; কারও সাথে সংশ্রব রাখে না। লোকে যখন হাসে তখন সে কাঁদে আর লোকে যখন কাঁদে তখন সে হাসে।

হজরত ওমর (রা) বললেন: আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।

তারা বলল: সে তার উটের পাল নিয়ে জঙ্গলে অবস্থান করে।

হজরত ওমর ও হজরত আলী (রা) সেই জঙ্গলে গিয়ে দেখেন, হজরত ওয়ায়েস নামায আদায় করছেন। নামায শেষ করে তিনি বুযর্গদ্বয়কে সালাম করেন এবং তার হাতের সাদা দাগ দেখান যাতে মহানবি ﷺ এর বর্ণনা মতে তাকে চিনতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। অতঃপর তারা তিনজনে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করেন।

সম্ভবত তাঁরা মহানবি ﷺ এর ইসলাম প্রচারের কথাই বলছিলেন! আলাপ-আলোচনার সময় তাঁরা মহানবি ﷺ এর এই বাণীও শুনালেন যে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوٰى ـ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ـ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

"কাজের ভিত্তি নিয়তের উপর। যে যেরূপ নিয়ত করে সেরূপই সে পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দিকে হিজরত করে তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্যই হবে। যে ব্যক্তি পার্থিব কোন কাজের জন্য হিজরত করে কিংবা কোন রমণীকে বিবাহ করার নিয়তে হিজরত করে সে তাই পেয়ে থাকে।"

অতএব প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেই নিয়তে কোন কাজ করে তার প্রতিদান সে তেমনই পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন কাজ সরলান্তঃকরণে বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

অনেক দরকারী কথাবার্তা হওয়ার পর হজরত ওয়ায়েস (র) বললেন: আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। এবার ফিরে যান। কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। তখন আমাদের আবার দেখা হবে, যেই সাক্ষাতের আর শেষ নেই। এখন আমি কেয়ামতের পথের পাথেয় সঞ্চয় করছি। এই বলে তিনি সালাম দিয়ে সাহাবাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর করনবাসী বুঝতে পারলেন– এই পাগল কিরূপ মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং তারা তাঁকে সম্মান করতে লাগল। তার কাছে লোকের আনাগোনা দেখে তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। কেউই জানতে পারল না তিনি কোথায় গেছেন। শুধু একবার হজরত হরম ইবনে হাব্বান (রহ) তাঁকে ফোরাত নদীর কূলে দেখেছিলেন। সিফফীন যুদ্ধের সময় তাকে হজরত আলীর সাথে যুদ্ধ করতে দেখা গিয়েছিল। তিনি এই যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন– "প্রশংসনীয় জীবন অতিবাহিত করা এবং শাহাদাত বরণ করা এই দৃষ্টান্ত তার জীবনে সংঘটিত হয়েছিল।"

হজরত ওয়ায়েস (র) বলতেন: একত্ত্ববাদের মাঝেই শান্তি। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও স্থান যেন অন্তরে না পায়– এর মধ্যেই যাবতীয় শান্তি নিহিত রয়েছে।

হজরত হরম ইবনে হাব্বান (রা)

হজরত হরম ইবনে হাব্বান (র) তরিকতের বুযুর্গদের মধ্যে পবিত্রতার ভাণ্ডার হিসেবে পরিগণিত। তিনি সাহাবা কেরামের সাক্ষাত পেয়েছেন এবং হজরত ওয়ায়েস করনি (র) এর দর্শন পেয়েছেন। তিনি হজরত ওয়ায়েসের সাথে দেখা করার জন্য প্রথমে করন যান। সেখানে পৌছার পর জানতে পারলেন যে তিনি কূফার দিকে চলে গেছেন। তিনি কূফা যান এবং সেখানেও তাঁর কোন সন্ধান পান নি।

তিনি তাঁকে সন্ধান করার জন্য বেশ কিছুদিন কুফায় অবস্থান করেন। বহুদিন সন্ধান করার পরও যখন পেলেন না তখন হজরত হরম হতাশ হয়ে বসরার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন হজরত ওয়ায়েস গুদরী পরিহিত অবস্থায় ফোরাত নদীতে উজু করছেন। উজু শেষ করার পর তিনি তার দাড়ি মোবারক চিরুনী দিয়ে আচড়াতে শুরু করলেন। হজরত হরম ইবনে হাব্বান সালাম করলেন।

হজরত ওয়ায়েস বললেন: ওহে হরম ইবনে হাব্বান ওয়ালাইকুমুস সালাম।

হজরত হরম আশ্চর্য হয়ে বললেন, হজরত! আপনি কীভাবে জানতে পারলেন যে, আমি হরম ইবনে হাব্বান?

তিনি বললেন: আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনতে পেরেছে। হজরত হরম (র) বলেন, হজরত ওয়ায়েস (র) হজরত ওমর ও আলী (রা) এর সাথে যতক্ষণ কথা বলেন তার অপেক্ষা বেশি সময় আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। তাদের বর্ণিত হাদীস "কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" –সম্পর্কেও আমার সাথে বিস্তর আলোচনা করেন। তারপর বললেন: তোমার অন্তরে তুমি যা কিছু পোষণ কর সেমতে তোমাকে আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তাই তোমার অন্তরকে স্বচ্ছ রাখ, এক আল্লাহর প্রতি তোমার অন্তরকে নিয়োগ করে তারই সন্তুষ্টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ। প্রতিটি কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখ। এটাই তোমাকে শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা করতে সক্ষম

হবে। কারণ অন্তর ও নিয়ত যাঁদের বিশুদ্ধ অভিশপ্ত শয়তান প্রথম দিনই তাঁদের উপর সফলকাম না হওয়ার ঘোষণা করে বলেছে।

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

"আদম সন্তানদের মধ্যে অকপট বান্দা ছাড়া আমি সকলের সাথেই প্রতারণা করব।" (সূরা: আল-হিজর- ৩৯-৪০)

এখানে مخلص শব্দের লামের ওপর যবর কিংবা লামের নিচে যের দিয়ে পড়লে উভয়বিধ তেলাওয়াতই বিশুদ্ধ। যখন লামের ওপর যবর দিয়ে পাঠ করা হয় তখন তার অর্থ হয়, যারা কঠোরভাবে রিয়াজাত মুজাহাদা করে অন্তরকে আল্লাহগত করে। আর যখন যের দিয়ে পড়া হয়; তখন তার অর্থ হয়- যা হৃদয় অকপটতা বা অকৃত্রিমের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে এবং তাঁরা দেহ ও আত্মার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

অতএব প্রথম নিয়মের স্তর হলো রিয়াজাত মুজাহাদা এবং কঠোর সাধন ভজনের স্তর। আর দ্বিতীয় স্তর হলো কঠোর সাধন ভজনের পর যারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত জন হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

হজরত হরম (রহ) বলেন: "তোমার অন্তরে যা কিছু রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমার হিসাব কিতাব নেওয়া হবে" -এই উপদেশ দান করার পর আমার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে পরকালের যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

হজরত আবু আলী হাসান বসরি (র)

তরিকতপন্থীগণ হজরত হাসান বসরি (র)-কে তরিকতের তৃতীয় স্থানীয় বুযুর্গ তথা ইমাম হিসেবে পরিগণিত করেন কেউ কেউ তার উপাধি আবু মুহাম্মদ এবং আবু সাঈদও বলেছেন। তরিকতপন্থীদের কাছে তার স্থান ও সম্মান অতি গৌরবময়। তরিকত সম্পর্কে তিনি বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করেছেন।

একবার এক আরববাসী তার থেকে এসে ধৈর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন- ধৈর্য দুই প্রকার। প্রথম প্রকার বিপদাপদে ও সত্যে সুদৃঢ় থাকা। দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

আরববাসী বললেন- আপনি একজন বড় সাধক। আমি আপনার অপেক্ষা বড় সাধক দেখি নি।

হজরত বসরি বললেন- হে আরব ভাই। আমার যাবতীয় সাধনা আসক্তি আর লোভ-লালসারই ফলস্বরূপ। আর এই বিপদাপদে ধৈর্য অবলম্বন করাই প্রতিদান পাওয়ার আশা করা।

আরববাসী বললেন- হজরত! দয়া করে আপনার কথার ব্যাখ্যা দিন। আপনার কথায় তো আমার ধর্মীয় বিশ্বাস নড়বড় হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বললেন- ভাই! আমার এই সাধন ভজন তো আখেরাতের নেয়ামত ও আরাম-আয়েশ পাওয়ার ওপর ভিত্তিময়। আর বিপদাপদে ধৈর্যধারণ একারণে করি যে আল্লাহ যেন পরকালে আমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন।

তার কথায় দেখা যাচ্ছে সাধন ভজন এবং ধৈর্যাবলম্বন উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার শাস্তির ভয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সচ্চরিত্রবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে লোকের কথাবার্তা, কাজকর্ম শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তার ভয়ে হতে হবে। লোক যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও আশা ভরসা না করে।

হজরত হাসান বসরি (র) সৎ সংশ্রবে থাকা এবং অসৎ সঙ্গ বর্জন করে চলার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন– লোক যদি সৎ হয় এবং প্রকৃত পক্ষেই সত্যের সন্ধানী হয় তাহলে সে অবশ্য সৎ লোকের সাহচর্য পাবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۞

যারা আমার পথে চলার চেষ্টা করে আমি অবশ্যই তাঁদের আমার পথ দেখিয়ে থাকি। (সূরা: আল-আন্‌কাবুত– ৬৯)

অসৎ ব্যক্তির সংশ্রব সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন, বদ লোকের সংশ্রব লোককে সৎ লোকদের সম্বন্ধে কুধারণা জন্মিয়ে দেয়।

হজরত হাসান বসরি (র)-এর এই বাণীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হজরত আলী দাতা গনজে বখশ (র) তরিকতের দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি এবং পেশাদার পীরদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন– একজন সাধারণ লোক যখন তরিকতপন্থীদের পোশাকে খেয়ানত, মিথ্যা, পরনিন্দা এবং লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হয় তাহলে সে ধর্ম এবং তরিকতকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির এক কৌশল ও পন্থাস্বরূপ মনে করে। তথাপি সে আরও মনে করে যে তরিকতের যত পীর মুরশিদ তারা সকলেই তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার মতো এই পথ অবলম্বন করেছেন। অতএব আমি আর কী দোষ করছি। অথচ এটা তার ধর্মের জন্য সীমাহীন ক্ষতির কারণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকারের নেক হয় এবং তার মধ্যে সৎ হওয়ার বাসনা থাকে তবে সে নিশ্চয়ই সৎ পীরের সন্ধান পাবে– যার প্রতিটি কাজ ও নির্দেশ শুধু আল্লাহর জন্যই হবে। যিনি সত্য বলেন, সৎ চিন্তা করেন, সৎ কথা শোনেন, অসৎ কিছু দেখা হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন এবং যার মাথা শুধু আল্লাহর দরবারেই অবনত হয় এমন ব্যক্তির সন্ধান করলে অবশ্য পাওয়া যায়।

মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব হলো: সে যে জাতীয় সে ঐ জাতীয় লোকের সাহচর্যে শান্তি পায়।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা)

হজরত সাঈদ (র) আলেম ও ফকীহদের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাফসীর, ফেকাহ, অভিধান, কবিতা, তওহিদ এবং হাকিকত প্রতিটি বিষয়ে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয় দিক থেকেই তিনি ছিলেন পবিত্র। কিন্তু বাহ্যত তিনি অতিশয় সতর্ক ছিলেন। তরিকতপন্থীদের মতে লোকের বাহ্য দিক থেকে অভ্যন্তর পবিত্র থাকা খুবই প্রশংসনীয়।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলতেন– ধর্মের নিরাপত্তার সাথে তুমি এই জগতের যৎসামান্য যা কিছুর অধিকারী হয়েছ তাতে তুমি এমনভাবে সন্তুষ্ট থাক যেমন কোন হতভাগা তার ধর্ম বিক্রয় করে প্রাচুর্য লাভ করে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

মনে রেখো যে দারিদ্রতা ধর্মের নিরাপত্তার সাথে হয় তা ঐ ধরনের প্রাচুর্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান যা ধর্মের পরিবর্তে পাওয়া যায়। যে দরিদ্রের ধর্ম নিরাপদ সে যখন তার হৃদয়ের প্রতি খেয়াল করে তখন সে চিন্তামুক্ত হয়। যখন সে তার হাতের প্রতি লক্ষ করে সে তখন তার হাত দানে মুক্ত, অল্পে সন্তুষ্টি এবং নিজকে মর্যাদাসম্পন্ন দেখতে পায়।

অপরদিকে যে ব্যক্তি হালাল হারামে কোন প্রকার পার্থক্য করে না দু'হাতে সম্পদ কুড়ায় সে যখন তার অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দেয় তখন সে তার বিপুল বৈভব এবং প্রাচুর্যকে অতি নগণ্য হিসেবে দেখে।

কথিত আছে তিনি যখন মক্কা শরীফ থাকতেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল– আমাকে এমন হালাল সম্বন্ধে বলুন যার মধ্যে কোন হারাম নেই। আবার এমন হারাম সম্পর্কে বলুন যাতে হালাল বলতে কিছু নেই। তিনি বললেন:

ذِكْرُ اللهِ حَلَالٌ لَيْسَ فِيْهِ حَرَامٌ وَذِكْرُ غَيْرِهِ حَرَامٌ لَيْسَ فِيْهِ حَلَالٌ

“আল্লাহর জিকর হালাল তাতে হারামের কোন সংমিশ্রণ নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করা হারাম যাতে হালালের লেশমাত্র নেই।”

তাই আল্লাহর জিকর কর আল্লাহর কাজে আত্মনিয়োজিত থাক। তাছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করা এবং অন্য কাজে লিপ্ততা হতে বিরত থাক।

তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে তরিকতের ইমাম

হজরত হাবীব আজমি (র)

তিনি শরীয়তে দৃঢ়পদ, তরিকতে বাহাদুর এবং উচ্চ পর্যায়ের একজন ওলি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম হজরত হাসান বসরির নিকট তওবা করেন এবং প্রাথমিক কিছু জ্ঞানার্জন করেন। এমন কোন অন্যায় কাজ নেই যা তিনি তাঁর যৌবনে করেন নি। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সত্যিকারের তওবা করার তওফিক দান করেন।

তিনি আজমি তথা অনারব ছিলেন। আরবি ভাষায় তার কোন দখল ছিল না। এমনকি শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেও জানতেন না।

একবার হজরত হাসান বসরি (র) সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়ি যান। তখন হজরত আজমি তাকবীর বলে মাগরিবের নামায আদায় করছিলেন। যেহেতু হজরত আজমির কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ হতো না– ফলে হজরত হাসান বসরি তাঁর পেছনে এক্তেদা না করে আলাদা নামায আদায় করলেন।

ঐ রাতেই হজরত হাসান বসরি স্বপ্নে দেখলেন তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত। তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন– হে প্রভু ! কীভাবে আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি ?

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন– ওহে হাসান! তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভ করেছিলে কিন্তু তুমি তার মূল্য দাও নি।

হজরত হাসান বিনয় প্রকাশ করে বললেন– হে আল্লাহ! তা কী ছিল?

আল্লাহ বললেন– আমার সন্তুষ্টি তাতেই ছিল যে তুমি তোমার নিয়ত খালেস রেখে বিনা দ্বিধায় আজমির পেছনে এক্তেদা করতে।

হজরত হাসান বসরি কূফার গভর্নর হাজ্জাজের ভয়ে যখন পালিয়ে হজরত হাবীব আজমির খানকায় লুকিয়েছিলেন: তখন হাজ্জাযও তার পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছল এবং হজরত আজমিকে জিজ্ঞেস করল– তুমি হাসান বসরিকে দেখেছ কি?

তিনি বললেন: হ্যাঁ! তিনি আমার খানকায় লুকিয়ে রয়েছেন।

হাজ্জায খানকায় প্রবেশ করল কিন্তু কাউকেও সেখানে দেখতে না পেয়ে বাইরে এসে বলল– তুমি কেন মিথ্যা কথা বললে? ভেতরে তো কেউই নেই।

হজরত আজমি বললেন: আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি মিথ্যা বলি নি তিনি ভেতরেই রয়েছেন।

এভাবে হাজ্জায তিনবার ভেতরে প্রবেশ করল। কিন্তু একবারও হজরত হাসানকে পেল না। পরে সে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

এরপর হজরত হাসান বসরি বাইরে এসে বললেন: হে হাবীব। আমি বাঁচতে সক্ষম হয়েছি আল্লাহ তোমার বরকতেই আমাকে বন্দী হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন।

হজরত হাবীব বললেন: না আমার বরকতে নয়। বরং আমার সত্য বলার কারণে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রক্ষা করেছেন। যদি মিথ্যা বলতাম তাহলে আমরা উভয়েই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতাম।

কোন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কোন কাজে আল্লাহ রাজি হন।

তিনি জবাব দিলেন: যে হৃদয়ে কপটতার লেশমাত্র নেই। কেননা মহব্বত ও নেফাক (কপটতা) পরস্পরবিরোধী বিষয়। একের সাথে অন্যের কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে কপটতা রয়েছে সেখানে মহব্বত নেই এবং যেখানে মহব্বত আছে সেখানে কপটতার কোন জায়গা নেই।

হজরত মালেক ইবনে দিনার (র)

তিনি ছিলেন হজরত হাসান বসরির বন্ধু। তাঁর পিতা দিনার গোলাম ছিলেন এবং তিনি তাঁর পিতা গোলাম থাকা অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি খেলতামাশায় অতিবাহিত করেন। তার তওবা করার কাহিনি খুবই চমকপ্রদ।

একরাতে তিনি তার সাথিদের সাথে গান-বাজনায় মত্ত ছিলেন। অনেকক্ষণ গান-বাজনা করার পর অন্যান্য সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখে ঘুম ছিল না। এমন সময় তার পাশে রক্ষিত তাঁর সেতারা তাকে বলল– ওহে মালেক! এখনও কি তোমার তওবা করার সময় হয় নি। তিনি তখনই হজরত হাসান বসরির কাছে গিয়ে তওবা করলেন।

হজরত মালেক ইবনে দিনার বলতেন: যে কাজের ভিত্তি আন্তরিকতার উপর তা-ই প্রকৃত কাজ। কারণ, সরলতা ও আন্তরিকতার কাজই কাজে পরিণত হয়। দেহের জন্য যেমন রূহের দরকার তেমনি কাজের জন্য সরলতার প্রয়োজন। যেমন আত্মাহীন ব্যক্তির দেহ ভাগাড়ে নিক্ষেপ করার উপযোগীরা তদ্রূপ সরলতাহীন কাজও ভাগাড়ে নিক্ষেপ করার উপযোগী। কাজের জন্য বাহ্য ও অভ্যন্তর সমতুল্য হতে হবে। কাজের বাইরের দিক হলো আনুগত্য এবং ভেতরের দিক হচ্ছে আন্তরিকতা। আন্তরিকতা ও আনুগত্য এই দুয়ের সমাবেশ হলেই কাজ যথার্থ কাজে পরিণত হয় এবং এমন কাজই পারিশ্রমিক পাওয়ার উপযুক্ত হয়।

তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি নৌকায় নদী পার হচ্ছিলেন। সেই নৌকার একজন সওদাগর ছিল। তার একটি মোতি হারিয়ে যায়। হজরত মালেক তার খোঁজ-খবরও জানতেন না। তবে তাঁর ছেঁড়াফাটা পোশাক দেখে সওদাগর তাঁকেই সন্দেহ করে এবং বলে, তুমিই আমার মোতি চুরি করেছ। হজরত মালেক কিছুক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে চেয়ে থাকলেন।

নৌকার সবাই বিস্ময়ের সাথে দেখতে লাগল– হাজার হাজার মাছ এক একটি মোতি মুখে নিয়ে নৌকার পাশে মাথা তুলে ভেসে উঠেছে। হজরত মালেক একটি মাছের মুখ থেকে একটি মোতি হাতে নিয়ে সওদাগরকে দিলেন। অতঃপর তিনি নৌকা হতে পানিতে নেমে হেঁটে নদী পার হয়ে গেলেন।

হজরত আবু সলীম হাবীব ইবনে আসলাম রাযি (র)

তিনি হজরত সালমান ফারসি (রা) এর সাথি ছিলেন। তিনি মহানবি ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ –

"মুমিনের নিয়ত তাঁর কাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।"

তিনি ফোরাত নদীর তীরে বাস করতেন এবং ছাগ পালন করতেন। তাঁর তরিকা ছিল নির্জনতা অবলম্বন করা।

একবার এক ব্যক্তি দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন আর একটি বাঘ তার বকরির পালের চারপাশে ঘুরে-ফিরে পাহারা দিচ্ছে। তিনি নামায শেষ করলে ঐ ব্যক্তি এগিয়ে এসে সালাম করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: বৎস! কেন এসেছ?

আগন্তুক বলল: হজরত আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।

তিনি বললেন: জাযাকাল্লাহ!

আগন্তুক বলল: হজরত! বাঘ ও ছাগলের মধ্যে বন্ধুত্ব দেখছি !

তিনি জবাব দিলেন: এসব ছাগ-বকরির চালক যখন আল্লাহর আনুকুল্যে তখন এই বাঘ (আল্লাহর সৃষ্টি) কেন ছাগ-বকরির সাথে সখ্যতা রাখবে না।

তিনি এই কথা বলতে বলতে একটি কাঠের পাত্র পার্শ্বে রক্ষিত পাথরের নিচে রেখে দিলেন। পাথর থেকে দুটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো। একটি দুধের ও অন্যটি মধুর। তিনি বললেন– বৎস! খাও।

আগন্তুক জিজ্ঞেস করল– হজরত। আপনি এই মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলেন?

তিনি বললেন: মহানবি ﷺ-এর আজ্ঞাবহ হয়ে। তারপর বললেন, যে আল্লাহ হজরত মূসা (আ)-এর জন্য পাথর হতে বারটি ঝরনা ধারা প্রবাহিত করতে পারেন অথচ হজরত মূসা (আ) মহানবি ﷺ এর সমকক্ষ ছিলেন না। ফলে যে ব্যক্তি মহানবি ﷺ এর পূর্ণ আজ্ঞাবহ তার জন্য একটি দুধের এবং অন্যটি মধুর এই দুটি ঝরনা ধারা প্রবাহিত করা কোন বিস্ময়ের কারণই নয়। আগন্তুক বললেন, হজরত আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন– তোমার অন্তরকে লোভ-লালসার সিন্দুকে পরিণত করো না, পেটকে হারামের পাত্রে পরিণত করো না। কারণ, এই দুটি কাজের জন্যই লোক ধ্বংস হয়ে থাকে।

হজরত আবু হাযেম মাদানি (র)

তিনি ফকিরীতে সত্যবাদী ও সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। তার সাথি আমর ইবনে উসমান বলেন: কোন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সম্পদ কী?

তিনি বললেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষদের থেকে অমুখাপেক্ষিতাই আমার সম্পদ।

মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে সে জগত থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে। সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেও জানে না চিনে না। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ডাকে না।

একজন বুযুর্গ বলেন: আমি হজ্জ করতে যাওয়ার পথে তার কাছে গেলাম। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জাগ্রত হলেন এবং আমাকে বললেন, আমি এখন মহানবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার মারফত আপনাকে বলছেন যে, "তোমার মায়ের প্রতি খেয়াল কর। হজ্জ করা অপেক্ষা এটাই শ্রেষ্ঠ কাজ।"

একথা শুনে আমি বাড়ি ফিরে মায়ের খেদমতে আত্মনিয়োগ করলাম।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র)

তিনি বহু তাবেয়ীনের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا اِلَّا وَرَأَيْتُ اللّٰهَ فِيْهِ –

"আমি এমন কোন বস্তু দেখি নি, যার মাঝে আল্লাহ নেই।"

কারণ সূক্ষ্মদর্শী কাজের প্রতি লক্ষ করলে কর্মকর্তাকে এবং ছবির প্রতি তাকালে শিল্পীকে দর্শন করতে পারে যে তিনি কোন অবস্থা, জ্ঞান, হেকমত এবং গুণাবলির মালিক।

কোন কোন লোক উক্ত বাণী হতে সৃষ্ট বস্তুতে আল্লাহর প্রবেশকরণের অর্থ নেওয়ার চেষ্টা করে। এটা সরাসরি কুফরী। উপরে বর্ণিত অর্থই তার মূল কথা।

হজরত ইমাম আবু হানীফা (র)

তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নেতা, তাঁদের ইমামদের ইমাম, ফকীহদের শিরোমণি এবং আলেমদের মাথার মুকুট। তিনি আহলে তরিকতের বড় মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি সৃষ্টির কাছ থেকে সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি পাওয়ার কোন আশাই করতেন না। প্রথম জীবনে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করার ইচ্ছে করেন।

একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন তিনি হুজুর ﷺ-এর পবিত্র কবর থেকে তার পবিত্র হাড় সংগ্রহ করতেছেন এবং একটির চেয়ে অন্যটিকে অধিক পছন্দ করছেন। এই স্বপ্ন দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি প্রখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী মুহম্মদ ইবনে সিরীনের এক সাথির কাছে তার স্বপ্নের কথা বললেন।

তিনি বললেন: আপনি মহানবি ﷺ-এর সুন্নতের রক্ষণাবেক্ষণে এমন পারদর্শিতা সাধন করবেন যে ভুল এবং শুদ্ধকে পৃথক করে করে দেখাবেন।

অপর একরাতে স্বপ্ন দেখলেন, মহানবি ﷺ তাঁকে এরশাদ করছেন–ওহে আবু হানীফা! আমার সুন্নতকে পুনর্জীবিত করার জন্য আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি নির্জনতা অবলম্বন করার নিয়ত পরিহার কর।

ইবরাহীম আদহাম, ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ, দাউদ তায়ী, বিশরে হাফী প্রমুখ বুযুর্গ ও মাশায়েখে তরিকত তাঁর ছাত্র ছিলেন।

পার্থিব লোভ-লালসা এবং প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি তাঁর কোন আসক্তিই ছিল না। বরং তা থেকে তাঁর অন্তঃকরণ ছিল অতি পবিত্র। নিম্নোক্ত বর্ণনায় তার দেখা পাওয়া যায়। খলিফা আবু জাফর মনসুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন–আবু হানীফা, সুফইয়ান ছাওরি, শরীক এবং ইবনে আছীম– এই চারজনের মাঝে যদি একজনকেও কাজির (বিচারক) পদে বহাল করা যায় তাহলে তাদের যশ ও গৌরবকে উপলক্ষ করে উপকৃত হওয়া যাবে। ফলে খলিফা তাদের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

পথিমধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর তিন সাথিকে বললেন: আমি কোন অজুহাত দেখিয়ে কাজির পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব। সুফইয়ান পালিয়ে যাবেন। ইবনে আছীম পাগলের ভান করবেন। শরীক কাজির পদ গ্রহণ করবেন।

সুফইয়ান পলায়ন করে নৌকাযোগে ফোরাত পার হওয়ার কালে বললেন– তোমরা আমাকে গোপন করে রাখ। কিছু সংখ্যক লোক আমাকে হত্যা করার ইচ্ছে করেছে। সুফইয়ানের একথার ইঙ্গিত ছিল মহানবি ﷺ এই বাণীর প্রতি– "যাকে কাজি করা হয় তাকে ছুরিবিহীন জবাই করা হয়।" মাঝিগণ তার কথা শুনে তাঁকে লুকিয়ে রাখল। অন্য তিনজন খলিফা মনসুরের দরবারে উপস্থিত হলেন।

খলিফা মনসুর সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

ইমাম আবু হানীফা বললেন– আমির! আমি আরব নই, কাজেই আরব সর্দারগণ আমার নির্দেশ পালন করবে না।

খলিফা বললেন– প্রথমত আরববাসীই বিচারপতি হবে এমন কোন শর্ত নেই। আরব-অনারব সকলের সাথেই বিচারপতি সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়ত এই কাজের জন্য প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শর্ত হচ্ছে আলেম হওয়া। আপনি বর্তমান যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম।

ইমাম সাহেব বললেন– আমি এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই। আপনি যদি আমার এই কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমার কথা গ্রহণ করে একজন অনুপযুক্ত লোককে এই বিরাট দায়িত্ব না দেওয়াই উচিত। আর যদি মিথ্যা মনে করেন তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মুসলমানদের জান ও মালের দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দেওয়া কোন ভাবেই ঠিক হবে না।

খলিফা তার কথার জবাব দিতে না পেরে মনে করলেন এমন প্রকৃতি-স্বভাবের লোককে বিচারপতি না করাই ভালো। সুতরাং তাকে বিদায় করে দিলেন।

এরপর ইবনে আছীমকে ডাকা হলো। তিনি এগিয়ে গিয়ে খলিফার হাত ধরে বললেন– কেমন আছ? তোমার ছেলেমেয়ে ভালো আছে তো? তোমার ছাগ ও ভেড়ার পালের অবস্থা কেমন? তোমার টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই তো? যদি থাকে আমাকে বল একটা ব্যবস্থা করে দেই। খলিফা সভাসদদের বললেন– এ তো বদ্ধ পাগল, একে বিদায় করে দাও।

এর পর আসল শরীকের পালা! তাকেই কাজি পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। শরীক কাজি হওয়ার পর ইমাম সাহেব তাঁর সাথে আর কোনদিন কথা বলেন নি।

এতে মনে হয় রাজা বাদশাহদের দরবার ও সংশ্রব থেকে দূরে থাকার মধ্যেই ইসলাম ও নিজের শান্তি নিহিত। কিন্তু আজকাল দেখা যায় আলেম সম্প্রদায় কাজি হওয়ার জন্য কতই না উদগ্রীব। তার কারণ তা ছাড়া আর কী হতে পারে যে– তারা লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে সত্যবিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। আমীর ওমারাদের বাড়িকে কেবলায় পরিণত করেছে। অন্যায়

অত্যাচারীদের গৃহকে বায়তুল কাবা ভেবে থাকে। স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু হলে তারা তাদের বুযুর্গদের আদেশ উপদেশ অমান্য করে চলে।

গজনিতে একজন আলেম ও সরকারি কর্মচারীর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন– গুদরী পরিধান করা বেদআত।

আমি বললাম– হালালভাবে অর্জিত হালাল কাপড় পরা আপনার মতে বেদআত। কিন্তু এই যে খাঁটি রেশমের তৈরি জামা যা তোমরা জালেমদের খোশামদ করে এনে পরিধান করেছ এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? রেশমী বস্ত্র পরা তো পুরুষদের পক্ষে হারাম। অথচ ফকিরগণ হালালভাবে অর্জিত পয়সা দ্বারা হালাল পোশাক পরিধান করেন তা তোমার কাছে বেদআত। তোমাদের অন্তঃকরণ হারাম দ্বারা আচ্ছাদিত না হলে অবশ্য শরীয়তবিরোধী মত প্রকাশ করতে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মায়াজ (র) বলেন: আমি একরাতে মহানবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করব?

তিনি বললেন: আবু হানীফার নিকট।

হজরত দাতা গঞ্জে বখশ (রা) বলেন: আমি একরাতে হজরত বেলাল (রা) এর মাজারের পাশে ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি মক্কায় অবস্থান করছি। আরও দেখলাম: মহানবি ﷺ এক বৃদ্ধকে ছোট বালকের ন্যায় কোলে করে বনী শায়বা দরজা দিয়ে কাবাগৃহে প্রবেশ করছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে মহানবি ﷺ এর পা মোবারক চুম্বন করলাম এবং বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে থাকলাম যে এই বৃদ্ধ কে?

মহানবি ﷺ আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন: ইনি তোমাদের ইমাম আবু হানীফা !

আমি বুঝতে পারলাম: ইমাম আবু হানীফা মহানবি ﷺ এর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী। তাতে তিনি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি করেন নি।

হজরত ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন: নওফেল ইবনে হাব্বান (র) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম কেয়ামত সংঘটিত হয়েছে।

সবাই হিসাব-কিতাব দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান। দেখলাম মহানবি ﷺ হাউজে কাওসারের পাশে দণ্ডায়মান। তার ডান বামে বহু বুযুর্গও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা চুলবিশিষ্ট একজন সৌন্দর্যবান ব্যক্তি তাঁর পবিত্র গালের উপর মুখ স্থাপন করে রয়েছেন।

হজরত নওফেলও সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে সালাম দিলেন।

আমি তাঁকে বললাম– আমাকে পানি পান করান। তিনি বললেন মহানবি ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করে নি। মহানবি ﷺ তাকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে অনুমতি দিলেন। নওফেল আমাকে এবং আমার সাথিদেরে পানি পান করালেন। কিন্তু পাত্রে যে পরিমাণ পানি ছিল সে পরিমাণই রয়ে গেল। একটুও কমল না।

আমি হজরত নওফেলকে জিজ্ঞেস করলাম– মহানবি ﷺ এর ডান পাশে দাঁড়িয়ে যেই বৃদ্ধ বুযুর্গ তার গালে মুখ স্থাপন করে রয়েছেন তিনি কে?

তিনি উত্তর দিলেন হজরত ইবরাহীম (আ) এবং তার ডানে দাঁড়ানো হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)।

আমি উপস্থিত এক একজনের পরিচয় জিজ্ঞেস করছিলাম আর তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন। আমি সাথে সাথে আঙ্গুলে হিসাব রাখছিলাম যখন সতের জন পর্যন্ত পৌছলাম তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় জাগ্রত হয়ে দেখি আমার আঙ্গুল সতের সংখ্যায় রয়েছে।

হজরত দাউদ তায়ী যখন বিদ্যার্জন শেষ করে বিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ হিসেবে পরিগণিত হন তখন তিনি একদিন হজরত ইমাম আবু হানীফার খেদমতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন এখন আমি কী করব?

হজরত আবু হানীফা (র) বললেন:

عَلَيْكَ بِالْعَمَلِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِلَا عَمَلٍ كَالْجَسَدِ بِلَا رُوحٍ -

"এখন তোমার এলম অনুযায়ী আমল কর। কারণ, আমলহীন এলম প্রাণহীন দেহের ন্যায়।"

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক মারওয়াযি (র)

তিনি সাধকদের নেতা এবং আওতাদদের ইমাম, শরীয়ত ও তরিকতের আলেম এবং তৎকালীন প্রখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অনেক পীর ও দরবেশের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় একজন পারদর্শী আলেম ছিলেন। তার তওবা করা সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত আছে।

তিনি একজন সুন্দরী দাসীর প্রেমে পড়েছিলেন। একরাতে তিনি সেই দাসীর বাড়ির প্রাচীরের নিচে গিয়ে তাকে দেখার জন্য দাঁড়ালেন। এদিকে তার প্রেমাস্পদও ছাদের উপর এসে দাঁড়াল। একে অপরকে দেখায় এমনভাবে বিভোর ছিলেন যে রাত শেষ হয়ে ফজরের আজান শুনতে পেলেন। তারা মনে করলেন– এই বুঝি এশার আজান হলো। কিন্তু যখন দিনের আলো ফুটে ওঠল তখন তারা বাস্তবে ফিরে আসলেন।

হঠাৎ তাঁর অন্তর তাঁকে বলে ওঠল– ওহে মোবারক পুত্র। তোমার কী লজ্জা হয় না যে তুমি রিপুর তাড়নায় সারারাত দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলে। অথচ ইমাম নামাযে দীর্ঘ কেরাত তেলাওয়াত করলে পাগল হয়ে যাও। এরপরও মুমিন হওয়ার দাবি করছ? ধিক! শত ধিক তোমার এই দাবির প্রতি।

তিনি তখনই একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করলেন। কঠোর সাধনা ও মুজাহাদায় মনোনিবেশ করলেন। তিনি তাঁর স্বগ্রামে মারওয়াযে ত্যাগ করে বাগদাদ চলে যান এবং সেখানে নানা আল্লাহ ওয়ালার সান্নিধ্যে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। অতঃপর কিছুদিন মক্কায় অতিবাহিত করে সংগ্রামে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা ও এসলাহে আত্মনিয়োগ করেন।

মারওয়াযের অধিবাসী আহলে হাদীস ও আহলে মারেফাত এই দু'দলে বিভক্ত ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাকে বুযুর্গ হিসেবে সম্মান করত এবং স্বীয় মতাবলম্বী ভাবত। তিনি তার খানকায় দুটি ঘর নির্মাণ করেন

একটি আহলে হাদীস এবং অন্যটি আহলে তরিকতের জন্য। আজ অবধি সেখানে দুটি সম্প্রদায়েরই শিক্ষা-দীক্ষা চলে আসছে। এরপর তিনি হেজায চলে যান।

একবার তার মা দেখতে পান তার ছেলে বাগানে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং একটি সাপ গাছের ডাল মুখে নিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে।

একবার লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করল– আপনি এই যুগের আশ্চর্যজনক বস্তু কী দেখেছেন।

তিনি বললেন– আমি একজন সংসারত্যাগীকে দেখেছি তিনি ইবাদত বন্দেগি করতে করতে পাটখড়ির মতো সরু ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আল্লাহর প্রতি যাওয়ার পথ কোনটি?

তিনি বললেন– যদি তুমি আল্লাহকে চিন তাহলে তার সান্নিধ্য লাভ করার পথও অবশ্য জান।

অতঃপর তিনি বললেন– আমার দিকে দেখ আমি এখনও তাকে পূর্ণভাবে চিনতে পারি নি। তার ইবাদত করতে করতে আমার এই অবস্থা। আর তুমি চিনেও তাঁর নাফরমানী করছ।

অর্থাৎ, আল্লাহর অস্তিত্বকে মানুষের জানা তার জন্য এতটাই যথেষ্ট হওয়া কাম্য যে সে যেন জেনে রাখে যে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার পথ কোনটি? কারণ আল্লাহ সম্বন্ধে অস্তিত্ব জ্ঞান থাকার অর্থই হলো– লোকের মনে তাঁর ভয় সৃষ্টি হওয়া।

আর এই ভয়ের প্রথম দাবিই হচ্ছে, তাঁর নাফরমানী করা হতে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী সে অবশ্য আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমান, অবাধ্য সে যদি বলে আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাহলে সে মিথ্যাবাদী হজরত আবদুল্লাহ বলেন– আমি সেই সংসারত্যাগীর কথায় উপদেশ লাভ করেছি।

তারপর থেকে এমন সব কাজ পরিত্যাগ করেছি যা পূর্বে করতাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন:

اَلسُّكُوْنُ حَرَامٌ عَلٰى قُلُوْبِ اَوْلِيَائِهٖ

"আল্লাহর বন্ধুর হৃদয় কখনও শান্ত থাকতে পারে না বরং সর্বদা চঞ্চল থাকে।"

তার কারণ প্রকাশ্য। মানুষের অন্তঃকরণ হয় উদ্দেশ্য সাধন হলে কিংবা উদ্দেশ্য সাধন হওয়া সম্বন্ধে বে-খবর থাকলে শান্ত হয়। আল্লাহর বন্ধুদের জন্য নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বে-খবর থাকার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের পক্ষে অজ্ঞাত থাকা তো দূরের কতা অলসতা করাও হারাম। উদ্দেশ্য সাধনের সাথে যতটা সম্পর্কে তা পরকালেই অর্জিত হবে। পার্থিব জীবনে তো তারা এই সান্ত্বনা কখনও পায় না যে তারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হক আদায় করেছেন– যাতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। ফলে এই ভয়েই তাদের অন্তর সর্বক্ষণ চঞ্চল থাকে।

হজরত আবু আলী ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ (র)

তরিকতপন্থীদের মধ্যে তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। জীবনের শুরুতে তিনি একজন প্রখ্যাত ডাকাত ছিলেন। মারদ ও মাওরিদের মধ্যবর্তী পথে তিনি পথিকের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন নিতেন। এতদসত্ত্বেও তার মধ্যে আল্লাহভীতি ছিল।

ডাকাতি করার মধ্যেও তার নিজস্ব একটি ধর্ম ছিল। তিনি কোন মহিলাকে কিছু বলতেন না, যার কাছে কম টাকা-পয়সা থাকতে তার অর্থ লুট করতেন না। যাকে লুট করতেন তার পথ খরচ বাবদ কিছু দিয়ে দিতেন।

একদিন এক সওদাগর মারদ থেকে মাওরিদ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। লোকে তাকে বলল– নিরাপত্তার জন্য একটি সরকারি বাহিনী সাথে নিয়ে যান। পথে ফুজায়েল ডাকাতের আশঙ্কা আছে।

সওদাগর বললেন: সরকারি বাহিনীর আমার দরকার নেই। আমি শুনেছি, ফুজায়েল একজন খোদাভীরু লোক। সওদাগর সরকারি রক্ষী বাহিনী সাথে না নিয়ে মারদ থেকে একজন ভালো কারি সাথে নিলেন। কারি সাহেবকে কাফেলার প্রথম উটে বসিয়ে হুকুম করলেন, যখন আমাদের কাফেলা জঙ্গলে প্রবেশ করবে তখন আপনি কুরআন তেলাওয়াত শুরু করবেন। কারি সেই নির্দেশমতোই কাজ করলেন।

আল্লাহর কুদরত দেখুন! ফুজায়েল যেখানে তার সঙ্গী সাথি নিয়ে কাফেলার উপর হামলা করার অপেক্ষায় ছিলেন, কাফেলা সেখানে পৌঁছলে কারি সাহেব মধুর স্বরে সূরা হাদীদের এই আয়াত পাঠ করতে শুরু করলেন। ফুজায়েলের কানে কুরআনের বাণী পৌঁছতেই মনোযোগসহকারে শুনতে লাগলেন:

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ اِعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ـ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞

ঈমানদারদের জন্য এখনও কি সময় আসে নি যে তাঁদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ এবং তার নাযিলকৃত কিতাবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের মতো না হয় যাদের প্রতি পূর্বে কিতাব নাযিল হয়েছিল। তাদের অবস্থা তো এই হয়েছে যে যখন তারা কিতাবপ্রাপ্ত হলো তখন কিছুদিন পর তাদের হৃদয় পাথরে পরিণত হলো। আজও তাদের অনেকে নাফরমানীতে বদ্ধপরিকর হয়ে রয়েছে। তোমরা জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা মৃত জমিনকে সজীবতা দান করেন। দেখ আমি আমার শিক্ষাকে তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছি। হয়ত তোমরা জ্ঞানের সাহায্যে কাজ করবে।

(সূরা: হাদীদ– ১৬-১৭)

আল্লাহর এই বাণী শুনে ফুজায়েলের মনে ও মাথায় চক্কর কেটে গেল যেমন কোন গভীর নিদ্রার নিদ্রিত ব্যক্তি আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে ওঠে গেলে হয়। ইত্যবসরে কারি সাহেব এই অর্থযুক্ত আয়াতও তেলাওয়াত শুরু করলেন:

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ـ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ـ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ـ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ـ سَابِقُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ـ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ـ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

"জেনে রেখ! (পরকালের মোকাবেলায়) পার্থিব এই জীবন এক ধরনের খেলতামাশা, সাময়িক আরাম-আয়েশের উপকরণ। তোমাদের আপসে গর্ব করা এবং ধনসম্পদ ও ছেলে সন্তানদের নিয়ে বড়াই করা ছাড়া বেশি কিছু নয়। তার উদাহরণ বৃষ্টির মতো যাতে সবুজ শস্য ক্ষেত্র দেখে কৃষক উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কিছুদিন পর শষ্য হলুদবর্ণ ধারণ করে শেষ হয়ে যায়। (শুনে রাখ) পরকালে অবাধ্যতার দরুন ভীষণ শাস্তি এবং অনুগতদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পার্থিব জীবন শুধু মন ভুলানো উপকরণ মাত্র।

সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা ও তার জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা জমিন ও আসমানের সমান। আর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি

বিশ্বাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মূলত এটাই আল্লাহর ফজল যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ অতি মেহেরবান।" (সূরা: হাদীদ– ২০-২১)

এই পবিত্র বাণী শ্রবণ করতেই ফুজায়েলের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়; আল্লাহ প্রেমের যে অগ্নিশিখা এতদিন তার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সাথে সাথে তওবাহ করে ডাকাতি ছেড়ে দিলেন। যাদের সম্পদ ডাকাতি করেছিলেন– তাদের যাকে যাকে চিনতেন তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি মক্কা শরীফ পৌছে বহুদিন ধরে কাবার খেদমত করেন।

তিনি বহু আলেমের সহচর্য লাভ করেন। তাদের মাঝে ইমাম আবু হানীফাও একজন ছিলেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাসাউফ এবং মারেফাত সম্পর্কে তিনি অতি সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:

مَنْ عَرَفَ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ عَبَدَ بِكُلِّ طَاعَةٍ ـ

"যে ব্যক্তি যথার্থভাবে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানলাভ করে সে তার সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে থাকে।"

অর্থাৎ কোন লোকের ইবাদত বন্দেগি দ্বারাই বুঝা যায় যে সে তার মহান আল্লাহকে কিরূপ চিনতে পেরেছে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সে কী ধারণা পোষণ করে থাকে।

যে যতটা আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানে জ্ঞানী হবে, তার বন্ধুতে পরিণত হবে সে ততটা গুরুত্বসহকারে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাবে। তাই মহানবি ﷺ সম্বন্ধে হজরত আয়েশা (রা) বলেছেন:

একরাতে হুজুর ﷺ বিছানা থেকে উঠে বাইরে গমন করলেন। আমার ধারণা হলো হয়তো তিনি অন্য কোন বিবির কক্ষে গিয়েছেন। আমি উঠে তার পায়ের শব্দ ধরে পেছনে পেছনে চললাম। মসজিদের কাছে গিয়ে দেখি তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন।

তিনি ফজরের নামায পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন। বিলাল এসে ফজরের আজান দিলেন। ফজরের নামায আদায় করে তিনি যখন কক্ষে আসলেন

তখন আমি লক্ষ করে দেখলাম, তার পদদ্বয় ফুলে ফেটে গেছে এবং সেই ফাটা হতে হলুদ রংয়ের পানি বের হচ্ছে।

এই অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে যায় এবং আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ তো আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। তবে আপনি কেন এত কষ্ট করে ইবাদত বন্দেগি করেন!

হুজুর ﷺ এরশাদ করলেন: এটা আমার প্রভুর বদান্যতা।

أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

"আমি কি তাঁর বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব না?"

আমার প্রভু আমাকে পুরস্কৃত করেছেন আর তুমি আমাকে তাঁর ইবাদত করা থেকে বিরত থাকতে বলছ!

ফজল ইবনে রবী বলেন আমি খলিফা হারুনুর রশীদের সাথে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাই। হজ্জ সম্পাদন করার পর খলিফা আমাকে বললেন, এখানে যদি আল্লাহর কোন ওলি থাকেন তাহলে তাঁর নিকট আমাকে নিয়ে চল।

ফযল বললেন: আবদুর রাজ্জাক সানয়ানী এখানে রয়েছেন।

খলিফা বললেন: আমাকে তার নিকট নিয়ে যাও। আমরা তার নিকট গেলাম। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর বিদায় নিয়ে ফিরে আসলাম। হারুনুর রশীদ বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ তিনি ঋণী আছেন কি না? জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি ঋণী আছি।

খলিফা বললেন: তাঁর ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা করে দাও।

সেখান হতে বের হওয়ার পর খলিফা বললেন: আমার ইচ্ছা এর চেয়েও যদি কোন বুযুর্গ থাকেন তাহলে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি।

আমি বললাম: সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাও বর্তমানে এখানে রয়েছেন।

খলিফা বললেন: তবে আমাকে তার নিকট নিয়ে যাও। আমি খলিফাকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা ফিরে

গেলাম। খলিফা বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখ; তিনি ঋণী কিনা? তিনিও ঋণী আছেন বলে উল্লেখ করলেন। খলিফা তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

সেখান থেকে বের হয়ে খলিফা বললেন: আমার ইচ্ছা এখনও পূর্ণ হয় নি। আমার ফুজায়েল ইবনে আইয়াজের কথা স্মরণ হলো। আমি খলিফাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। হজরত ফুজায়েল তখন কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। আমি দ্বারে করাঘাত করলে আওয়ায এল, কে?

আমি বললাম: আমিরুল মুমিনীন আপনার দ্বারপ্রান্তে। তিনি বললেন: আমার কাছে আমিরুল মুমিনীনের কী প্রয়োজন? অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি দরজা খুলে বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং ঘরের এক কোণে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। হারুনুর রশীদ ঘরে প্রবেশ করে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন। খলিফার হাত তাঁর হাতে লাগল।

ফুজায়েল তার হাত ধরে বললেন: আহ! এমন নরম হাত দোযখের আগুনে জ্বলবে। কতই না ভাল হতো যদি এই হাত দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেত।

খলিফা এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসলে বললেন: হে ফুজায়েল আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন তোমার পিতা মহানবি ﷺ এর চাচা ছিলেন। তিনি আরজ করেছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের নেতা করে দিন।

মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন: কেয়ামতের দিন নেতৃত্বই পুরোপুরি লজ্জার কারণস্বরূপ হবে।

হারুনুর রশীদ বললেন: এর আরও কিছু নসিহত করুন।

তিনি বললেন: ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে যখন খলিফা নির্বাচিত করা হয় তখন তিনি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রেজা ইবনে হায়াত ও মুহম্মদ ইবনে কাব কারযি (র) কে ডেকে বললেন, আমাকে তো এই বিপদে ফেলেছে। এখন এমন কোন পথ দেখাও যাতে আমি এই বিপদ হতে মুক্তি পেতে পারি।

তাদের মধ্যে একজন বললেন: যদি তুমি পরকালে আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ থাকতে চাও তবে মনে রেখো এই মুসলিম দেশ তোমার আবাস। এলাকার অধিবাসী তোমার পরিবারের লোক। বৃদ্ধকে বাপ; যুবককে ভাই এবং ছোটকে সন্তান তুল্য মনে করবে।

অতঃপর ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ বললেন: আমিরুল মুমিনীন। আমার ভয় হয় না জানি আপনার এই কমনীয় মুখমণ্ডল জাহান্নামের আগুনে ঝালসিয়ে যায় কি না? আল্লাহকে ভয় করুন এবং তার হক আদায় করুন।

এরপর খলিফা জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি কারও কাছে কোন বিষয়ে ঋণী আছেন?

তিনি বললেন: হাঁ! আল্লাহর আনুগত্যের ঋণ আমার গর্দানে চেপে রয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করা হয় কি না?

হারুন বললেন: আমার বলার উদ্দেশ্যে হলো পার্থিব ঋণ। তিনি বললেন: মহান আল্লাহর অসংখ্য শোকরিয়া যে তিনি আমাকে তাঁর নেয়ামত দ্বারা তৃপ্ত রেখেছেন। মানুষের নিকট তাঁর নামে শেকায়েত করার আমার কিছুই নেই।

তখন হারুনুর রশীদ তাকে হাজার আশরাফীর একটি থলে প্রদান করে বললেন: এটা আপনার নিজস্ব প্রয়োজন ব্যয় করুন। তিনি বললেন: আমার নসিহত আপনার কোন কাজেই আসল না। আমি আপনাকে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসার এবং মুক্তির পথের সন্ধান দিচ্ছি। পক্ষান্তরে আপনি আমাকে বিপদে জড়িত করতে চাচ্ছেন। এটা কি আপনার অন্যায় এবং অত্যাচারের মধ্যে পরিগণিত নয়।

হারুনুর রশীদ বাইরে এসে বললেন ওহে ফজল। ফুজায়েল প্রকৃতপক্ষেই বাদশাহ। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর নিকট অতি নগণ্য। তাই তিনি দুনিয়ার সবকিছুই ত্যাগ করতে পেরেছেন।

হজরত আবুল ফয়েজ জুননুন ইবনে ইবরাহীম মিসরি (র)

তার প্রকৃত নাম ছিল ছাওবান। তার জীবদ্দশায় মিসরের অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তাকে চিনত। অধিকাংশ লোকই তার নিন্দাবাদ করত, অযথা দুঃখ-কষ্ট দিত। যে রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে রাতে প্রায় সত্তর জন ব্যক্তি স্বপ্নে মহানবি ﷺ কে দেখলেন। মহানবি ﷺ এরশাদ করছিলেন, আজ আল্লাহর বন্ধু জুননূন আসছে। আমি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এসেছি।

তিনি লোকের প্রতি খুবই মেহেরবান ছিলেন। একবার তিনি তার ভক্তদের সাথে নীলনদ পার হচ্ছিলেন। ঐ সময় বিপরীত দিক থেকে অন্য আর একখানি নৌকা আসছিল। সে নৌকার লোকজন বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করছিল এবং খেল-তামাশা ও হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত ছিল।

মুরিদগণ বললেন, ওহে শায়খ! এদের উপর বদদোয়া করুন যেন তারা ডুবে মরে এবং আল্লাহর দুনিয়া যেন তাদের অপকর্ম হতে পবিত্র হয়।

একথা শুনে তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং হাত ওঠিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: "হে আমার আল্লাহ! তুমি তাদের এই দুনিয়ায় যেমন খুশী রেখেছ পরকালেও তদ্রূপ খুশি রেখো।"

তার এই দোয়া শুনে ভক্তবৃন্দ অভিভূত হয়ে পড়ল। ইত্যবসরে ঐ নৌকাখানি নিকটে এসে গেল। তারা এই নৌকায় হজরত জুননূনকে দেখে লজ্জা পেল এবং তাদের বাদ্যযন্ত্র পানিতে নিক্ষেপ করে তওবা করল এবং তার একান্ত ভক্তে পরিণত হলো।

হজরত জুননূন বললেন– তোমরা দেখলে, তোমাদের আশাও পূর্ণ হলো আর তাদের আশাও পূর্ণ হলো।

তার এই কাজ মহানবি ﷺ এর কাজের হুবহু নমুনা ছিল। মহানবি ﷺ এর জাতি তাকে অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন করা সত্ত্বেও মহানবি ﷺ তাদের জন্য দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ –

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে সরল পথ প্রদর্শন কর। তারা অতি নির্বোধ কিছুই বুঝে না।"

হজরত জুননূন (র) বলেন: আমি মক্কা শরীফ থেকে মিশর প্রত্যাবর্তন করার সময় পথিমধ্যে দূর হতে একজনকে আসতে দেখে দৃঢ়ভাবে সংকল্প করলাম যে আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব। যখন আমরা একে অন্যের নিকট পৌঁছলাম তখন দেখলাম তিনি একজন বৃদ্ধা মহিলা। তিনি আজানু লম্বিত পশমী পোশাক পরে রয়েছেন। তার এক হাতে পানির পাত্র অন্য হাতে লাঠি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে আসছেন?

বৃদ্ধা বললেন: আল্লাহর নিকট থেকে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম: কোথায় যাবেন?

জবাব দিলেন: আল্লাহর কাছে।

প্রয়োজন হতে পারে এজন্য আমি আমার কাছে একটি আশরাফী রেখে দিয়েছিলাম। আমি তা তার খেদমতে পেশ করলাম। তিনি আমার গালে একটি থাপ্পর মেরে বললেন, ওহে জুননূন! তুমি তোমার হৃদয়ে আল্লাহর যে আকৃতি পোষণ করে রেখেছ তা তোমার অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাজ করি এবং যা কিছু চাওয়া ও পাওয়ার তার নিকটই চাই এবং পাই। তার বন্দেগিতে যেমন কাকেও অংশীদার করি না তদ্রূপ তিনি ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে কিছু গ্রহণও করি না।

একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

বৃদ্ধা বলেছিলেন: আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করি। এটা ছিল তার আল্লাহর সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং গভীর ভালবাসার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক জাতীয় লোক আছে যারা পরকালের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবাদত বন্দেগি করে। তারা ভাবে আমরা আল্লাহর কাজ করছি। আর একজাতীয় লোক আছে– যারা পাপ-পুণ্যের কোন আশা না করে শুধু মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য ইবাদত বন্দেগি করে; আল্লাহর নির্ষেধিত কাজ করা হতে বিরত থাকে। তারা ভাবে পুরস্কৃত বা তিরস্কার করা এটা আল্লাহর

ইচ্ছাধীন। যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন আর যাকে ইচ্ছা তিরস্কার করবেন। বৃদ্ধা ছিলেন এই শ্রেণীর ব্যক্তি।

আমাদের খুব স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দা যদি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে এবং তাঁর অনুগত থাকে তাহলে তাতে আল্লাহর কোন উপকারই হয় না। আবার কেউ গুনাহ করলে বা আল্লাহর অবাধ্য হলে তাতেও আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। এই পৃথিবীর প্রতিটি লোকও যদি হজরত আবু বকর (রা) এর মতো সৎ হয় তবে তা দ্বারা তাঁরাই উপকৃত হবেন। অপরদিকে সমস্ত লোক ফেরআউনের ন্যায় নাফরমান হলে তাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে– আল্লাহর কোন ক্ষতিই হবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۞

"যদি তোমরা সৎ কাজ কর তাহলে তা তোমাদের উপকারেই আসবে। আর যদি পাপ কর তবে সেজন্য তোমাদেরই ভোগান্তি হবে।"

(সূরা: বানী ইসরাঈল– ৭)

আরও এরশাদ করেন:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۞

"যে ব্যক্তিই কঠোর সাধনা করে সে তা নিজের জন্যই করে। আল্লাহ তায়ালা কোন বিষয়েই মানুষের মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা: আল-আনকাবুত– ৬)

হজরত জুননূন বলেন:

اَلْعَارِفُ كُلَّ يَوْمٍ اَخْشَعُ لِاَنَّهٗ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الرَّبِّ اَقْرَبُ ـ

"আরেফ প্রতিদিন আল্লাহর সমীপে বেশি হতে বেশি করে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। কারণ, প্রতিনিয়ত তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে থাকেন।"

মারেফাত হতে তার মধ্যে বিনয়তা, বিনয়তা হতে নৈকট্য আর নৈকট্য হতে আরও বেশি মারেফাতের সৃষ্টি হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিনয়তা এবং আল্লাহভীতি ছাড়া মারেফাতের দাবি করে তাহলে সে জাহেল এবং মিথ্যাবাদী– আরেফ নয়। আরেফ নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর বন্দেগি করা ছাড়া অন্য পথে চলতে পারেন না।

তিনি আরও বলেছেন:

اَلصِّدْقُ سَيْفُ اللهِ فِىْ اَرْضِهٖ مَاوُضِعَ عَلٰى شَىْءٍ اِلاَّ قَطَعَهٗ ـ

"এই পৃথিবীতে সততা আল্লাহর তরবারীস্বরূপ; যার উপর পড়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।"

সততা এমন বস্তু যার নিকট দুনিয়ায় কোন শক্তিই টিকে থাকেত সক্ষম হয় না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সততা আল্লাহর তওহিদ ও মারেফাত। মানুষের অন্তরে যখন এই সততা বদ্ধমূল হয় তখন আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভালবাসা, অন্যের সাথে সম্পর্ক এবং অন্যের মান মর্যাদাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। এমন ব্যক্তিই পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর ইবাদতে আত্মসমর্পণ করে থাকেন।

হজরত আবু ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনে আদহাম (র)

তিনি তাঁর সময়ের জননেতা ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ওলি ছিলেন। তিনি ছিলেন বলখের বাদশাহ। একদিন তিনি শিকারের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি একটি হরিণের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন– পেছনে তাঁর লোকজন পড়ে রইল। হরিণ প্রাণপনে ছুটে পালাতে থাকে আর তিনিও তাকে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

অকস্মাৎ তিনি শুনতে পেলেন: হরিণ দৌড়াচ্ছে আর তাকে যেন বলছে– "হে ইবরাহীম! তোমার সৃষ্টিকর্তা কি তোমাকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন? অথবা তোমাকে কি তিনি এই কাজ করার হুকুম করেছেন?

এ কথায়ই তাঁর অন্তরের রূপ পরিবর্তন করে দিল এবং তিনি তওবা করলেন। পার্থিব শান-শওকত, রাজ্যপাট ছেড়ে দরবেশী ও কৃচ্ছ্রতার জীবন অবলম্বন করলেন। তওবাহ করার পর থেকে তিনি তার স্বহস্তের রোজগার ছাড়া অন্য কিছু আহার করতেন না।

তিনি হজরত ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ, ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ এবং সুফইয়ান ছাওরীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। হজরত জোনায়েদ (র) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন–

مَفَاتِيْحُ الْعُلُوْمِ اِبْرَاهِيْمَ ـ

"ইবরাহীম তরিকতের এলমের কুঞ্জি।"

তিনি বলতেন–

اِتَّخِذِ اللهَ صَاحِبًا وَذَرِ النَّاسَ جَانِبًا ـ

"আল্লাহকে বন্ধু ও সহচর হিসেবে গ্রহণ কর এবং সৃষ্টিকে একদিকে রেখে দাও।"

এতে বুঝা যায় স্বীয় নফসও সৃষ্টির মধ্যে পরিগণিত। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বন্ধুত্ব এবং সান্নিধ্য লাভ হবে না।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ

তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি বিষয়ের সম্পর্ক বর্জন করে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতের পথ অনুসরণ কর।

আল্লাহর উক্ত বাণীর ব্যাখ্যা হিসেবেই হজরত ইবরাহীম আদহাম ঐ কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি পার্থিব কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে যায়– আল্লাহপ্রাপ্তির পথে তা-ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আর যে স্বীয় নফস এবং পার্থিব অন্যান্য বিষয়বস্তু হতে অনাসক্ত হয় সে-ই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ধন্য হয়। মনে রেখো নিজের প্রতি উদাসীন হওয়াই মানুষের পক্ষে কঠিন কাজ। ফলে যখনই তুমি তোমার হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে তখন অন্য কিছুর সংশ্রব ত্যাগ করাও সহজ হবে।

তিনি তার কৃচ্ছ্র সাধনা সম্পর্কে বলেন: আমি কোন এক জঙ্গলে পৌছলে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে আমাকে বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি জান এটা কিরূপ বরকতময় স্থান এবং যেখানে তুমি বিনা খরচে এসে পৌছেছ।

সাথে সাথেই আমি বুঝতে সক্ষম হলাম– এতো শয়তান! এতো আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রতি মনোযোগী করতে চেষ্টা করছ। তখন আমার পকেটে রৌপ্যের চারটি টাকা ছিল। তা বের করে দূরে ফেলে দিলাম। এরপর আমি চার বছর এই বনে অবস্থান করছি। কিন্তু কোন প্রকার অসুবিধা ব্যতীতই আমার প্রভু আমাকে পানাহারের বস্তু দান করেছেন। তখন হতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তা আমার অন্তরে আর স্থান পায় নি।

হজরত বিশর ইবনে হাফী (র)

তিনি সর্ব বিষয়ের আলেম, মারেফাতের বাদশাহ ও তৎকালীন সুফিকুলের মাথার মুকুট ছিলেন। তিনি তাঁর খালু বু আলী হাশরামের মুরিদ এবং হজরত ফোযায়েল ইবনে আইয়াযের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তার তওবাহ করার ঘটনা নিম্নরূপ–

যৌবনে একবার তিনি মদমত্ত হয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে এক টুকরা কাগজ দেখে তা তুলে নিয়ে দেখেন তাতে বিসমিল্লাহ লিখিত রয়েছে। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সাথে তা সাথে নিয়ে যান এবং আতর মেখে পবিত্র একস্থানে রেখে দেন। সে রাতেই স্বপ্নে আল্লাহ তাকে বললেন–

হে বিশর! তুমি আমার নামের প্রতি সম্মান দেখিয়েছ। তাকে সুগন্ধিময় করেছ। আমার মহানতার শপথ আমিও তোমার নামকে খুশবুর সাথে

ইহকাল পরকালে প্রচার করব। তিনি তখনই ঘুম থেকে ওঠে তওবাহ করলেন এবং ইবাদত বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করলেন।

তার একটি বিশেষত্ব ছিল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও জুতা পরিধান করতেন না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিতেন, এই জমিন আল্লাহর ফরশ (বিছানা)। তার উপর দিয়ে আমি কীভাবে জুতা পরে হাঁটব? আর আমি এটাও চাই না যে এই বিছানা এবং আমার পায়ের মধ্যে কোন কিছু অন্তরায় থাকুক।

তিনি বলতেন: কোন ব্যক্তির যদি এটাই কাম্য হয় যে সে দুনিয়ায় মান-মর্যাদার সাথে থাকুক এবং পরকালেও সম্মানিত হোক, তাহলে তাকে অবশ্য এই তিনটি বিষয় বর্জন করে চলতে হবে।

১. প্রয়োজনবোধে আল্লাহ ছাড়া আর কারও নিকট হাত বাড়াবে না।

২. কারও বদনাম করবে না এবং

৩. কারও দাওয়াত কবুল করবে না।

লোকের নিকট কিছু চাওয়া এবং পাওয়া সম্পর্কে তিনি বলতেন: কোন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু চাওয়ার অর্থই এমন যেমন কোন কয়েদী অন্য কোন কয়েদীর কাছে সাহায্য কামনা করা। যে ব্যক্তি আল্লাহকেই একমাত্র প্রয়োজন সমাধানকারী মনে করে সে কখনও অন্যের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে পারে না।

হজরত আবু ইয়াযিদ তাইফুর বিন ইসা বোস্তামি (র)

তিনি তাসাউফের দশ ইমামের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র) তার ব্যাপারে বলতেন– হজরত জিবরাঈল (আ) যেমন ফেরেশতাদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন আবু ইয়াযিদ আমাদের মধ্যে তদ্রূপ মর্যাদার অধিকারী।

তার দাদা ছিল অগ্নিপূজক। কিন্তু তাঁর পিতা বোস্তামের বুযুর্গদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তিনি হুজুর ﷺ হতে বড় মরতবাসম্পন্ন রেওয়ায়েত

করেছেন। হজরত তাইফুর কঠিন সাধনা ও মুজাহাদা দ্বারা তার ইবাদত আরম্ভ করেন।

তিনি বলেন: আমি ত্রিশ বছর কঠোর সাধনা করেছি। কিন্তু এলম ও তার সঠিক অনুসরণ করায় উক্ত সাধনায় আমি তেমন কোন অসুবিধা ভোগ করি নি। যদি আলেমদের মাঝে মতবিরোধ না থাকত তাহলে আমি তাতেই অবস্থান করতাম। কিন্তু আলেমদের মতবিরোধ আল্লাহর অপার মেহেরবানি। তবে তওহিদের ব্যাপারে কোন প্রকার বিরোধেই আল্লাহর কোন রহমত নেই।

নিঃস্বার্থ আল্লাহ প্রেম এবং ইবাদত সম্পর্কে হজরত আবু ইয়াযিদ বলেন, "প্রেমিকদের নিকট জান্নাত মূল্যহীন কারণ, আল্লাহ প্রেমিকগণ তো আল্লাহর রহমতে বেষ্টন হয়ে রয়েছেন। তাছাড়া সত্যিকারের আল্লাহ প্রেমিক আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় বস্তু হতে সম্পর্কহীন থাকেন। জান্নাতও আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। প্রেমাস্পদকে সম্মান প্রদর্শন এবং তার নির্দেশ পালনেই প্রেমিকের আনন্দ। তার আনন্দ ও স্বাদের প্রথম এবং শেষ কেবল আল্লাহ।

হজরত হারেস মুহাসেবী (র)

তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ও ওলি ছিলেন। সেই যুগের সকল আলেমই তার এলমের মুখাপেক্ষী ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানগরিমায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বাগায়েব নামক মারেফাতের গ্রন্থ তিনিই রচনা করেন।

তিনি বলতেন: অন্তর দ্বারা যে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা হয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ পরিচালনা করে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তা হতে উত্তম।

তাই যদি শুধু অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিচালনা এবং কঠোর সাধনা দ্বারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে খ্রিস্টান সন্ন্যাসী এবং হিন্দু যোগী যেরূপ কঠোর সাধনা করে তাতে তারা নিশ্চয় আল্লাহকে পেত।

আবার এলম কোন সময় আমল ব্যতীতই উপকারী হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি ঈমান এনে আমল করার সুযোগ না পেয়েই মারা যায়। তাহলে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু শুধু আমল এলম ছাড়া কোন উপকারেই আসে না।

হজরত মুহাসেবীর এই বাণী হুজুর ﷺ এর বাণীর ন্যায়। যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন: "আল্লাহর পথে এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা ষাট বছর নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"

হজরত মুহাসেবী এক দরবেশকে বলেছিলেন: তুমি আল্লাহর হয়ে যাও। যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে মৃত্যুবরণ কর যেন তোমার আজাব ও পাপ আর বৃদ্ধি হতে না পারে।

হজরত দাউদ তায়ী (র)

তিনি ইমাম হানীফার শিষ্য, হজরত হাবীব রায়ী-র মুরিদ, হজরত ফুজায়েল ও ইবরাহীম আদহামের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ফেকাহর ওস্তাদ, সুফিদের নেতা এবং শ্রেষ্ঠ ওলি ছিলেন।

তিনি তাঁর উস্তাদ ইমাম হানীফার মতো সরকারি পদ গ্রহণ না করার দৃঢ় মন ভাবাপন্ন ছিলেন।

বর্ণিত আছে মুহম্মদ ইবনে হাসান তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অথচ কাজি আবু ইউসুফ উচ্চ পর্যায়ের আলেম এবং ফকীহ থাকা সত্ত্বেও তাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিতেন না।

একদিন কোন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: মুহম্মদ ইবনে হাসান এবং আবু ইউসুফ জ্ঞান-গরিমায় সমপর্যায়ের। কিন্তু মুহম্মদ আপনার অতি প্রিয়ভাজন। অথচ আবু ইউসুফকে আপনার কাছেও ঘেঁষতে দেন না এর কারণ কী?

তিনি বললেন: মুহম্মদ ইবনে হাসান দুনিয়ার অর্থ ও নেয়ামতের পরিবর্তে জ্ঞানার্জন করেছেন ; তার এই এলম ধর্মের সম্মান এবং দুনিয়ার অপমানের কারণস্বরূপ হয়েছে। অপরদিকে আবু ইউসুফ দরিদ্রতা ও অপমানের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জন করত তাঁকেই তাঁর পার্থিব সম্মান ও উন্নতির কাজে ব্যবহার করছে। অতএব সে মুহম্মদ ইবনে হাসানের সমতুল্য কীভাবে হতে পারে?

হজরত মারুফ কারখি বলতেন: হজরত দাউদ তায়ী (র) দুনিয়াকে যেমন ঘৃণার চোখে দেখতেন আমি তেমন আর কাউকেও অবস্থা করতে দেখি নি। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার বিষয়বস্তুকে কোন মূল্যই দিতেন না। অপরদিকে কোন ফকির যত হীন অবস্থায়ই থাকুক না কেন তিনি তার নিকট বিনয়তার সাথে থাকতেন।

তিনি তার এক মুরিদকে উপদেশস্বরূপ বললেন– যদি তুমি তোমার নিরাপত্তা চাও তাহলে তুমি দুনিয়া হতে দূরে থাক। আর যদি বুযুর্গী এবং কারামতের আকাঙ্ক্ষী হও তাহলে পরকালের আশা-ভরসার গলায় ছুরি চালাও। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি কামনা করা ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

হজরত সররী সাকতী (র)

তিনি হজরত জোনায়েদের খালু, কারখী (রা) এর মুরিদ এবং হজরত হাবীব (র)-এর সান্নিধ্যে থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তিনি বহু বিষয়ের আলেম ছিলেন। ইরাকের বহুসংখ্যক পীর তাঁর মুরিদ ছিলেন। প্রথম জীবনে বাগদাদের বাজারে পুরাতন জিনিষপত্রের কেনা-বেচা করতেন।

একদিন হজরত হাবীব রায়ী (র) তাঁর দোকানের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কালে তিনি তাকে কিছু রুটি দিলেন। রুটি পেয়ে হজরত হাবীব দোআ করলেন: আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তারপর থেকেই তিনি পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেন।

একদিন বাগদাদের বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটল। লোকে তাকে সংবাদ দিল আপনার দোকানও পুড়ে গেছে। তিনি বলেন– ভালোই হয়েছে। এখন আর দোকানের জন্য কোন ধরনের চিন্তা করতে হবে না। তার দোকানের চারপাশের দোকান জ্বলে গিয়েছিল তার উপর ধারণা করেই লোকে তার দোকান জ্বলে যাওয়ার খবর দিয়েছিল। কিন্তু তার দোকানের কোন ক্ষতিই হয় নি। তিনি এই অবস্থা দেখে দোকানের সব মালপত্র গরিবদের মধ্যে বণ্টন

করে দিলেন। এবার তিনি সংসারের মায়া কাটিয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে পূর্ণভাবে মনোযোগী হলেন।

তাঁর দোয়া করা হতেই বুঝা যায় আল্লাহর সাথে তার কতটা সম্পর্ক ছিল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন– হে আমার মাওলা ! যদি তুমি আমাকে শাস্তি দেওয়ার ফয়সালাই কর তাহলে তোমার সান্নিধ্য হতে দূরে থাকার আজাব দিয়ো না। করেন দোযখের কঠিন আজাব আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলার সম্মান এবং দীদার হতে অন্তরায় হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

"কেয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন আর না তাদের প্রতি তাকাবেন।"

তাই আল্লাহ যদি কোন পাপীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিংবা কথা বলেন তবেই তার আপদ কম হতে পারে বা সে আজাব হতে মুক্তি পেতে পারে।

হজরত শফীক আযদী (র)

তিনি হজরত ইবরাহীম আদহাম (র) এর শিষ্য ও মুরিদ ছিলেন। তিনি শরীয়ত ও তরিকতের প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। বিপদে তিনি খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন। সাধনা মুজাহাদায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তার তওবার কারণ নিম্নরূপ।

এক সময় বাগদাদে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে মানুষে মানুষ খাওয়া শুরু করল। সকল লোকই হয়রান পেরেশান। কিন্তু একজন দাস বাজারের মধ্য দিয়ে আনন্দের সাথে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। মানুষেরা তাকে ধমকিয়ে বলল, দেশের সকল মানুষ অনাহারে ধুঁকে মরছে আর তুই গান গেয়ে যাচ্ছিস, তোর কি লজ্জা-শরম বলতে কিছুই নেই।

গোলাম বলল– আমি কেন চিন্তা-ভাবনা করব? আমার মালিকের খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাবই নেই। কাজেই তোমাদের দুঃখ দেখে আমি কেন গান গাব না।

গোলামের মুখে এই কথা শুনে তার দিব্য দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি বললেন– হে প্রভু আলম! যে দাসের মালিকের সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে সে তার ওপর নির্ভর করেই এত নিশ্চিন্ত। আর তুমি সারা বিশ্বের মালিক, তোমার ভাণ্ডার অফুরন্ত। অথচ আমরা তোমার দাস হয়েও আজ খাদ্য চিন্তায় বিভোর!

এই চিন্তা তার মনে উদয় হওয়ামাত্রই তিনি দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বলেন: এরপর থেকে আমি আর কোনদিন খাওয়ার চিন্তা করি নি। তিনি আরও বলতেন আমি তো উক্ত গোলামের শাগরিদ। আমি যা কিছু পেয়েছি তার নিকটই পেয়েছি।

এই ব্যাপারে তিনি নিজেই একটি ঘটনা বলেন যে, একদিন এক বৃদ্ধ তার কাছে এসে বললেন: হে শায়খ! আমি আমার জীবনে বহু পাপ করেছি। এখন তওবা করতে চাই।

তিনি বললেন: বাবা! অতি বিলম্বে এসেছেন। বৃদ্ধ বললেন– না! আমি খুব শীঘ্র এসেছি।

তিনি বললেন: তা কীভাবে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন: যে মৃত্যুর পূর্বে আসে সে অতি শীঘ্র আসে– যদিও সে বিলম্বে আগমন করে।

তিনি বলতেন: আল্লাহ তায়ালা তার অনুগতদের মৃত্যুকে জীবনে রূপান্তর করে দেন। আবার নাফরমানদের জীবনকে মৃতের মধ্যে পরিগণিত করেন। আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেন– "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা তাদের প্রভুর কাছে জীবিকা পেয়ে থাক।"

নাফরমান বান্দাদের ব্যাপারে বলেন: তোমরা না মৃতদের শুনাতে পার আর না বধিরকে তোমাদের আওয়াজ শুনাতে পার। বিশেষভাবে যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

হজরত আবদুর রহমান আতিয়া দুররানী (র)

তিনি তার সময়ের প্রখ্যাত আলেম এবং উন্নত স্তরের সাধনা ও মুজাহাদাকারী ছিলেন। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তিনি অতি উন্নতমানের কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন: যখন আশা ভয়ের ওপর জয়ী হয় তখন মানুষ নির্ভর হয়ে যায় এবং তার নফসের রক্ষণাবেক্ষণ করা ছেড়ে দেয়। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের ভাটা পড়ে। অপরদিকে ভয় যদি আশার উপর বিজয়ী হয় তবে তওহীদের ক্ষতি সাধন হয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বখশিশ হতে নিরাশ হলেই ভয়ের আধিক্য দেখা দেয়। আল্লাহর রহমত ও বখশিশ হতে নিরাশ হওয়া শিরক হতে সৃষ্টি হয়। আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতাবান জ্ঞান না করার এবং অন্যকে তার ক্ষমতায় বাধাদানকারী মনে করার কারণেই নিরাশার সৃষ্টি হয়। এই ধারণা তওহিদকে নষ্ট করে দেয়।

তাই আশার দুরস্তী এবং ভয়ের সঠিকতা উভয়ই দরকার। যখন আশা এবং ভয় সমান সমান হয়ে যায় তখন তওহিদ ও হাল নিরাপদ হয়। তওহিদ নিরাপদ নিলে লোক ঈমানদার হয় এবং হাল সঠিক হলে আল্লাহর অনুগত হয়। আশা ও ভয় সমমানের হলেই বান্দা মোমেন এবং সত্যিকারের বান্দায় পরিণত হয়। তাই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন– "আশা ও ভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নামই ঈমান।"

আহমদ ইবনে আবু জাওহার বলেন, একরাতে আমি নির্জনে নামায পড়ার সময় এই চিন্তা করে খুশি হলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমাকে দেখছেন না। ভোরে আমি একথা এসে দুররানীর নিকট বলায় তিনি বললেন– তুমি অত্যন্ত দুর্বল। সৃষ্টি হতে এখনও তুমি মুক্ত হও নি। কারণ নির্জনে তোমার এক অবস্থা আর প্রকাশ্যে তোমার অন্য অবস্থা হয়। নিজের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য দিকে খেয়াল করা প্রকৃত বান্দার কাজ নয়।

হজরত মারুফ কারখি (র)

আল্লাহগত প্রাণ হজরত মারুফ ইবনে ফিরোয কারখি (র) তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ ওলি ছিলেন। প্রথম জীবনে একেবারে ধর্মভ্রষ্ট ছিলেন। তিনি আলী ইবনে মূসার হাতে বায়আত করেন এবং এমন ভাগ্যবান হন যে পীর সাহেব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন।

হজরত কারখি (র) বলতেন: পৌরুষের তিনটি আলামত।

১. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার প্রতি এমন কৃতজ্ঞতার পথ অনুসরণ করবে যে লোক তাঁর বান্দাত্বের মর্যাদার বিরোধিতা এবং নাফরমানী করা নিজের জন্য হারাম করে দেয়।

২. কোন ধরনের পুরস্কার না পেয়ে প্রশংসা করা।

অর্থাৎ পূণ্যের সাথে তার এত প্রেম-প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা যে কোন ব্যক্তি যদি জীবনে তার সাথে সদ্ব্যবহার নাও করে, তথাপি সে উক্ত ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করতে কোন ধরনের কার্পণ্য করে না। তথাপি যেখানে এবং যে অবস্থায়ই কোন পূণ্যের কাজ দেখে তাকে নিজের কাজ ভেবে আদায় করে এবং তাকে যথাযথ সম্মান করে।

৩. না চেয়ে দান করা। অর্থাৎ দান করার মতো সামর্থ্য থাকলে দানে কোন ধরনের ভেদাভেদ না করে সবসময় দান করতে থাকা, আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করতে থাকা। কোন অভাবীর সংবাদ পেলে নিজ থেকেই তাকে দান করবে; তার চাওয়ার আশায় থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালার এই তিনটি গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ কখনও তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। বান্দা তাঁর সাথে যে কোন প্রকার ব্যবহারই করুক না কেন তিনি তার ওয়াদা ও মেহেরবানিতে অটল থাকেন। বান্দা যে কোন পথেই চলুক না কেন আল্লাহ তাকে তার মহব্বত ও মেহেরবানি হতে বঞ্চিত করেন

না। বান্দা নাফরমানী, শত পাপ করার পরও যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাকে তাঁর দরবার থেকে ফিরিয়ে দেন না। আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম, নূহ, ইবরাহীম এবং মহানবি ﷺ এর সময় যেমন দয়ালু ছিলেন আজও তেমনি দয়ালু আছেন। পরিবর্তন হয়েছে শুধু বান্দার।

বিনা প্রতিদানে প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আল্লাহ বান্দার খেদমতের প্রত্যাশী নন। তিনি সম্পদশালী ও প্রশংসনীয়। আসমান যমীনের যাবতীয় সম্পদের মালিক তিনি। তিনি ইচ্ছা করে যা হওয়ার হুকুম দেন তা অমনি অস্তিত্ব লাভ করে। তা সত্ত্বেও যদি বান্দা তার প্রতি সামান্য পরিমাণও মনোযোগী হয় তাহলে আল্লাহ তার প্রশংসা করেন এবং তাকে সম্মানিত করেন। এমনকি ফেরেশতাদের নিকটেও তাঁকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করেন।

অতঃপর আল্লাহই এমন সত্তা যিনি কারও চাওয়ার আশায় না থেকে সকলকে দান করেন। এমনকি যে প্রয়োজন সম্বন্ধে বান্দার কোন জ্ঞান নেই এবং হবেওনা– তাও তিনি দয়া করে দান করেন।

এই গুণাবলি যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে পোষণ করবে সে যেন খোদায়ী গুণাবলি তার মধ্যে পোষণ করল। এই গুণাবলির মধ্যে কোন গুণ বা তার ছায়া এমন লোকের মাঝে থাকতে পারে না যে ঈমানের দিক হতে দুর্বল। এই সমস্ত গুণাবলি যার মাঝে আছে সেই প্রকৃত পৌরুষের অধিকারী যে নিজের সবচেয়ে প্রবল ও চিরশত্রু শয়তানকে কুপোকাত করতে সমর্থ।

হজরত ইবরাহীম (আ) এর মধ্যে এই তিনটি গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি যখন আল্লাহর বন্দেগি করার জন্য প্রতিশ্রুত হলেন তখন তিনি তার ওয়াদা পালনে নিজের প্রতি বিষয়ে বাজী লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি তার প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন– যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বিষয়ে যাচাই করলেন তখন তাঁতে তাকে সুদৃঢ় পেলেন।

যখন কোন লোক তাঁর নিকট আসত তখন তার প্রয়োজন ছাড়া যা কিছু থাকত সম্মুখে এনে উপস্থিত করতেন।

বিনা প্রতিদানে তাঁর স্তর এমন উন্নতমানের ছিল যে যখন তার ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত লুত (আ) এর সম্প্রদায় ভালো করাতো দূরের কথা হজরত লুত (আ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং সে সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়ার জন্য ফেরেশতা আগমন করলেন– তখন তো হজরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলেন। শাস্তি না দেওয়ার জন্য বারবার আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাল। তখন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন– এই ঝগড়া বিবাদ রাখ! এই সম্বন্ধে তোমার প্রভুর নির্দেশ হয়ে গেছে।

হজরত হাতেম আসাম (র)

তিনি খোরাসানের প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হজরত শফীক (র) এর শিষ্য খাযরাবিয়ার উস্তাদ ছিলেন। জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তরিকত-বিরোধী একটি কাজও করেন নি। তাঁর আপাদমস্তক আন্তরিকতা ও বন্দেগিতে সজ্জিত ছিল। হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (রা) তার ব্যাপারে বলতেন: "হাতেম আমাদের সময়কার সিদ্দীক।"

নফস, বিপদ ও স্বভাবের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে তিনি বলতেন: কামনা (যার উপর জয়ী হওয়া খুবই কঠিন) তিন প্রকার। আহারের কামনা, কথা বলার ইচ্ছা এবং দৃষ্টির লোলুপতা। আহার্য বিষয়ের কামনার ওষুধ আল্লাহর প্রভুত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কথা বলার বাসনার প্রতিষেধক হক কথা বলার অভ্যাস করা। দৃষ্টিপাতের লোলুপতার নিরাময়ক অন্যায় কোন কিছু হতে দৃষ্টিকে সতর্কতার সাথে ফিরে রাখা।

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ প্রতিপালক তিনিই শুধু জীবিকাদাতা সে শুধু পানাহার হতেই নয় বরং সর্বপ্রকার অবৈধ কাজ করা হতেও বিরত থাকতে পারে। আর যে সত্য বলার অভ্যাস করে তার অধিক কথা বলে পাপ করার প্রবণতা থাকে না। যে ব্যক্তি অবৈধ কিছু দেখা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এবং যা কিছু দেখে তা থেকে যদি উপদেশ গ্রহণ করে তবে সে দৃষ্টিপাতের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।

হজরত মুহম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (র)

তিনি হজরত মালেকের শিষ্য ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন। তিনি যতদিন মদিনায় ছিলেন ইমাম মালেকের শিষ্য ছিলেন। ইরাক আসার পর মুহম্মদ ইবনে হাসানের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি যাবতীয় এলমের ইমাম, প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ওলি ছিলেন।

তিনি বলতেন– যখন তুমি কোন আলেমকে দেখ যে ধর্মীয় ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যাখ্যার ধান্ধায় রয়েছে তখন মনে করবে তার দ্বারা কিছুই হবে না। আলেম সম্প্রদায় লোকের পথ প্রদর্শক। তার কর্তব্য ধর্মের কঠিন পথ অনুসরণ করা। যার নিকট এই সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারে এটা কোন অবস্থায়ই তার জন্য জায়েয নয়।

ধর্মীয় ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন করা সাধারণ লোকের কাজ, বিশেষ লোক বা পদপ্রদর্শকদের কাজ নয়। আলেম এবং পথপ্রদর্শকগণ যদি জনসাধারণের পর্যায় নেমে আসে তাহলে জনসাধারণ কোথায় যাবে? এমন আলেম দ্বারা কী আশা করা যেতে পারে?

মূলত আল্লাহর কাজে সুযোগ-সুবিধা তালাশ করার অর্থ আল্লাহর কাজকে গুরুত্বহীন মনে করে নিজের কাজকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। প্রকৃত আলেম আল্লাহর বন্ধুত্বের দাবি করেন। বন্ধু কখনও বন্ধুর কাজকে ছোট হিসেবে দেখে না। বন্ধু তো ঐ ব্যক্তি যে বন্ধুর নির্দেশে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। বন্ধুর নির্দেশকে টালবাহানা করে সরিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না।

একজন বুযুর্গ বলেন: আমি একদিন মহানবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার এই পবিত্র বাণী শুনেছি যে, "এই পৃথিবীতে সদা-সর্বদা আল্লাহর আওতাদ, ওলি এবং নেককারগণ বিদ্যমান থাকেন।"

মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন: যে একথা বর্ণনা করেছে সে সত্যই বর্ণনা করেছে।

আমি আরজ করলাম: এই বর্ণনাকারীদের একজনকে দেখার আমার প্রবল ইচ্ছা।

এরশাদ করলেন: মুহম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ীকে দেখ!

আহার করে চলে যায়। কিন্তু দুনিয়াপূজারী ব্যক্তি সম্পদ আঁকড়িয়ে বসে থাকে। কোন মতেই তা ছাড়তে রাযি হয় না।"

তিনি আরও বলতেন সবার চেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বড় দলিল স্বয়ং আল্লাহ! স্বীয় উদ্দেশ্য (প্রমাণিত) পাওয়ার পর দলিল এবং তর্কে লিপ্ত থাকার অর্থ কী? তারপর তো মূল কাজ হলো– তার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করার জন্য সর্বান্তঃকরণে তৈরি থাকা এবং বিনা প্রতিবাদে আল্লাহর অনুগত থাকা এবং সর্বাবস্থায় তার হুজুক পালনের জন্য কোমর বেঁধে তৈরি থাকা।

হজরত আহমদ ইবনে খাযরাবিয়া (র)

তিনি ছিলেন খোরাসানের সূর্য, সম্প্রদায়ের ইমাম, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলি এবং সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। ফৌজী পোশাক পরতেন এবং নিন্দাবাদের পথ অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন খোরাসানের শাসনকর্তা কন্যা এবং তরিকতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। ফাতেমা যখন তওবা করে আল্লাহর পথে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন তখন তিনি কারও মাধ্যমে আহমদকে খবর দিলেন– আপনি আমার পিতার কাছে আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু তিনি সেদিক তেমন কোন খেয়ালই করলেন না।

আবার ফাতেমা সংবাদ পাঠালেন– হে আহমদ! আমি তোমাকে একজন আল্লাহভীতু ও আল্লাহর পথের সৈনিক ভেবেছিলাম যে তুমি কোন মহিলার পথ প্রদর্শক হবে। এখন মনে হয় তুমি কোন ডাকাত।

এরপর তিনি খোরাসানের প্রশাসকের নিকট লোক মারফত তার মেয়ে ফাতেমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠান। গভর্নর এটাকে তার সৌভাগ্যের কারণ জ্ঞান করে তার সাথে মেয়ের বিবাহ দিলেন।

হজরত আহমদ (র) সম্বন্ধে হজরত আবু হাফস হাদ্দাদ বলতেন– আহমদ জন্মগ্রহণ না করলে পৌরুষত্বের প্রকাশ পেত না। সে যুগের মানুষ জানতই না যে পৌরুষ কাকে বলে?

হজরত আহমদ ইবনে খাযরাবিয়া হজরত আবু ইয়াযীদ বোস্তামি (র) এর কাছে যাওয়া-আসা করতেন। তার স্ত্রী ফাতেমাও তার সাথে যেতেন এবং সবসময় তার সাথে বেআদবি করতেন। এমনকি যখন প্রথমবার তার কাছে যান তখন তিনি তার মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলেন। এতে হজরত আহমদ খুবই রাগান্বিত হন। কিন্তু যখন ফাতেমা তার রহস্য খুলে বলেন তখন তিনি শান্ত হন।

হজরত আবু ইয়াযিদ ফাতেমার গলার স্বর শুনা ছাড়া তিনি তার দিকে কখনও লক্ষ করে দেখেন নি। এমনকি একবার তাঁর হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখলেন ফাতেমার হাতে মেহদীর রং। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– ফাতেমা ! হাতে কেন মেহদী লাগিয়েছ?

তিনি বললেন, হে আবু ইয়াযিদ! তোমার চোখ যতদিন আমার হাতের মেহদীর প্রতি পতিত হয় নি ততদিন তোমার সাথে অপ্রিয় কথা বলায় আমার খুব আনন্দ হয়েছে। কিন্তু যখনই তোমার দৃষ্টি আমার হাতের মেহদীর প্রতি পতিত হয়েছে তখন থেকেই তোমার এখানে আসা আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।

এরপর তিনি সেখান থেকে চিরদিনের জন্য বের হয়ে আসেন। এমনকি সেখানকার পালা উঠিয়ে নিশাপুর চলে যান। হজরত আহমদ ফাতেমা সম্পর্কে বলতেন, কেউ যদি মহিলার বেশে আল্লাহ প্রেমিক কোন পুরুষকে দেখতে চায় তবে সে যেন ফাতেমাকে দেখে।

হজরত ইয়াহইয়া রাযি বলখ যাওয়ার পথে যখন নিশাপুর যান তখন হজরত আহমদ তাকে দাওয়াত করার ইচ্ছা করে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বাজার হতে কী কী আনতে হবে?

ফাতেমা বললেন: এতটা গরু, এতটা খাশি ও এতটা দুম্বা। তার সাথে কয়েকটি গাধাও আনতে হবে।

তিনি বললেন: এদের সাথে গাধার সম্পর্ক কী? ফাতেমা জবাব দিলেন, যখন কোন দানশীলদের বাড়ি কোন দানশীল আগমন করেন তখন মহল্লার অনেক কুকুরও আসে। এগুলোকে কি অনাহারে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে?

হজরত ইয়াহ্ইয়া মাআয রাযি (র)

তিনি একজন উঁচু স্তরের ওলি ছিলেন। তিনি তখনকার তরিকতপন্থীদের সৌন্দর্য ছিলেন। হজরত হাজরামী তার সম্বন্ধে বলেছেন– আল্লাহ তায়ালার দু'জন ইয়াহইয়া। একজন নবি হজরত ইয়াহইয়া (আ)। অপরজন ওলি ইয়াহইয়া রাযি। হজরত ইয়াহইয়া (আ) আল্লাহর ভয়ে এত কাঁদতেন যে, পরকালে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী তার ক্রন্দন দেখে নিরাশ হয়ে যেতেন।

অপরদিকে হজরত ইয়াহইয়া রাযি এতটা আশান্বিত ছিলেন যে তার অবস্থা দেখে অনেকেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার আশা পোষণ করতেন। লোকে হজরত হাজরামীর কাছে হজরত রাযি (রা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন– হজরত রাযি (র) কখনও কোন অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে অলস থাকতেন না। তিনি কখনও কোন ধরনের কবীরা গুনাহ করেন নি। তিনি সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি এতটা নির্ভরশীল ছিলেন যে– লোকে তা দেখে কিংবা শুনে অবাক হয়ে যেত।

একবার তাঁর এক মুরিদ তাঁকে বললেন– পীর ও মুর্শিদ। আপনি তো সবসময় আল্লাহর মেহেরবানিতে দৃঢ়ভাবে আশান্বিত। কিন্তু আপনি যে আল্লাহকে অনেক ভয় করেন।

তিনি জবাব দিলেন, বৎস! ইবাদত পরিত্যাগ করা পাপ ও গোমরাহী। ভয়, আশা ও দৃঢ়তা ঈমানের চিহ্ন। ঈমানের আরকানে আমলকারীর জন্য কারও ধোঁকায় পড়া অসম্ভব। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে লোকে ইবাদত করে এবং তার রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশা করে। যথাযথভাবে ইবাদত না করা পর্যন্ত কারও ভয় ও আশা সঠিকভাবে হয় না। আর যেখানে ইবাদত করা দরকার সেখানে শুধু মুখের জমা খরচে কাজ হয় না।

তাঁর নিয়ম ছিল সম্পদের উপর দরিদ্রতাকে স্থান দেওয়া। ফলে তিনি মুক্তহস্তে খরচ করতেন। রে অবস্থানকালে তিনি অনেক ঋণী হয়ে পড়েন। তখন তিনি খোরাসান যাওয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি বলখ পৌছলে সেখানাকার লোক তাকে সেখানেই রেখে দেয়। সেখানে তিনি ওয়াজ নসীহত করেন। মানুষেরা তাকে এক লাখ দেরহাম দান করে।

এরপর তিনি রে-ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। পথিমধ্যে ডাকাত তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়। তিনি খালি হাতে নিশাপুর পৌছেন এবং এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর কথায় লোকের অন্তর মোমের মতো বিগলিত হয়ে যেত।

আমি আলী হাজবিরী বলছি যে– দুনিয়া লিপ্ত থাকার এবং পরকাল ভয়ের স্থান। মানুষ এই দু'য়ের মধ্যে অবস্থানকারী। যেখানে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত কিংবা সীমাহীন আজাব তার যে কোন স্থানে তার অবস্থান হবে।

আবু হাফস হজরত ওমর ইবনে সালেম নিশাপুরি (র)

তিনি আহমদ খাযরাবিয়ার বন্ধু ও খোরাসানের শায়খুল মাশায়েখ ছিলেন। তার তওবা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক দাসীর প্রতি প্রেমাসক্ত ছিলেন। বহু চেষ্টা করার পরও তিনি তার মন জয় করতে সক্ষম হলেন না। কেউ তাকে বলল, নিশাপুরে শারস্তান এলাকায় এক ইহুদি আছে। সে যাদু মন্ত্র তুকতাক দ্বারা তোমার এই কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তিনি সেই ইহুদির কাছে গিয়ে তার সব ঘটনা ব্যক্ত করলেন।

ইহুদী বলল: হাঁ! তোমার কাজ হতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে– চল্লিশ দিন পর্যন্ত তুমি রোযা নামায করতে পারবে না এবং ভুলেও আল্লাহর নাম মুখে আনতে পারবে না। এই সময়ের মাঝে তুমি কোন প্রকার পুণ্যের কাজও করতে পারবে না এবং এই ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারবে না।

এভাবে আমার কথামত চল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর আমার কাছে আসবে। আমি ব্যবস্থা করব। আশা করি তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে।

তিনি ইহুদির কথামত চল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর তার কাছে এলেন। ইহুদি যাদুমন্ত্র যা কিছু করার করল। কিন্তু কোন কাজ হলো না।

ইহুদি বলল: নিশ্চয়ই তুমি এই সময়ের মধ্যে কোন পুণ্যের কাজ করেছ যার কারণ আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি বললেন: আমি কোন পুণ্যের কাজই করি নি। তবে হাঁ; একদিন পথ চলাকালীন পথে এক টুকরা পাথর দেখে মনে করলাম, এটা দ্বারা মানুষ অসতর্ক মুহূর্তে কষ্ট পেতে পারে। ফলে আমি পাথরখণ্ড দূরে ফেলে দিই।

ইহুদি বলল: তুমি যে আল্লাহর হক আদায় না করে তাকে কষ্ট দিয়েছ তার অবাধ্য আর হয়ো না। অথচ তিনি তোমার একটি পুণ্যের কাজকেও নষ্ট হতে দেন নি।

হজরত ইবনে সালেম ইহুদির কথায় লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তওবা করলেন। ইহুদিও তার সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি মাওরাদ যান এবং সেখানে হজরত আবু আবদুল্লাহ মাওরাদির কাছে বায়আত গ্রহণ করেন।

তওবা করার পর তিনি লৌহকারের কাজ শুরু করেন। একদিন এক অন্ধ বাজারের পথে যাওয়ার সময় কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে যাচ্ছিল। তিনি কুরআনের আয়াত শুনে তার ওজদ এসে যায়। এই আত্মহারা অবস্থায় তিনি খালি হাতে আগুন থেকে গরম লোহা উঠিয়ে আনেন। এরপর থেকে তিনি লৌহকারের কাজ ছেড়ে দেন এবং কোনদিনই আর দোকানে যান নি।

একবার তিনি বাগদাদের বুযুর্গদের সাথে দেখা করার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি আরবি জানতেন না। তাই তথাকার বুযুর্গগণ সিদ্ধান্ত করলেন, কোন দোভাষীর সাহায্যে তার কথা বুঝার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সময়মতো দেখা গেল; তিনি অনর্গল বিশুদ্ধ আরবিতে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করছেন।

এক বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন– হজরত! পৌরুষ কাকে বলে?

তিনি বললেন– আমার মতে আপনাদের মধ্য থেকে কেউ প্রথমে এই বিষয়ে আলোকপাত করুন।

হজরত জোনায়েদ (র) বললেন– আত্মদর্শন বর্জন করাই পৌরুষ।

হজরত ইবনে সালেম বললেন– শায়খ সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তবে আমার মতে– তুমি সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হবে। তবে তোমার প্রতি কেউ ন্যায়পরায়ণ হোক এই আশা কখনও করবে না।

হজরত জোনায়েদ (র) তার কথা শুনে চমকে উঠলেন এবং বললেন– ভাইসব! তোমরা আবু হাফসের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। তিনি সবার উপরই বাজিমাত করেছেন।

হজরত ইবনে সালেম বলতেন– মানুষ যখন কোন প্রকার সাময়িক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কোন মন্দ কাজ বর্জন করে এবং ঐ প্রতিক্রিয়া যদি অন্তরে স্থায়ী না হয় তাহলে লোক বারবার সেই কাজ করে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যদি স্থায়ী হয় তাহলে সে আর ঐ কাজ কোনদিন করে না। মানুষ যদি তার স্বভাবের পরিবর্তন না করে এবং সঠিক কাজ না করে তবে তার সর্বদা সন্দেহ থাকবে যে হয়ত সে তার পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যাবে।

হজরত আবু সালেহ হামদূন (র)

তাঁর পিতার নাম ইমরাতুল কাচ্ছার। তিনি একজন প্রখ্যাত দরবেশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফেকাহবিদ ছিলেন। শরীয়তে ছাওরী মাজহাযের অনুসারী এবং তরিকতে আবু তুরাব বখশির শিষ্য ছিলেন। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের যশে নিশাপুরের সকল ইমাম ও আলেমগণ একদিন তার নিকট এসে বললেন– হজরত। আপনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিছু নসিহত করুন যেন আমরা সকলে উপকৃত হই।

তিনি বললেন– আমি এখনও ওয়াজ করার উপযুক্ত হই নি।

তারা বললেন– কেন?

তিনি বললেন– এখনও আমার হৃদয় পার্থিব মান সম্মানের আকাঙ্ক্ষী। কাজেই আমার কথায় কেউই উপকৃত হবে না। যেই কথায় অন্তরে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে সেই কথায় এলমের হীনতা প্রকাশ পায়। অতএব এলমকে অপদস্থ করা খুবই অন্যায়।

তারা বললেন– আলেমদের কর্তব্য লোককে ওয়াজ নসীহত করা।

তিনি বললেন– ওয়াজ করা তাঁর জন্যই ওয়াজিব যার চুপ করে থাকায় ধর্মের ক্ষতি হয় এবং ওয়াজ করলে কোন ক্ষতি হয় না।

কথা প্রসঙ্গে কেউ জিজ্ঞেস করলেন– প্রাচীন বুযুর্গদের নসিহত শুনে লোকে উপকৃত হতো, আর এখানকার বুযুর্গদের কথা তেমন প্রতিক্রিয়াশীল হয় না এর কারণ কী? —

তিনি জবাব দিলেন– পূর্ববর্তী বুযুর্গদের উপদেশ এজন্য কার্যকরী হতো যে, তাদের নসিহত ইসলামের সম্মানে লোকদের মুক্তির পথ প্রদর্শনের এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে হতো। আর আমাদের উপদেশদানের পেছনে থাকে নিজেদের গৌরব প্রকাশ করা এবং সাধারণের কাছ থেকে সম্মান ও সম্পদ কুড়ানো ! কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যেই উপদেশ দেয় তার কথা মানুষের মনে প্রতিক্রিয়াশীল হয় মহানুভবতা প্রকাশ পায়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করার লক্ষ্যে কথা বলে তার কথায় হীনতা প্রকাশ পায়। কোন লোকই তার কথায় উপকৃত হয় না। অতএব এমন কথা বলার চেয়ে না বলাই ভালো।

হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র)

তিনি শরীয়তে ইমামদের ইমাম আর তরিকতের পীরদের পীর ছিলেন। সর্ব সম্মতিক্রমে তিনি তরিকতের ইমাম ছিলেন। তাঁর ইমাম এবং পীর হওয়ায় কারও কোন ধরনের মতবিরোধ ছিল না। তিনি হজরত সুফইয়ান সাওরীর শাগরিদ এবং হজরত সাররী সাকতীর ভাগ্নে এবং মুরিদ ছিলেন।

তিনি সর্ববিষয়ে প্রখ্যাত আলেম ও মুফতি ছিলেন। তার পীর হজরত সাররী সাকতীর নিকট কেউ প্রশ্ন করলেন, পীরের চেয়ে মুরিদ কি বড় হতে পারে?

তিনি বললেন: হাঁ! পারে! যেমন জোনায়েদ আমার অপেক্ষা বড়।

এতদসত্ত্বেও হজরত সাররী সাকতীর জীবদ্দশায় হজরত জোনায়েদের কিছু সংখ্যক মুরিদ তাঁকে নসিহত করতে অনুরোধ করেন।

তিনি অস্বীকার করে বললেন যতদিন আমার পীর ও মুরশিদ জীবিত আছেন ততদিন আমি ওয়াজ করতে পারি না। সেই রাতেই হজরত জোনায়েদ (র) স্বপ্নে দেখলেন; মহানবি ﷺ তাকে এরশাদ করলেন: হে জোনায়েদ ! তুমি আল্লাহর বান্দাকে ওয়াজ করে শুনাও। তোমার ওয়াজকে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের নাজাতের উপায় নির্ধারণ করেছেন।

তিনি জাগ্রত হয়ে চিন্তা করলেন– বোধহয় আমার মর্যাদা হজরত সাররী সাকতী (র) অপেক্ষা উর্ধ্বে। তাই মহানবি ﷺ আমাকে ওয়াজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাতঃকালে হজরত সাররী সাকতী লোক মারফত খবর পাঠালেন না তুমি তোমার মুরিদদের অনুরোধে ওয়াজ করলে আর না বাগদাদের বুযুর্গদের কথায় আর না আমার কথায় করলে। এখন মহানবি ﷺ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অবশ্য মেনে নেবে।

হজরত জোনায়েদ বলেন– আমার মনে যে গর্বের সঞ্চার হয়েছিল– এই খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা বিলীন হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম– তাঁর মর্যাদা আমার মর্যাদার চেয়ে বহু উর্ধ্বে। তিনি আমার প্রতিটি অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত। কিন্তু আমি তার সংবাদ কিছুই রাখি না।

আমি তাঁর দরবারে গিয়ে তওবা করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম আপনি এই সংবাদ কীভাবে জানতে পারলেন যে মহানবি ﷺ আমাকে স্বপ্নে ওয়াজ করার আদেশ করেছেন।

তিনি বললেন: স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালা আমাকে বললেন, আমি জোনায়েদকে ওয়াজ করার নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার রাসূলকে প্রেরণ করেছি। তার ওয়াজ শুনে বাগদাদবাসী যেন তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হয়।

হজরত জোনায়েদের বাণী খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। তিনি বলেছেন নবিদের বাণী আল্লাহর দরবার হতে সঠিক এবং নির্ভুল সংবাদ। আর ওলিদের বাণী তার দরবারের ইঙ্গিত। অর্থাৎ নবিদের কথায় কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তির

অবকাশ নেই। অপরদিকে ওলিদের কথায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, আল্লাহর দরবারের ইশারা ইঙ্গিত বুঝতে তাদের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। তাই নবি ও ওলির মধ্যে বহু পার্থক্য। যেখান হতে নবুয়তের আরম্ভ সেখানে বেলায়েতের শেষ সীমা।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন– একবার শয়তানকে দেখার আমার ইচ্ছা জাগল। এরপর একদিন আমি মসজিদের দ্বারে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধ আমার দিকে আসছে। তাকে দেখামাত্র আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হলো। কিছুতেই যেন ঘৃণায় আমি তার প্রতি চাইতে পারছিলাম না।

বৃদ্ধ আমার কাছে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম– তুমি কে?

সে বলল– আপনি যাকে দেখার বাসনা করেছেন আমি বললাম– অ! মালউন! এমন কী ছিল যা তোকে হজরত আদম (আ) কে সেজদা করতে নিষেধ করেছিল? মালউন বলল– জোনায়েদ! এ তুমি কেমন প্রশ্ন করলে। তুমি বল; আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করতে পারি?

এমন সময় আমার পেছন থেকে কে যেন বলল– তুমি শয়তানকে বল– তুই মিথ্যাবাদী। তুই যদি আল্লাহর বাধ্য বান্দা হতি তাহলে কেন তাঁর নির্দেশের অবমাননা করলি?

শয়তান আমার মধ্য হতে এই কথার আওয়ায শুনে চিৎকার দিয়ে বলল: হে জোনায়েদ! তুমি আমাকে জ্বালিয়ে ফেলেছ। একথা বলে শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতে মনে হয় আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের রক্ষক; বিপদে তিনি তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করেন।

হজরত আহমদ খোরাসানি নূরী (র)

তিনি শরীয়তের ইমাম, তরিকতের শায়খ ও তাসাউফের সম্রাট ছিলেন। তার নামানুসারেই সুফিদের একটি সম্প্রদায়ের নাম নূরী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অলসতা পরিহার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কৃচ্ছ্র সাধনা।

একবার তিনি তাঁর ঘরে অজদে এসে একাদিক্রমে তিন দিন তিন রাত দাঁড়িয়ে দুলতে থাকেন। অবশেষে মুরিদগণ হজরত জোনায়েদ (র) এর কাছে তাঁর এই অবস্থার কথা বলেন। হজরত জোনায়েদ (র) তাঁর কাছে এসে বললেন: হে নূরী! তুমি যদি মনে কর তোমার এই কাজে কোন উপকার সাধিত হবে তাহলে আমাকে নির্দেশ দাও আমি এটা করি। আর যদি মনে কর তোমার এই কাজে তুমি উপকৃত হবে না তাহলে এটা হতে তুমি বিরত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর।

একথা শুনে হজরত নূরী বিরত হয়ে বললেন: হে আবুল কাসেম! তুমি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

একবার হজরত নূরী গিয়ে দেখতে পান হজরত জোনায়েদ বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট। তখন তিনি বললেন– হে আবুল কাসেম! তুমি কর্তৃপক্ষের কাছে সত্যকে গোপন করে রেখেছ। তাই তারা তোমাকে এই আসনে বসিয়েছে। আর আমি তাদের নসীহত করায় তারা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁরা উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় লৌকিকতাবিহীন কথাবার্তা হতো।

হজরত নূরী বলতেন: অপরের সাথে সম্পর্কহীনতাই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। আর আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতাই অন্যের সাথে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করা। ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অন্যের সাথে বিচ্ছেদ হতে হবে এবং অপরের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলে আল্লাহ হতে সরে আসতে হবে। একটি অন্যটির বিপরীত। নিয়ম হচ্ছে পরস্পরবিরোধী বিষয়বস্তু একত্র হতে পারে না।

তিনি বলতেন: আমাদের এই যুগে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করেন। দ্বিতীয় যে আরেফ যথার্থভাবে কথা বলেন।

তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি সব কিছুকে আল্লাহরই ভেবে থাকে সে অবশ্য আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়। কারণ, যা কিছু সে দেখে তাতে তাঁর মালিকের প্রতি খেয়াল হয়। যে মনে করে সকল কিছুতেই আল্লাহর মালিকানা সে কখনও আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী থাকতে পারে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে খফীফ (র)

তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, আল্লাহভীতু এবং সর্বজনমান্য দরবেশ ছিলেন।

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি জীবতাবস্থায় জীবিতদের মাঝে পরিগণিত হতে ইচ্ছুক তার কর্তব্য অন্তর থেকে লোভ-লালসা দূর করে দেওয়া। কারণ যে হৃদয়ে লোভ-লালসার বীজ থাকে সে হৃদয় মৃত এবং মঙ্গলশূন্য। সে অন্তরে সীল মারা হয়। মৃত অন্তর হেদায়াত গ্রহণের অযোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَاتُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ ـ

(হে নবি!) আপনি মৃতকে শুনাতে পারেন না; আর না বধিরকে আপনার কথা শুনাতে পারেন।

আরও এরশাদ করেন–

مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

যে ব্যক্তি লোভ ও অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে নিরাপদ এমন লোকই মুক্তিপ্রাপ্ত।

লোভের অর্থ হচ্ছে, মানুষের নিকট কোন কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্য এমনভাবে লিপ্ত থাকা যেন সেজন্য আল্লাহর নিকট চাওয়া পাওয়ার আশা

পরিত্যাগ করা। যে হৃদয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে মৃতবৎ থাকে এবং আল্লাহর জন্যই জীবিত থাকে তা কতইনা উত্তম হৃদয়।

হজরত খফীফ (র) বলতেন: আল্লাহ তায়ালা অন্তরকে জিকরের স্থান করেছেন বটে তবে তা কামনার স্থানে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর ভয়ে ভয়ান্বিত কিংবা আল্লাহর প্রেমে পাগল অন্তরই এই কামনা বাসনাকে অন্তর হতে দূর করে দিতে পারে। আল্লাহর জিকরে অন্তর শক্তি পায়।

যে হৃদয় লোভ-লালসার আবাসে পরিণত হয় যে হৃদয় হতে আল্লাহই নয় বরং সব কিছুই দূরে সরে যায়। বুযুর্গগণ বলেছেন: লোভী ব্যক্তিকে ভয় করে সবাই তার নিকট থেকে দূরে চলে যায়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ফজল বলখি (র)

তিনি একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং খোরাসান ও ইরাক অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। তিনি খাযরাবিয়া (র)-এর মুরিদ ছিলেন। বিরোধী দল তাকে বলখ থেকে বের করে দিলে তিনি সমরকন্দ পৌঁছেন এবং সেখানেই শেষ পর্যন্ত বসবাস করেন।

তিনি বলতেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তার রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন তিনিই প্রকৃত আরেফ। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর যতটা নৈকট্যধারী হয়, সে আল্লাহর আদেশ পালনে ততটাই পাকাপোক্ত হয় এবং ততটাই সে আল্লাহর রাসূলের সুন্নত পালনে দৃঢ়চিত্ত হয়। আর যে যতটা আল্লাহ থেকে দূরে থাকে সে ততটা পরিমাণই ফরজ ও সুন্নত আদায়ে অলস থাকে।

তিনি আরও বলতেন: আমি আশ্চর্য হই যে ব্যক্তি পথঘাটের এবং সফরের বহু কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর ঘর হরমে এজন্য উপস্থিত হয় যে সেখানে নবিদের অনেক লীলা দেখতে পাবে। কিন্তু আল্লাহর লীলা-খেলা দেখার উদ্দেশ্যে নফসের কাম-বাসনার প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য তেমন কষ্ট কেউ করে না।

অর্থাৎ হজ্জ করতে যাওয়ার পূর্বে অবশ্য লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা হতে হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে, আল্লাহ ব্যতীত অপরের ভালবাসা বা মুখাপেক্ষী হওয়া হতে অন্তরকে খালি করতে হবে। টাকা আছে, লোকে হজ্জ করে সুতরাং আমি কেন হজ্জ করব না এই নিয়তেই অনেকে হজ্জ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় অল্প সংখ্যক লোকই হজ্জ করে। তাই তিনি বলতেন– হজ্জ অবশ্য করতে হবে তবে তার পূর্বে আত্ম সংশোধন হতে হবে।

অতএব অন্তর হতে লোভ-লালসা এবং আত্মপ্রচারের মনোবৃত্তি দূর করেই হজ্জ করতে গেলে আল্লাহ তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

হজরত মুহম্মদ ইবনে ওমর দাররাক (র)

তিনি একজন প্রখ্যাত দরবেশ এবং কৃচ্ছ্র সাধক ছিলেন। তিনি মুহম্মদ আলী তিরমিযি (র) এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। শিষ্টতা এবং পরস্পরের সাথে পরস্পরের মিলন ও লেনদেন সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তৎকালীন বুযুর্গগণ তাকে ওলিদের শিষ্টতার শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করতেন।

তিনি বলতেন: মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত– আলেম, নেতা ও ফকির (দরবেশ)। আলেম বিগড়িয়ে গেলে ধর্ম ও শরীয়ত ধ্বংস হয়। নেতার পদস্খলন হলে জীবিকা নষ্ট হয়। আর ফকির বিগড়ে গেলে আল্লাহর সৃষ্টির চরিত্রের অধঃপতন ঘটে।

লোভ-লালসায় আলেম, অন্যায় উৎপীড়ন করলে নেতা এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভে ফকির বিগড়িয়ে থাকে। আলেমগণ যতক্ষণ রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্যে না যাবে ততক্ষণ তারা সঠিক থাকবে। রাজা-বাদশাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে না নিবে এবং ফকিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মান সম্মানের লোভী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ঠিক থাকবে।

কারণ, রাজা-বাদশাহদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের দরুনই তারা অন্যায় উৎপীড়ন করে থাকেন। লোভ-লালসা আলেমদের রাজদরবারে টেনে নিয়ে যায়। সেখানে তারা রাজা-বাদশাহদের অন্যায়কে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিজের এলম বিক্রি করে। ফকিরদের মানসম্মানের লোভ তাদের তাওয়াক্কুলকে নষ্ট করে দেয়।

মূলত অত্যাচারী শাসক, লোভী আলেম এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলহীন ফকির প্রায়ই শয়তান। এই প্রতিটি সম্প্রদায় বিগড়িয়ে গেলে আল্লাহর সৃষ্টিও বিগড়িয়ে যায়।

হজরত আবু হামযা খোরাসানি (র)

তিনি খোরাসানের প্রাচীন বুযুর্গদের মধ্যে একজন। তিনি আবু সাঈদ আহমদ ইবনে খাররাযের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার তাওয়াক্কুল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ছিল।

একবার তিনি এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার কালে একটি বিরান কুয়ার মধ্যে পতিত হন। তিন দিন পর খাররাযের একদল বনিক সেখানে উপনীত হলো। তিনি ভাবলেন তাকে উদ্ধার করার জন্য তাদের ডাকবেন।

কিন্তু সাথে সাথেই মনে করলেন– অপরের নিকট সাহায্য কামনা করা তো আল্লাহর প্রতি অভিযোগ আনয়ন করা হবে যে আল্লাহ আমাকে কুপে নিক্ষেপ করেছেন– তোমরা আমাকে সাহায্য কর। তিনি এই চিন্তা করে চুপ করে বসে থাকলেন।

এদিকে বণিকগণ নিজেরাই কুপের কাছে এসে বলাবলি করতে লাগল– রাস্তার উপর কুপ, কোন প্রকার ঢাকনা নেই। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে কোন লোক বা আল্লাহর সৃষ্টজীব কূপে পড়ে গিয়ে জীবন হারাতে পারে। আস আমরা তার মুখ ছাদ দিয়ে ঢেকে দিই– আল্লাহ আমাদের এর বিনিময় দিবেন।

বণিকদের কথা শুনে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন। বণিকগণ যখন কূপের ওপর ছাদ ঢেলে চলে গেল– তখন তিন আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন, বাঁচার আর কোন পথেই খোলা থাকল না। এখন আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবেই কোন পথ করে দিতে পারেন।

গভীর রাতে তিনি অনুভব করতে পারলেন ছাদ নড়াচড়া করছে। খেয়াল করে দেখলেন কূপের উপরিস্থ ছাদ সরে গেছে এবং বিরাট অজগরের ন্যায় কোন একটি জীব কূপের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার আল্লাহ আমার উদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছেন। ফলে আমি তার লেজ আকড়িয়ে ধরলাম এবং তা আমাকে কূপ হতে টেনে বাইরে নিয়ে আসল।

হজরত ইবরাহীম ইবনে খাওয়াস (র)

তিনি তাওয়াক্কুলে খুবই অবিচল ছিলেন। তিনি তার সমসাময়িক বহু বুযুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

তিনি বলতেন: আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়ের চিন্তা তোমার অন্তর থেকে বের করে দিয়েছেন তুমি তার চিন্তা করো না এবং যা তোমার জন্য ফরজ করেছেন– তা কখনও পরিত্যাগ না করা– এই দুটি বিষয়ের মধ্যেই যাবতীয় এলম সীমিত।

অর্থাৎ তোমার জীবিকা এবং তোমার ভালো-মন্দ যা কিছুই হোক না কেন– আল্লাহ তা অনাদিকালেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই ঐ সম্বন্ধে তোমার চিন্তা করার কোন কিছুই নেই। কারণ, তোমার চিন্তা-ভাবনায় তার কোন পরিবর্তন সাধনই করতে পারবে না।

তোমার চিন্তা করতে হবে আল্লাহ তোমার জন্য যা কিছু ফরজ বা ওয়াজিব করেছেন– তা পরিপূর্ণভাবে তুমি কীভাবে পালন করবে। কেননা এই ব্যাপারে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে। তোমাকে সর্বক্ষণ চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহর কোন নিদের্শই যেন তোমার দ্বারা অমান্য না করা হয়।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: তোমার নির্ধারিত জীবিকা তুমি না পাওয়া পর্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে। তাই জীবিকা অর্জনে কোন প্রকার অসৎ পথ অবলম্বন করবে না।

লোকে তাঁর জীবনের বিস্ময়কর ঘটনা বলার অনুরোধ করলে তিনি বললেন: আমি আল্লাহ কাছে সবসময় দোয়া করতাম: আল্লাহ আমাকে কোন সৎ বন্ধু মিলিয়ে দাও।

এরপর হজরত খিজির (আ) আমার কাছে আগমন করত আমার সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু আমি আল্লাহকে ভয় করলাম যে, না জানি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রতি আমার তাওয়াক্কুল হয়ে যায় কিনা? আল্লাহর ওপর আমার ভরসা কমে যায় কিনা এবং ফরয পরিত্যাগ করে নফলে লিপ্ত হয়ে পড়ি কিনা? ফলে আমি হজরত খিজির (আ) এর সাহচর্যে থাকা অপছন্দ করলাম।

এতে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে যেহেতু হজরত খিজির (আ) ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হতে বিরত থেকে নির্জনে আল্লাহর জিকর আজকারে লিপ্ত। এ কারণে হয়তো তাঁর সাথে থেকে আমিও তার পথ অবলম্বন করতে পারি।

অথচ আমাদের মতো বান্দার পক্ষে এটা জায়েয নয় যে তাবলীগ করা হতে বিরত থেকে বনে-জঙ্গলে গিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করি।

হজরত আবু হামযা বাযযায (র)

তিনি হজরত হারেস মুহাসেবীর মুরিদ এবং সাররী সাকতীর স্নেহ ছায়ায় লালিত-পালিত হন। হজরত নূরী ও খায়র নাশ্‌শাযের সমসাময়িক ছিলেন। হজরত নূরীর বিপদাপদের কালে তার সঙ্গে ছিলেন। তাফসীর ও কেরাতের খ্যাত আলেম ছিলেন। বাগদাদের মসজিদে রেসাকায় ওয়ায নসিহত করতেন।

তিনি বলতেন: তোমার দেহ যখন তোমার দ্বারা শান্তি পায় তখন জেনে নিবে তুমি তোমার দেহের হক আদায় করেছ? আবার যখন আল্লাহর সকল সৃষ্টি তোমার দ্বারা শান্তি পায় তখন মনে করবে তুমি তাদের হক আদায় করেছ।

অর্থাৎ মানুষের দায়িত্ব দ্বিবিধ হক আদায় করা। একটি নফসের হক অপরটি আল্লাহর সৃষ্টির হক। যখন মানুষ স্বীয় নফসকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রেখে ইহকালে ক্ষতি এবং পরকালে দোযখের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে তখন সে তার নফসের পূর্ণ হক আদায় করে থাকে। আবার যখন আল্লাহর সৃষ্টিকে স্বীয় খারাপ হতে নির্ভয় ও নিরাপদ রাখে তখন সে মানুষের হক আদায় করে।

হজরত সহল ইবনে তশতরি (র)

তিনি একজন প্রখ্যাত দরবেশ ও মুহাইমিয়া সুফি সম্প্রদায়ের ইমাম, রিয়াজত মুজাহাদা এবং অন্যায়কে মিটানোতে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। সকলেই তার প্রশংসা করত। তিনি খুবই সহজ-সরল কথা বলতেন।

ফলে কোন কোন জাহেরী আলেম বলতেন– তিনি শরীয়ত ও হাকিকতের সমন্বয় সাধন করেছেন।

কিন্তু হাকিকত ও শরীয়ত আলাদা কোন কিছু নয়। শরীয়ত ব্যতীত হাকিকত এবং হাকিকত ব্যতীত শরীয়তের কোন মূল্য নেই। একটি অন্যটির পরিপূরক। শরীয়ত ভিন্ন হাকিকত বিধর্মী এবং হাকিকত ছাড়া শরীয়ত কপটতা এবং রিয়া। কিন্তু সহল তশতরি এই কথাকেই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের বোধগম্য করে দিয়েছেন। ফলে লোকে বলত তিনি শরীয়ত ও হাকিকতের সমন্বয়কারী।

তিনি বলতেন– সূর্য উদিত হয় আবার অস্ত যায়। তার সাথে সাথে মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে অধিক হতে অধিক দূরে সরে যায়। কিন্তু এমন কিছু সংখ্যক ভাগ্যবানও আছেন যাঁরা নিজের পরিবার পরিজন ও অপরাপর সবকিছু হতে বহু উর্ধ্বে।

হজরত মুহম্মদ ইবনে আলী হাকীম তিরমিযি (র)

তিনি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ শায়খুল মাশায়েখ ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়েই তিনি দক্ষতা রাখতেন এবং ইমাম ছিলেন। তিনি তাসাউফ ছাড়াও শরীয়ত সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সনদ উচ্চ পর্যায়ের ছিল। আমি তার রচিত খতমুল বেলায়েত, নাওয়াদিরুল উসূল এবং কিতাবুন নাহাজ এবং অপরাপর গ্রন্থ পাঠ করেছি। প্রতিটি গ্রন্থই মূল্যবান।

তিনি কুরআনের তাফসীরও লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সময় দেয় নি। যতটুকু লিখেছিলেন ততটুকু খুব জনপ্রিয় ছিল। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র) এর এক ছাত্রের কাছে ফেকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি ইবাদতের গুণাবলি (শরীয়ত) সম্পর্কে অজ্ঞ সে আল্লাহর গুণাবলি (তরিকত) হতে আরও বেশি অজ্ঞ। যে ব্যক্তি নিজকে চিনে না, সেই ব্যক্তি আল্লাহকেও চিনতে সক্ষম হয় না। কারণ, জাহের বাতেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাহেরের সম্পর্ক বাতেন ব্যতীত অসম্ভব। বাহ্য আনুগত্য ছাড়া বাতেনের দাবি করা মিথ্যা। জেনে রাখ আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানের ভিত্তি বন্দেগির বিশুদ্ধতার প্রতি। আর এই শিষ্টতার বিশুদ্ধতা (শরীয়তের নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালন) ব্যতীত লাভ হতে পারে না।

তিনি তার উক্ত বাণীতে যেসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে:

ক. আল্লাহ ও তার গুণাবলির পরিচয় লাভের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বান্দার নিজের অবস্থা, স্থান এবং সীমারেখা অবগত হওয়া। যদি সে তা অবগত না থাকে তাহলে আল্লাহ এবং তার গুণাবলি সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং চরম অজ্ঞ। নিজের অবস্থা স্থান ও সীমারেখা আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা জানতে হবে। কাজেই তরিকতের প্রথম পদক্ষেপ হলো শরীয়তের জ্ঞানার্জন করা।

খ. যে ব্যক্তি নিজের নফসের পরিচয় জ্ঞান লাভ করার পন্থা অবগত নয় অথচ আল্লাহর মারেফত সম্পর্কে কথা বলে সে তো কোন কিছু না

জেনেই ডিং মারে। সর্বাগ্রে তোমাকে নিজের চতুঃসীমা জানতে হবে। এরপর তুমি আল্লাহর মারেফতের ফল পাবে। তা জানার পথ হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত অবগত হওয়া।

গ. বাহ্যত যা প্রকাশ পায় মূলত তা তার আভ্যন্তরীণ অবস্থারই প্রতিচ্ছায়া। ফলে বাহ্য দিক শরীয়ত দ্বারা সজ্জিত না থাকলে আভ্যন্তরীণ তরিকত ও মারেফাতের দাবি করা অনর্থক বৈ নয়। ভেতরে মারেফাত বাইরে আল্লাহর নাফরমানী এটা সম্ভবপর নয়।

ঘ. বাহ্য শরীয়ত পালন করা যতটা হবে অভ্যন্তরে আল্লাহর পরিচয় জানা বা মারেফাত ঠিক ততটা পরিমাণই হবে।

হজরত আবু সাঈদ আহমদ ইবনে খাররায (র)

তিনি খাররাযিয়াহ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হজরত বিশর হাফী ও সাররী সাকতী (র) হতে ফয়েজ অর্জন করেছিলেন। হজরত জুননূন মিসরি (র) এর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ফানা এবং বাকা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: আল্লাহ তায়ালা অন্তরকে এই গুণাবলির উপর সৃষ্টি করেছেন যে কেউ তাঁকে উপকার করে তার প্রতি সে অবশ্য মহব্বতের সাথে ঝুঁকে পড়ে।

উপর্যুক্ত বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে হজরত খাররায (র) বলতেন: আমি ঐ হৃদয় সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অনুগ্রহশীল মনে না করে। অতপর সে কীভাবে পরিপূর্ণভাবে তার প্রতি ঝুঁকে না পড়ে।

মূলত একটি বিস্ময়কর কথা যে মানুষই নয় বরং পশুপক্ষীও অনুগ্রহকারীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এমন খুব কম লোকই আছে যারা আল্লাহকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে না করে। তথাপি যারা আল্লাহর অনুগ্রহকে ভুলে যায় তারা পরকালে দোযখের আজাব ব্যতীত আর কিছুই পাবে না।

হজরত আহমদ ইবনে মাসরূক (র)

তিনি খোরাসানের প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তিনি ত্রিশজন বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। সকল অলিদের অভিমত তিনি একজন আওতাদ ছিলেন। শরীয়ত ও তরিকতে তিনি একজন সঠিক আলেম ছিলেন।

তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে আনন্দ পায় বা সুখ ভোগ করে সে জেনে রাখুক যে তার এই আনন্দ সর্বক্ষণ তাকে নিরানন্দ ও চিন্তায় নিপতিত করে। আর যে ব্যক্তির ভালবাসা তার প্রভুর দাসত্ব ছাড়া অন্য কিছুর সাথে হয় তাহলে সেও জেনে রাখুক যে সর্বক্ষণ সে হয়রানী ও পেরেশানীতে নিপতিত থাকবে।

কারণ, আল্লাহ ব্যতীত সে অন্য যার সাথেই সুখভোগ করে বা ভালবাসা রাখে তা সবই বিলীন হয়ে যাবে। ফলে সে আরও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে।

হজরত আবু আলী জুরজানি (র)

তিনি হজরত মুহম্মদ ইবনে আলী তিরমিযির মুরিদ ও হজরত আবু বকর ওয়াররাকের ও ইবরাহীম সমরকন্দীর পীর ও মুরশিদ ছিলেন। মানুষের ধর্ম এবং ধর্মে আন্তরিকতার মধ্যে যে বাধা হিসেবে দেখা দেয় তিনি তা তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারতেন।

তিনি বলতেন: সকল মানুষ শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে এবং মনে করে সে সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সে আরও মনে ভাবে সে যা বলে কাশফ দ্বারা বলে।

তিনি তাঁর এই বাণী দ্বারা জাহেল পীর, সুফি এবং তরিকতের দাবিধারীদের প্রতি ইশারা করেছেন। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই রাখে না এবং জানার কোন আগ্রহও নেই। মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলে ধারণা করে আমরা মূল বস্তুকেই পেয়েছি

এবং যা কিছু বলি তা আমরা কাশফের দ্বারাই বলি। অথচ আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুই হোক না কেন তা শরীয়ত দ্বারাই পরখ করা যেতে পারে। কিন্তু শরীয়ত সম্পর্কে তারা উদাসীন।

হজরত আবু মুহম্মদ হারীরি (র)

তিনি উসূল ও ফেকাহশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম ছিলেন। তাসাউফে তিনি এরূপ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে হজরত জোনায়েদ (র) এর মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তিনি বলতেন– ঈমানের স্থায়িত্ব, ধর্মের দৃঢ়তা ও শরীরের সুস্থতা তিনটি বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীল। প্রথম তুষ্টি, দ্বিতীয় পরহেযগারী আর তৃতীয় আল্লাহর প্রতি খেয়াল রাখা।

ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট থাকে তার নিয়ত এবং আল্লাহ সম্পর্কীয় কার্যাবলি ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তাতে তার আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান সঠিক হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষেধিত কর্ম হতে বিরত থাকে তার প্রতি কাজই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। আর যে ব্যক্তি পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করে তার হৃদয় রিয়াজাত মোজাহাদা করাকে সহজেই গ্রহণ করে। ফরে তুষ্টির পরিণতিই হলো আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান লাভের পথে যেসব বাধাবিপত্তি দেখা দেয় তা অপসারিত হয়ে যায়।

সচ্চরিত্র পানাহারের সতর্কতা অবলম্বন এবং ন্যায়পরায়ণতা পরহেযগারীর উপকরণ। মানুষের হৃদয়ে যা কিছু থাকে তা তার বাহ্য আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পাওয়া সম্বন্ধে মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রাতে অধিক নামায আদায় করে দিনে তার মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে।"

এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ –

কেয়ামতের দিবসে নূর তাদের সম্মুখ ভাগে এবং ডানদিকে দৌড়াতে থাকবে।

আরও বলেন: তাদের সমস্ত মুখমণ্ডল নূরে উদ্ভাসিত হবে আর তারা নূরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হবে।

এসব বিষয়বস্তু পাওয়ার পথ হজরত হারীরি খুবই প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুহম্মদ ইবনে মূসা ওয়াসেতি (রা)

তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলেম, ধর্মীয় নেতা ও দরবেশ ছিলেন। হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র) এর সাথি এবং সমস্ত দরবেশদের প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিলেন। কয়েকটি শহরে তিনি গমন করেন। কিন্তু মানুষেরা কোথাও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি।

অবশেষে তিনি মারদ চলে যান। সেখানকার লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তার ওয়াজ নসীহত দ্বারা উপকৃত হয়। অবশিষ্ট জীবন তিনি মারদেই অতিবাহিত করেন।

তিনি বলতেন: অধিকাংশ সময় জাকের তার জিকর করার কালে নিজের জিকরে অন্যান্য লোকের চেয়ে বেশি অলসতা করে।

অর্থাৎ অধিকাংশ সময় দেখা গেছে বহু মানুষ জিকর করে। কিন্তু জিকর করার সময় যেসব নিয়মকানুন পালন করতে হয় তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। এমনকি তার অন্তরও জিকরের প্রতি থাকে না। মনে অন্য চিন্তা থাকে। এমনকি যেসব বিষয় জিকরের জন্য ক্ষতিকর তা-ই সে করতে থাকে।

বান্দার পক্ষে এটা খুবই বিপজ্জনক। ব্যক্তি যদি আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম না করে এবং মুখে জিকর না করে তবে তা তেমন কোন ক্ষতিকর নয়। কারণ জিকর করার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

কিন্তু পরিতাপ ও ধ্বংসের কারণ তো এটাই যে মানুষ মুখে মুখে জিকর করে অথচ আল্লাহর প্রতি তার কোন খেয়ালই থাকে না।

হজরত আবু বকর শিবলী (র)

তিনি তরিকতপন্থীদের নেতা এবং স্বনামধন্য, সাধন প্রিয় ওলি ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি খলিফার দরবারীদের নেতা এবং হজরত জোনায়েদের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি খায়রুল নাসাজের নিকট তওবা করেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ –

হে নবিবর! আপনি মুমিনদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে হজরত শিবলী (র) বলেছেন– হে নবিবর! আপনি মুমিনদের আমার এই নির্দেশ পৌছিয়ে দিন যে তারা মুখমণ্ডলে শোভিত চক্ষুদ্বয় যেন অবনত রাখে এবং গায়র মাহরাম রমণীদের দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে। আর তাদের অন্তর্চক্ষু দ্বারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি না তাকায়। কারণ, অন্তর্চক্ষু দ্বারা মানুষ যখনই কারও প্রতি তাকায় তখনই মানুষ নাফরমানী করে।

তিনি বলেন: একবার আমি বাজারের পথে যাচ্ছিলাম। তখন একজন লোক চিৎকার কর উঠল– এই দেখ পাগল যাচ্ছে।

আমি বললাম: আমি তোমাদের কাছে পাগল আর তোমরা আমার কাছে সুস্থ। ভালো কথা। আল্লাহ আমার এই উন্মাদনাকে আরও বাড়িয়ে দিন এবং তোমাদের স্বাস্থ্য আরও ভালো করুন। আমি এই পাগলামী হতে মুক্তি পেতে চাই না বরং দোয়া করি তিনি যেন আমার এই পাগলামী আরও বৃদ্ধি করে দেন।

হজরত আবু মুহম্মদ খালেদী (র)

তিনি হজরত জোনায়েদের অন্যতম মুরিদ ও তাসাউফের সাগর ছিলেন। আত্মগর্ব পরিত্যাগ করায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ফলে তিনি তার নিজের মূল্যবান অভিমত অন্যের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। অথচ দেখা গেছে বহু মানুষ অন্যের কথা নিজের বলে চালাতে মোটেই দ্বিধান্বিত হয় না।

তিনি বলতেন: জীবিকার উপকরণ থাকা না থাকার সমতার নামই তাওয়াক্কুল। এই উপকরণ অধিক হলেও যেমন আনন্দ নেই কম হলেও কোন চিন্তা নেই। এমনকি থাকুক কিংবা না থাকুক এই চিন্তা না থাকার নামই তাওয়াক্কুল।

কেননা, তোমার এই দেহ আল্লাহর সম্পত্তি। তিনি তার ইচ্ছা মোতাবেক তার সাথে ব্যবহার করবেন। যা ইচ্ছা দিবেন আর যা ইচ্ছা করেন না তা দিবেন না। তোমার তাতে অনধিকার চর্চা করার কিছুই নেই। এই সম্পত্তিকে তার মালিকের হাতে অর্পণ করে তোমার নিজের কর্মে আত্মনিয়োগ কর।

তিনি বলেন: একবার আমি হজরত জোনায়েদের নিকট গিয়ে দেখি তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে খুবই কষ্ট ভোগ করছেন। আমি বললাম: হজরত! রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

তিনি বললেন: গতকাল আরযি পেশ করেছিলাম। জবাব পেলাম এই দেহ আমার সম্পত্তি। আমার ইচ্ছা হয় সুস্থ রাখব ইচ্ছা হয় রোগাক্রান্ত করব। তুমি কেন অনধিকার চর্চা করতে এসেছ? এই অনধিকার চর্চা ছেড়ে দিতে পারলেই আমার বিশেষ বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারবে।

হজরত মুহম্মদ রুদবারি (র)

তিনি তৎকালীন একজন দরবেশ ও সুফি ছিলেন। তিনি শাহী পরিবারের সদস্য ছিলেন।

তিনি বলেছেন: আল্লাহ স্বয়ং যার জন্য যা পছন্দ করেন তা ছাড়া অন্য কিছু যে কামনা করে না তাকেই মুরিদ বলা হয়। ইহকাল ও পরকালে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষী না হয় সে-ই মুরিদ।

অর্থাৎ স্বীয় পছন্দ অপছন্দ আল্লাহর পছন্দ অপছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়াই মানুষের কাম্য হতে হবে। এটা মুরিদের জীবনের আধ্যাত্মিক পথের প্রথম পদক্ষেপ। মুরিদ যখন তার মুরাদ তথা অভীষ্ট বস্তু অর্জন করে তখন সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই প্রত্যাশী থাকে না।

হজরত কাসেম সাইয়ারী (র)

তিনি সাইয়ারিয়া সুফি সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন। তাকে তওহিদের ভাণ্ডার আখ্যা দেওয়া হতো। তিনি তার সময়ের ধর্মীয় নেতা এবং শরীয়ত ও হাকিকতে গভীর জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সদা-সর্বদা প্রশংসনীয় এবং আবু বকর ওয়াসেতীর সহচর্য লাভ করেছিলেন।

তিনি বলতেন: তওহিদ ছাড়া অন্য কিছুর স্থান অন্তরে না হওয়ার নামই তওহীদ।"

অন্তরে যদি তওহিদ ছাড়া আর অন্য কিছুর স্থান না হয় তবে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকই তওহিদে পরিপূর্ণ থাকে। মানুষের হৃদয়ে যা কিছু থাকে তা তার কার্যক্রমে প্রকাশ পায়। কাজেকর্মে যা প্রকাশ পায় তা তার অন্তরেরই বিষয়বস্তু। যার কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই তওহিদ ফুটে ওঠে সে-ই প্রকৃতপক্ষে তওহিদবাদী।

হজরত সাইয়ারী সম্পর্কে বর্ণিত আছে সারদের কোন লোকই তার চেয়ে সম্পদশালী এবং মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না। তিনি পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে বহু ধনসম্পদ ও জমি-যিরাতের মালিক ছিলেন। কিন্তু মহানবি ﷺ এর দু'গাছি কেশ মোবারকের পরিবর্তে তিনি তার সম্পত্তি দান করে দেন। তিনি বলতেন– এই দু'গাছি পবিত্র কেশের বরকতেই আমি যা কিছু পাওয়ার পেয়েছি। মৃত্যুর সময় তিনি বলে যান এই পবিত্র কেশদ্বয় আমার মুখের মধ্যে দিয়ে আমাকে দাফন করবে। তিনি সারদে সমাধিস্থ হন।

হজরত মুহম্মদ ইবনে খাফীফ শিরাযি (র)

তিনি খাফীফিয়া সুফি সম্প্রদায়ের নেতা ও শাহী পরিবারের সদস্য ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে তওবাহ করার তওফিক দান করেন এবং তিনি রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করে আল্লাহর দাসদের তালিকাভুক্ত হন। তার রচনায় দেখা যায় তিনি ইবনে আনা শিবলী, হুসায়েন ইবনে মানসূর ও হারীরি (র) এর সান্নিধ্যে থেকে ফয়েজ লাভ করেছিলেন।

তিনি বহু দেশ সফর করে বহু বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাই তিনি বিবাহ করার সময় পান নি। এলমের প্রতিটি বিষয়েই গভীর জ্ঞান রাখতেন। হাকিকত সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। পবিত্র মক্কা শরীফে হজরত ইয়াকুব নহরজুরির সান্নিধ্যে ছিলেন।

তিনি বলতেন: স্বভাবের বিরোধিতা করাই তওহিদ। অর্থাৎ মানুষের পথ ভ্রষ্টতার প্রকৃত কারণ হলো অন্ধের ন্যায় স্বভাবের তাড়নায় চলা। স্বভাবের বিরোধিতা করলে এমন কোন শক্তি নেই তাকে তওহিদে বিমুখ করতে পারে। ফলে কিয়ামতের দিন যখন মানুষ তার আযাবের জন্য শয়তানকে দায়ী করবে তখন শয়তান পাল্টা জবাব দেবে: "তোমার ওপর আমার কোন জোর তো ছিল না। আমার পথে চলার জন্য তোমাদের আহ্বান করা ছাড়া আর কিছুইতো করি নি। তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ এখন আমাকে দোষারূপ করো না। নিজের কর্মের জন্য নিজকেই দোষারূপ কর।"

এই পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট নেতা ও সর্দারদের পেছনে যারা চলত আল্লাহর কাছে যখন তাদের নিজেদের অপরাধের জন্য দায়ী করতে চেষ্টা করবে– তখন তারা এর জবাব দেবে, ন্যায় পথে চলতে কি আমরা তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম যখন সেই পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অন্যায়কারী ছিলে এবং অন্যায়কে পছন্দ করতে। তোমাদের উপর আমাদের তো কোন জোর জবরদস্তি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই অবাধ্য ছিলে এবং অবাধ্যতাকে পছন্দ করতে।

অর্থাৎ তোমরাই পাপ ও অন্যায়ের পথ বেছে নিয়ে সেই পথে চলেছ। আল্লাহ ও আল্লাহর তাঁর প্রদর্শিত যে পথ খোলা ছিল সে পথে তোমরা চল নি। অতএব আমাদের অযথা দোষারূপ না করে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ কর।

হজরত সাঈদ ইবনে সালাম মাগরেবি (র)

তিনি রাজনীতি ও কৃচ্ছ্র সাধনা উভয় বিষয়েই প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি গৌরবান্বিত বুযুর্গদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি দরবেশদের মজলিশের চেয়ে ধনীদের মজলিশকে গুরুত্ব দান করে আল্লাহ তার অন্তরকে মৃত্যু দান করেন।

যে ব্যক্তি আখেরাতের সুখ-শান্তির উপর পার্থিব ধনসম্পদ ও গৌরবকে স্থান দেয় সে ব্যক্তিই এমন কাজ করতে পারে। একবার যদি কেউ পার্থিব সুখ সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পরে তার পক্ষে তা ত্যাগ করা খুবই দুরূহ হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষের কর্তব্য সম্পদশালীদের সাহচর্য এড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের সাথে মেলামেশা করা।

হজরত ইবরাহীম নসরাবাদি

নিশাপুরে যেমন খাওয়ারযেম বাদশাহ ও শাহপুরে হামুরিয়া বাদশাহ ছিলেন। তদ্রূপ হজরত ইবরাহীম নসরাবাদিও একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি যেমন পার্থিব বিষয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন তদ্রূপ ধর্মের পথেও গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হজরত আবু বকর শিবলীর মুরিদ ও প্রখ্যাত আলেম ছিলেন।

তিনি বলতেন: তুমি দুটো সম্পর্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি হজরত আদম (আ) অপরটি আল্লাহর সাথে। হজরত আদম (আ) এর সাথে তোমার যখন সম্পর্ক স্থাপন হয় তখন তুমি কামনা-বাসনা ও বিপদ-আপদের সাথে জড়িত হয়ে পড়। এই সম্পর্কই প্রমাণিত করে যে তুমি মানুষ। এই সম্পর্কের ফলেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– মানুষ বড় অত্যাচারী এবং অপরিণামদর্শী।

আর যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তখন সে আল্লাহর বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হয়। আঁর এতেই প্রমাণ হয় যে তুমি আল্লাহর চিরদাস। এর প্রতি

ইশারা করেই আল্লাহ বলেন– রহমানের বান্দা পৃথিবীতে বিনম্র ও বিনয়তার সাথে চলে।

এই দুটো সম্পর্কের প্রথমটি শেষ মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই চলে যায়। আর দ্বিতীয় সম্পর্ক শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার সাথে সাথেই শুরু হয় এবং তার আর কোন সীমারেখা বা শেষ নেই। এই সম্পর্কই মানুষের কাজে আসবে।

দ্বিতীয় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا عِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا تَحْزَنُوْنَ –

"হে আমার বান্দা। আজ তোমাদের কোন প্রকার ভয় ভাবনা ও চিন্তা নেই।"

তোমরা এখন থেকে চিরস্থায়ী সুখে শান্তিতে থাক। আর এটা তোমাদের পার্থিব দুঃখ-কষ্টেরই ফল।

হজরত আলী হাজরামী (র)

তিনি আল্লাহর পথের পথিকদের অগ্রগণ্য অনুসন্ধানীদের প্রাণের আলেম ও আল্লাহর দরবারের ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন।

সুফিদের বড় বড় ইমামদের মাঝে পরিগণিত এবং তার যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুযুর্গ ছিলেন।

তিনি বলেছেন– যাও। আমাকে আমার অবস্থার প্রতি ছেড়ে দাও। তোমার তাতে কী? তোমরা কি আদমের বংশধর নও? যাঁকে আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করেছেন। তাঁর রূহ হতে তাঁকে রূহ দান করেছেন। তাঁকে ফেরেশতা দ্বারা সেজদা করিয়েছেন। সম্মান দান করার পর মাত্র একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত নির্দেশ পালন করেন নি। যে পানীয়ের প্রথম ঢোকই এত তিক্ত তার শেষ ঢোকের অবস্থা কেমন হবে?

মোটের উপর বান্দা যে কত অকৃতজ্ঞ হজরত হাজরামী উক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে উত্তমরূপে প্রকাশ করেছেন।

কুরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে: আল্লাহ তায়ালা যখন হজরত আদম (আ)-কে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করার বাসনা করেন তখন শয়তান চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল, হে আল্লাহ! তোমার এই সৃষ্টি এই মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী নয়। তাদের অধিকাংশই কৃতঘ্ন হবে। তাদের অধিকাংশই বিদ্রোহী নিমকহারাম ও অবাধ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ ও অগণিত নেয়ামত পাওয়ার পরও যদি কেউ অকৃতজ্ঞ হয় তবে তার স্থান জাহান্নামে হবে না তো কোথায় হবে।

ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পার্থক্য

১. মুহাসেবি সম্প্রদায়

বিশেষত্ব

সুফিদের এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হজরত আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবির নামানুসারে করা হয়। তিনি তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট মাকতুলুন নফস এবং মাকবুলুন নফস নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ তওহিদে সজ্জিত ছিল। তার মাজহাবের বিশেষত্ব হচ্ছে রেজার স্থান তাসাউফের স্থানসমূহের মধ্যে পরিগণিত নয়। বরং রেজা একটি হাল তথা অবস্থা।

অর্থাৎ মুহাসেবি বলেন– রেজা কোন স্থান বা মর্যাদা নয় প্রকৃতপক্ষে তা একটি অবস্থা যা বান্দার উপর ভর হয়। হজরত দাতা গন্জে বখশেরও এই অভিমত। এই ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

রেজার হাকিকত

রেজার উদ্দেশ্য কোরআন ও হাদীসের দ্বারা তার গুরুত্ব প্রকাশ পায় এবং সকলেই তাতে একমত। ফলে মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ –

আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা খুবই বড় সাফল্য।

অপর আয়াতে বলেন: আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট যখন তাঁরা গাছের নিচে আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি পেয়েছে যে আল্লাহকে স্বীয় প্রভু, ইসলামকে তার জীবন ব্যবস্থা এবং মুহম্মাদ ﷺ-কে স্বীয় পথ প্রদর্শক ও রাসূলরূপে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহর রেজা বান্দা সম্পর্কে এই যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর করুণা, নেয়ামত দান এবং পুণ্য দানের প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাত করা।

আল্লাহর প্রতি বান্দার রেজা হচ্ছে– আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করার জন্য তৈরি থাকা। তাঁর প্রতিটি কাজে যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।

হজরত আবু জর গেফারি (রা) বলেছেন: দরিদ্রতা সম্পদ অপেক্ষা এবং অসুস্থতা সুস্থতা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

হজরত হাসান (রা) এর নিকট উক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন–

আল্লাহ তায়ালা আবু জরের প্রতি কৃপা করুন। কিন্তু আমি বলি যে ব্যক্তি আল্লাহর স্বদেচ্ছার প্রতি খেয়াল করে সে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়বস্তু ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আশা পোষণ করতে পারে না।

মানুষকে যে বিষয়বস্তু চিন্তা-ভাবনা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে মুক্তি দেয় তা-ই রেজা। মানুষের মধ্যে রেজা তখনই সৃষ্টি হয় যখন সে অবগত হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় খবর জ্ঞাত।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মেনে না নেয় তার অন্তর পার্থিব চিন্তায় এবং দেহ নানা ধরনের বিপদাপদে জড়িত হয়ে পড়ে।

বিশরে হাফী ফুজায়েল ইবনে আইয়াজের নিকট জিজ্ঞেস করলেন– বৈরাগ্য ভালো না রেজা?

তিনি বললেন– বৈরাগ্য অপেক্ষা রেজা ভালো। কারণ রেজা উচ্চ মর্যাদা লাভের আশা রাখে না।

অর্থাৎ বৈরাগ্যের উপর আরও একটি স্থির আছে যা বৈরাগী আশা করে। তবে রেজার উপর আর কোন স্তর নেই যার আশা করা যেতে পারে। রেজা

এমন কোন বিষয়বস্তু নয় যা সাধনালব্ধ। মূলত তা আল্লাহর মেহেরবানি। কারণ অন্তরের শান্তি শ্রমলব্ধ নয় বরং এটাও আল্লাহর একটি অনুগ্রহ।

আল্লাহর রেজা প্রথম তারপর বান্দার। এতেই মুহাসেবির বাণীর সঠিকতা সম্বন্ধে প্রমাণ মিলে যে রেজা মাকামাতের মধ্যস্থিত কিছু নয় যে তা শ্রম দ্বারা অর্জন হতে পারে। বরং এটা একটি বিশেষ অবস্থা যা আল্লাহর বিশেষ দান।

মাকাম ও হালের পার্থক্য

মাকাম ও হালের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মাকামের সম্পর্ক মুজাহাদার সাথে আর এটা মুজাহাদা দ্বারা সাধিত হয়। মাকাম শ্রমলব্ধ বিষয়। অপরদিকে অন্তরের হাল আল্লাহ প্রদত্ত বিষয় যখন আল্লাহর মেহেরবানিতে হাল অবতরণ করে তখন নিজের ইচ্ছায় তা কেউ দূর করতে পারে না। পক্ষান্তরে যখন চলে যায় তখনও কেউ তাকে বাধা দিয়ে ধরে রাখতে পারে না।

মাকামাতে তাসাউফ

তাসাউফের মাকামসমূহের মধ্যে প্রথম মাকাম তওবা করা ভবিষ্যতে আল্লাহর অবাধ্যতা না করার এবং পূর্ববর্তী নাফরমানীর জন্য দৃঢ়ভাবে তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

দ্বিতীয় মাকাম আনাবাত তথা গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। তৃতীয় মাকাম যুহদ। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে সত্যিকারের সম্বন্ধ স্থাপন করা।

চতুর্থ মাকাম তাওয়াক্কুল তথা মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা। এরপরই রেজার পথ উন্মুক্ত হয়। সুফি সম্প্রদায় রেজাকে মাকামসমূহের মধ্যে একটি মাকাম বলেন। তাদের ধারণা অনুযায়ী মাকামসমূহের মধ্যে রেজা সর্বশেষ মাকাম। এই ক্রমানুযায়ী মুজাহাদা করলেও এই মাকাম লাভ হয়।

খুব ভালোভাবে জেনে রেখ যে তওবা ছাড়া আনাবাত, আনাবাত ব্যতীত যুহদ, যুহদ ব্যতীত তাওয়াক্কুল এবং তাওয়াক্কুল ব্যতীত রেজার স্তরে পৌঁছান কোন ভাবেই সম্ভবপর নয়। তাই প্রতিটি স্তর বিশেষযত্ন ও শ্রমসহকারে

অতিক্রম করতে হবে; তার নিয়মকানুন যথারীতি পালন করতে হবে। নতুবা সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নয়।

সুফি এবং শরীয়ত

প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোন ভাবেই শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করবে না। একদিন হজরত আবু হামযা (র) হজরত মুহাসেবির কাছে আগমন করেন এবং ওজদে এসে এমন কিছু করতে শুরু করলেন– যা একমাত্র হুলুলিয়া সম্প্রদায়ই করে থাকে। হজরত মুহাসেবি এটা দেখে রাগান্বিত হলেন এবং তার পিঠে চাবুক মারতে মারতে বললেন– "ওহে মরদুদ ! ইসলাম গ্রহণ কর। তুই তো কাফের হয়ে গেলি।

অন্যান্য মুরিদগণ হজরত মুহাসেবির পা জড়িয়ে ধরে আবু হামযাকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "হজরত! আমরা তো তাকে ওলিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী আর একনিষ্ঠ তওহিদবাদী মনে করি।"

হজরত মুহাসেবী বললেন: তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। তবে সে এমন কাজ করেছে, যা হুলুলিয়াদের কাজের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের কাজকর্ম করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হয়। আরও বলেন: তোমাদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ ও পরকালকে স্বীকার করে, তারা সন্দেহজনক স্থানে যাওয়া হতে বিরত থাক।

হজরত আবু হামযা বললেন: শায়খ! যদিও আমি হাকিকতের দিক থেকে কোন অন্যায় কাজ করি নি। তথাপি বাহ্য দিক থেকে আমার কাজ গোমরাহ সম্প্রদায়ের কাজের তুল্য ছিল। ফলে আমি তওবা করছি এবং এই কাজ আর কখনও করব না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে সুফিগণও ওলামায়ে হকদের অপেক্ষায় ধর্মের বিধান রক্ষার্থে অধিক সতর্ক ছিলেন। শুধু বাতেনেই নয় বরং প্রকাশ্য শরীয়ত ও সুন্নতে রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যকারী ছিলেন।

২. কাচ্ছারি সম্প্রদায়

বিশেষত্ব

হজরত আবু সালেহ ইবনে আহম কাচ্ছারি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মানুষের দোষারূপ পাওয়া এবং প্রকাশ করা ছিল তাঁর নীতি। কারণ তাদের মতে নফসের পবিত্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে মানুষদের নিকট নিন্দিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার নীতি ছিল বাতেনে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া।

অপবাদের পন্থা

অপবাদ তথা মালামত নামক শীর্ষে মালামাত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

৩. তাইফুরি সম্প্রদায়

বিশেষত্ব

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আবু ইয়াযিদ-তাইফুর ইবনে ঈসা বোস্তামি। তাদের তরীকার বিশেষত্ব হচ্ছে গালবাহ ও সুকর। অর্থাৎ প্রভাব ও মত্ততা অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। তবে এই সম্প্রদায়ের নেতা এমন ব্যক্তিই হতে পারে এবং এমন ব্যক্তিরই অনুসরণ করা হয় যিনি আল্লাহ প্রেমে বেহুঁশ হয়ে থাকা সত্ত্বেও শরীয়তবিরোধী চুল পরিমাণ অন্যায়ও করেন না।

হজরত সহল তশতরি সম্পর্কে বর্ণিত আছে- তিনি বৃদ্ধ বয়সে বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। যখন নামাযের সময় হতো তখন তার জ্ঞান ফিরে আসত। নামায শেষ হলেই পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন।

সুকর বা মত্ততা

তাইফুরিয়াদের মতে 'সুহ' (স্বজ্ঞানত) হতে সুকর মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ, বান্দা সুকরের অবস্থায় আল্লাহতে বিলীন হয়ে যায়- যাবতীয় কিছু হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। অবশ্য এই ব্যাপারে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে যে এই মত্ততায় কৃত্রিমতা করা বৈধ কি না? এবং মুজাহাদা দ্বারা এই মত্ততা লাভ করা যায় কি না?

এক দলের অভিমত: কৃত্রিম মত্ততায় আসা বৈধ এবং পরিশ্রম দ্বারাও মত্ততা অর্জন করা যায়। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন- মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন- "আল্লাহর ভয়ে খুব কাঁদ। আর যদি প্রকৃতপক্ষেই কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভান কর।"

তাঁরা বলেন, মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি অপর কোন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুযায়ী চলে সে তাদের মধ্যে পরিগণিত।

এই হাদীস দ্বারা তাঁরা এটাই প্রমাণিত করেন যে, সত্যিকারের মত্ততা লাভ করার লক্ষ্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। আল্লাহ অনুগ্রহ করে তা আমাদের দান করবেন এটাই আমাদের একমাত্র আশা।

অপর সম্প্রদায় বলেন- কৃত্রিম মত্ততা রিয়া। আল্লাহর কাছে রিয়া শিরক। তাছাড়া সুকর ও ছুহও পরস্পরবিরোধী। মুজাহাদা করার জন্য স্বজ্ঞানতা অপরিহার্য। কেননা অজ্ঞান অবস্থায় মুজাহাদা হতে পারে না। আর যতক্ষণ সুহও থাকে ততক্ষণ সুকর হতে পারে না। ফলে মুজাহাদা দ্বারা সুকর হতে পারে না।

৪. জোনায়েদি সম্প্রদায়

বিশেষত্ব

হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র) এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা। তাদের নীতি তাইফুরিয়া নীতির বিপরীত সুহওর উপর প্রতিষ্ঠিত। সুফিদের যাবতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত। আমার (গ্রন্থকার) উস্তাদও এই ফেরকার অনুসারী। তিনি বলতেন, সুকর ছেলেদের খেলার ময়দান, সুহও পৌরুষ প্রদর্শনের স্থান।

জোনায়েদি সম্প্রদায় বলেন: সুকর এর চেয়ে সুহও মর্যাদাসম্পন্ন। তারা বলেন, সুহও অর্থ হচ্ছে স্বজ্ঞানে আল্লাহর সাথে থেকে স্বীয় হাল ও আচার ব্যবহার ঠিক করা। দুনিয়া অর্জন ও সম্পদ সংগ্রহ করা নয়।

হজরত জোনায়েদ (র) বলতেন: সুহওর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যেন তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে।

সুকর এর মর্যাদা সম্পর্কে তাইফুরিয়াদের প্রমাণ

তাইফুরিয়াদের মতে আল্লাহর পথে চলার প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব বা আমিত্ব। সুকর অবস্থায় এই বড় আপদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং অন্যান্য যাবতীয় কিছু থেকেও পৃথক হয়ে যায়।

তারা বলেন- এটা এমনই অবস্থা যে অবস্থায় তাঁর প্রতিটি কাজকে আল্লাহর নিজের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى –

(হে নবি!) বালুর যে মুষ্ঠি আপনি নিক্ষেপ করেছেন তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি- মূলত আমি নিক্ষেপ করেছি।

কারণ, তখন মহানবি ﷺ স্বীয় অস্তিত্ব হতে একেবারে দূরে ছিলেন। আপাদমস্তক দাসত্বের পর্যায়ে ছিলেন। তখন তিনি সুকর অবস্থায় ছিলেন। তার কাজকে আল্লাহর কাজ হিসেবে বর্ণনা করাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে তিনি তার অস্তিত্বে ছিলেন না; ছিলেন আল্লাহর সাথে।

সুহও-র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জোনায়েদের দলিল

তাইফুরিয়ার জবাবে জোনায়েদিয়া সম্প্রদায় বলেন– সুকর অবস্থায় লোক জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা সবকিছু হারিয়ে ফেলে, ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকে না সুকর হালাতের জন্য দুঃশ্চিন্তা এবং তাতে সঠিকতা দূর হয়ে যায়। এই অবস্থায় বান্দা কোন কিছুর প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে সক্ষম হয় না। এই অজ্ঞতার দরুনই মানুষ পথহারা হয়ে বিপথে চলে।

তাই আল্লাহ তায়ালাও হজরত আদম (আ)-কে প্রতিটি জিনিসের নাম ও তার গুণাগুণ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মহানবি ﷺও আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, প্রভু হে! আমাকে প্রতিটি বিষয়ের যথার্থতা সম্বন্ধে অবগত করাও। কারণ বান্দা কোন কিছুর প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে পারলে তার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যায়।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَارِ -

"হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা যা কিছু দেখ তা হতে উপদেশ গ্রহণ কর।"

তাই মানুষ স্বজ্ঞানে কোন কিছুর জ্ঞান লাভ করতে না পারলে উক্ত উপদেশ কোথা থেকে গ্রহণ করবে? তাই যথার্থ তাকে বুঝার জন্য সুহওর প্রয়োজন। অতএব আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য সুহওর প্রয়োজন সুকর নয়।

সঠিকতা

আমি (গ্রন্থকার) উস্তাদের আনুকুল্যে জোনায়দিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী। সুকর অপেক্ষা সুহওর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে সুকরওয়ালার সুকরের অবস্থার পূর্ণতা স্বয়ং, সুহও। কারণ, সুকরের হাল অর্জনে প্রয়োজন উপলব্ধি, তা অর্জন করার চেষ্টা এবং তা অর্জন করার পর ঐ হাল কায়েম রাখা সব কিছুই সুহওর মুখাপেক্ষী। সুকরের উপর সুহওর স্থান এটা প্রমাণ করার জন্য এর অপেক্ষা বড় দলিল আর কী হতে পারে?

কিন্তু মূল কথা হলো যে বস্তু আসল উদ্দেশ্য তা হচ্ছে নিঃস্বার্থ এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করা এবং তার দাসত্ব স্বীকার করায় যেন কোন কিছু বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যদি এই অবস্থা অর্জন করা যায় তখন তা একদিকে যেমন সুকর অপরদিকে তেমনি সুহওতে পরিণত হয়। আর যদি এই অবস্থা অর্জিত না হয় তাহলে সুকর এবং সুহও সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারেই আসবে না।

৫. নূরী সম্প্রদায়

বিশেষত্ব: সাহচর্য ও স্বার্থহীনতা

হজরত আবুল হাসান আহমদ ইবনে নূরী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা নির্জনতায় অবস্থান করাকে পছন্দ করেন না। ওলিদের সংশ্রব পুরুষের ক্ষেত্রে ফরজ। অন্যের অধিকার এবং উপকার করাকে সর্বাধিকার দিতে হবে। তিনি বলেছেন– "নির্জনতা অবলম্বন করা হতে বিরত থাক। কারণ, নির্জনতা শয়তানের নিকটবর্তী তোমাদের কর্তব্য লোকের সান্নিধ্যে থাকা। কারণ তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো লোকের সংশ্রবে থাকা অবস্থায় স্বার্থহীনতাকে অগ্রাধিকার দান করা। কিন্তু এই লোক সংশ্রব যেন অন্যের নিকট হতে উপকৃত হওয়া বা তাদের সম্পদ হস্তগতের জন্য না হয়। বরং অন্যের সেবা এবং উপকার করার উদ্দেশ্যেই যেন হয়।

স্বার্থহীনতা বা নিঃস্বার্থে পরোপকার করাকে আল্লাহ অধিক পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

"নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করে।"

সাহাবা কেরামের অন্যান্য গুণাবলির সাথে এই গুণও অধিক পরিমাণে ছিল এবং এই গুণে তাদের সমকক্ষ আর কেউই ছিল না। একজন আনসার সাহাবা বলেন: উহুদ যুদ্ধের দিন আমি মুজাহিদদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে তাঁবু হতে পানি নিয়ে বের হলাম। আমি দেখলাম যুদ্ধের ময়দানে একজন মুজাহিদ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে রয়েছেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আর বেশি বাকি নেই।

তিনি ইশারায় আমার নিকট পানি চাইলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে পানির পাত্র দিলাম। তখন পার্শ্ববর্তী অপর এক মুজাহিদ পানি চাইলেন।

এটা শুনে প্রথম মুজাহিদ পানির পাত্র আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: আমার চেয়ে তাঁর পানির বেশি প্রয়োজন। তাঁকে পানি দাও। তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতেই তৃতীয় আর একজন বললেন: আমাকে পানি দাও। দ্বিতীয় মুজাহিদ পানির পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে বললেন– তাঁকে দাও।

এভাবে আমি ষষ্ঠ মুজাহিদের কাছে যখন পানি নিয়ে গেলাম তখন সপ্তম মুজাহিদ পানি চাইলেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গিয়ে দেখি তিনি আর জীবিত নেই। আমি পুনরায় সকলের নিকট গিয়েই দেখি তাঁদের আর কারও পানির প্রয়োজন নেই। সবাই শারাবান তহুরা পান করে শাহাদাতের কোলে নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

হজরত নাফে বলেন– একদিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র) মাছ খাওয়ার ইচ্ছা করলেন। আমি মাছের উদ্দেশ্যে পুরো শহর চষে বেড়ালাম। কিন্তু কোথাও মাছ পেলাম না। কয়েকদিন পর একটি মাছ পেলাম। তিনি আমাকে মাছের কাবাব তৈরি করতে বললেন। আমি মাছের কাবাব তৈরি করে তাঁর নিকট পেশ করায় তিনি এত খুশি হলেন যে তার মুখমণ্ডলে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে একজন ভিক্ষুক এসে দ্বারপ্রান্তে আওয়াজ দিল। তিনি বললেন: এই কাবাব ভিক্ষুককে দিয়ে দাও!

আমি বললাম: আপনি অনেক দিন ধরে মাছ খাওয়ার ইচ্ছা করছেন এবং বহুকষ্টে পাওয়া গেছে। আপনি মাছ খান। ভিক্ষুককে অন্য কিছু দিচ্ছি।

হজরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন: আমি মহানবি ﷺ-কে এরশাদ করতে শুনেছি, "যদি কারও কোন জিনিসের ইচ্ছা হয় এবং তা পাওয়ার পর যদি নিজের প্রয়োজনের উপর অপরের প্রয়োজনকে বেশি মনে করে তা দান করে তবে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) অতপর বললেন– আমি এই মাছ খাওয়ার ইচ্ছা মন থেকে দূর করে দিয়েছি। এখন তা খাওয়া আমার পক্ষে হারাম। সুতরাং ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।

মক্কার মুশরিকগণ যে রাতে মহানবি ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই রাতে তিনি হজরত আলী (রা) কে তাঁর বিছানায় শুতে বলে নিজে হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা গমন করেন। হজরত আলী (রা) নিজের জীবন বিপণ্ন মনে করেও উক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে তাঁর প্রিয় নবির বিছানায় শয়ন করেন এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েন।

এতে আল্লাহ তায়ালা হজরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ) কে ডেকে বললেন আমি তোমাদের দু' জনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছি। তোমরা একের জন্য অন্যের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছ।

তারা উভয়েই চুপ করে থাকলেন: কেউ কোন কথা বললেন না।

এরূপ দেখে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে ফেরেশ্‌তাদ্বয়। আলীকে দেখ। আমি আলী ও মুহম্মদ ﷺ কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছি। আলী তাঁর ভাইয়ের জন্য সানন্দে জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাঁর ভাইয়ের বিছানায় শুয়ে রয়েছে যেন তাঁর ভাইয়ের কোন ক্ষতি না হয়। এখন তোমরা গিয়ে আলীকে পাহারা দাও যেন শত্রুগণ তাঁর কোন ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম না হয়।

ফেরেশ্‌তাদ্বয় সাথে সাথে পৃথিবীতে নেমে আসলেন। হজরত মিকাঈল (আ) পদদ্বয় এবং জিবরাঈল (আ) মাথার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) বললেন– হে আবু তালেব তনয়! আজ তোমার ন্যায় আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সম্মুখে তোমার সম্পর্কে গল্প করছেন আর তুমি সুখ নিদ্রায় নিদ্রিত।

বর্ণিত আছে গোলামুন খলিল নামক একজন কপট দরবেশ ন্যায়নিষ্ঠ বুযুর্গদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা শুরু করল। সে নূরী রাকাম ও আবু

হামযাকে গ্রেফতার করিয়ে খলিফার দরবারে পেশ করত বলল এরা বেদীন সম্প্রদায়ের নেতা। আপনি যদি এদের হত্যা করার নির্দেশ দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। কারণ এটা এতবড় পুণ্যের কাজ হবে যে যে ব্যক্তির হুকুমে এরা নিহত হবে আল্লাহর দরবার থেকে প্রতিদান দেওয়ার জিম্মাদার আমি হব।

খলিফা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তিনজনকেই হত্যা করার হুকুম দিলেন। জল্লাদ তিন জনকেই হাত বেঁধে মরুভূমিতে নিয়ে গেল এবং রাকামকে প্রথম হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো। নূরী এটা দেখে রাকামের স্থানে গিয়ে বসলেন। তখন আনন্দে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এই কাণ্ড দেখে উপস্থিত সবাই এবং ঘাতক বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। জল্লাদ বলল, হে বাহাদুর! তরবারি এমন জিনিস নয় যে আনন্দের সাথে তার সামনে মাথানত করে দেওয়া যেতে পারে, যেমন আপনি দিচ্ছেন। এখনও আপনার সময় আসে নি।

হজরত নূরী বললেন: আমিও একথা জানি। কিন্তু জীবনের অপেক্ষায় মানুষের নিকট আর কোন প্রিয় বস্তু নেই। আমি চাই যে কয়েক মুহূর্ত বাকি আছে তা আমার ভাইয়ের জন্য উৎসর্গ করি। কেননা দুনিয়া খেদমত করার স্থান। পরকাল আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্থান। এখানে খেদমত করলেই পরকালে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যাবে।

খলিফার নিকট এই বিস্ময়কর সংবাদ পাঠানো হলো। খলিফা এই খবর জানতে পেরে এবং তাঁদের উন্নতমানের কথা শুনে ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাদের হত্যার আদেশ স্থগিত করে প্রধান কাজি আবুল আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

প্রধান কাজি তাদের সাথে শরীয়ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে দেখলেন, তারা শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী। ফলে তাঁদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করায় কাজি লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করলেন।

নূরী বললেন: হে কাজি সাহেব! আপনি তো কয়েকটি বাহ্য প্রশ্ন করলেন। আল্লাহর এমন বান্দাও রয়েছেন যাঁদের কথাবার্তা, খাওয়া পরা ওঠা-বসা– সব কিছুই আল্লাহর সাথে হয়ে থাকে। ক্ষণিকের জন্যও যদি তাঁদের এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তাঁদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়।

তাঁর কথায় কাজি সাহেবের মধ্যে খুবই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি খলিফাকে লিখলেন এরা যদি বেদীন হয় তাহলে দুনিয়ায় একত্ববাদী কারা?

খলিফা তাঁদের দরবারে ডেকে বললেন: আপনাদের কোন চাহিদা থাকলে বলুন।

হজরত নূরী বললেন: আপনার কাছে আমাদের শুধু একটাই প্রয়োজন যে আপনি আমাদের ভুলে যান, না আমাদের উপকার করুন আর না আমাদের চলার পথে বাধা দিন।

খলিফা এই কথা শুনে খুব কাঁদলেন এবং সম্মানের সাথে তাঁদের বিদায় জানালেন।

পুণ্যের চাবি

স্মরণ রেখো নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে অপরের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে পুণ্যের চাবি রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ –

আল্লাহর জন্য তোমাদের প্রিয়বস্তুকে উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউই নেককার হতে সক্ষম হবে না।

পৃথিবীতে মানুষের সর্বাধিক প্রিয়বস্তু তার জীবন। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্তবা সেই প্রাণ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ –

যাঁরা আল্লাহর পথে মারা যায় তাঁদের মৃত মনে করো না। তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত এবং তাঁদের জীবিকা দেওয়া হয়।

অপর আয়াতে এরশাদ করেন: যাঁরা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে তাঁদের মৃত বলো না বরং তাঁরা জীবিত।

হজরত রোয়াইম (র) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: আমাকে কিছু নসিহত করুন।

তিনি বললেন– বৎস ! জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া কোন কাজ হয় না। যদি তোমার এমন দৃঢ়তা থাকে তবে এই পথে পা রাখ। নতুবা সুফিদের অযথা কথায় জড়িত হয়ো না।

৬. সুহাইলিয়া ফেরকা

হজরত সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাসাউফধারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। ইজতিহাদ, নফসের মুজাহাদা এবং সাধনাই ছিল তার তরিকার নিয়ম।

নফসের মুজাহাদা এবং তার গুরুত্ব

গ্রন্থকার সুহাইলের মজহাবের প্রমাণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন: আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আমার পথে মুজাহাদা তথা কষ্ট করবে আমি অবশ্য তাকে আমার পথ প্রদর্শন করব।"

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: "প্রকৃত মুজাহাদা হচ্ছে আল্লাহর পথে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা।"

একবার মহানবি ﷺ যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পথে এরশাদ করলেন: আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! ঐ জিহাদে আকবর কী?

তিনি বললেন: তা হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

এতে জানা যাচ্ছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করা অপেক্ষা সর্বক্ষণ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে যথারীতি ইবাদত বন্দেগি করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কঠিন। এই কারণেই সুফিদের মধ্যে নফসের মুজাহাদা করার প্রচলন রয়েছে এবং তাকে প্রশংসনীয় ভেবে থাকেন। সুহাইলিয়া সম্প্রদায় এই ব্যাপারে খুবই দৃঢ় এবং তাঁরা এই বিষয়ের চরম শিখরে উপনীত।

তাঁদের নীতি ছিল পনের দিন পর একদিন আহার করা আর এভাবে তাঁরা সামান্য পরিমাণ আহার করে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদের মজহাবের ভিত্তি হলো– মহানবি ﷺ স্বয়ং রাতে জাগ্রত থাকতেন, কম আহার করতেন এবং রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এরশাদ করেছেন:

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى –

"আমি আপনার নিকট কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করি নি যে আপনি ভয় পান এবং বিপদে জড়িত হন।"

হজরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন: মসজিদে নববী তৈরির সময় মহানবি ﷺ নিজে ইট বহন করছিলেন। আমি বললাম: আপনি কষ্ট করবেন না। আপনার ইট আমি বহন করব। মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন: হে আবু হুরায়রা! তুমি অন্য কারও ইট বহন কর। আসল জীবন তো পরকালের জীবন। ফলে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "পরিশ্রম ও কষ্ট করার জন্যই পৃথিবীতে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি।"

হজরত হাব্বান ইবনে খারেজাহ বলেন: আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর কাছে আল্লাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমার নফস হতে মুজাহাদা শুরু কর এবং তাকে খুব কষ্ট দাও। নিজের নফস হতে যুদ্ধ আরম্ভ কর এবং খুব ডাটের সাথে তার সাথে যুদ্ধ কর।

নফসের সাথে মুজাহাদা এবং যুদ্ধ করার অর্থ হলো তার কামনা হতে তাকে বিরত ও দূরে রাখা আল্লাহ তায়ালা বলেন যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে ভয় পায় আর যে তার নফসকে তার কামনা হতে বিরত রাখে তাঁর জন্যই জান্নাত। এই সম্বন্ধে হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন: "আমি আমার উম্মত সম্বন্ধে যেই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো তাদের নফসের কামনার পেছনে চলা এবং দীর্ঘ আশা পোষণ করা।"

নফসের কামনা দু' প্রকার

নফসের কামনা দুই প্রকার। যথা:

১. স্বাদ আহ্লাদ।

২. পদ মর্যাদা আর নেতৃত্ব কামনা।

প্রথম প্রকার নিজের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অন্যান্য সকলে তা থেকে বিপদমুক্ত থাকে। দ্বিতীয় প্রকার কামনা জনসাধারণকেও জড়িত করে। এমনকি মসজিদ ও গীর্জাও তা থেকে নিরাপদ থাকে না। একই কামনায় জড়িত লোক নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব দ্বিতীয় প্রকার কামনাকে অধিক দৃঢ়তার সাথে বন্ধ করা উচিত।

৭. হাকীমিয়া সম্প্রদায়

বৈশিষ্ট্য

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আলী হাকীম তিরমিযি (র)। তার নীতি হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালার ওলিদের একটি দল রয়েছে যাঁদের আল্লাহ তায়ালা সবার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। তাঁরা তাঁদের নফস ও কামনার উপর জয়ী। তাঁরা হাকিকত সম্পর্কে জ্ঞানী এবং তাঁদের দ্বারা কারামত প্রকাশ পেতে পারে।

হজরত আলী হাজবিরী (র) বেলায়েত সম্পর্কে বলেন: ওলি অর্থ বন্ধু। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করে এবং অন্যান্য বন্ধু অপেক্ষা তার প্রতি অধিক ভালবাসা রাখে– সে-ই আল্লাহর ওলি।

মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আল্লাহর ওলি বা বন্ধু। আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেছেন। তাঁরা নফস ও কামনার তাড়না হতে মুক্ত। কেবল আল্লাহর সাথেই তাঁদের বন্ধুত্ব। এমন লোক প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান আছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ব্যাপারে বলেন: "সাবধান হও! যাঁরা আল্লাহর ওলি নিশ্চয়ই তাঁদের কোন প্রকার ভয়ভীতি বা চিন্তা ভাবনা নেই।"

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যাঁদের প্রতি নবি এবং শহিদগণও ঈর্ষান্বিত।

সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় কী? তাদের গুণাবলি বলুন যেন আমরা তাঁদের ভালোবাসতে পারি এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।

মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন: যাঁরা ধনসম্পদ ও যাবতীয় কিছু হতে আল্লাহর নির্দেশকে অধিক ভালোবাসে। কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল নূরের তৈরি হবে এবং তারা নূরের আসনে উপবিষ্ট হবে। অন্যান্য সকল লোক ভয়ে কম্পমান থাকবে তাঁদের কোন ধরনের ভয় থাকবে না। অন্যান্য

লোক চিন্তামগ্ন থাকবে কিন্তু তাঁদের কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা থাকবে না। অতঃপর তিনি এই অর্থযুক্ত আয়াত পাঠ করলেন হুঁশিয়ার থাক! ওলিদের কোন ভয় ভাবনা নেই। অতঃপর মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কোন ওলিকে কষ্ট দেয় তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ করা জায়েয।

ওলি কী জানতে পারেন যে তিনি ওলি– এই ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হজরত আবু ইয়াযীদের নিকট লোকে প্রশ্ন করল: ওলির পরিচয় কী?

তিনি বললেন: ওলি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে দৃঢ়। কারণ আল্লাহর সাথে যার বন্ধুত্ব যত গভীর হবে ততই সে বন্ধুর নিকট বিশ্বাসী হবে। আল্লাহর মহানতা তার হৃদয়ে সুদৃঢ় হবে।

আওলিয়া এবং শরীয়ত

আল্লাহর ওলিকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করতে হয় না একথা যারা বলে– তারা মুলহিদ এবং তাদের উপর আল্লাহর লা'নত।

হজরত আবু ইয়াযিদ বলেন: আমি শুনতে পেলাম অমুক শহরে একজন ওলি আছেন। আমি তার সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে সেই শহরে গেলাম এবং তিনি যে মহল্লায় থাকেন সেই মহল্লায় মসজিদে গিয়ে তার আগমন অপেক্ষায় থাকলাম। তিনি মসজিদে আসলেন এবং দেখলাম তিনি মসজিদে থুতু নিক্ষেপ করলেন। এই অবস্থা লক্ষ করে আমি ফিরে আসলাম।

তার এই কাজ দেখে আমি চিন্তা করলাম তিনি যদি ওলি হতেন তাহলে আল্লাহর শরীয়তের প্রতি নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতেন। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা রক্ষা করতেন। সেই রাতেই আমি মহানবি ﷺ কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে এরশাদ করলেন, হে আবু ইয়াযীদ! আল্লাহ তোমার এই কাজে তোমার প্রতি রাজি।

ওলিদের কারামত প্রকাশ

ওলিদের থেকে কারামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। এতে জ্ঞান বিরোধী কোন কিছু নেই। অস্বাভাবিক কোন কিছু সংঘটিত হলে তাকে কারামত বলে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ওলিদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটা দ্বারা ওলিদের সম্মানিত করা হয়। গবেষণার শক্তি দ্বারা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করাও বেলায়েতের নিদর্শন।

মোজেযা ও কারামত

মোজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য এই যে মোজেযা নবিদের থেকে প্রকাশ পায় এবং নবিগণ তাঁদের মোজেযায় পূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু কারামতের ব্যাপারে ওলি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন না যে এটা কারামত না চক্রান্ত। তাছাড়া মোজেযাধারী নবি হওয়ায় আল্লাহর শরীয়তের আদেশ-নিষেধে তারতম্য করতে পারেন। কারণ, তিনি নিজেই শরীয়ত দাতা।

কিন্তু ওলি কারামতধারী হওয়া সত্ত্বেও অকাট্যভাবে শরীয়তের আনুগত্যকারী হয়ে থাকেন এবং শরীয়ত পালন করা ছাড়া তার আর কোন দ্বিতীয় পথ থাকে না। তাঁর কোন কারামতই শরীয়তবিরোধী হতে পারে না।

অলী এবং পবিত্রতা

অলী নিষ্পাপ নন। নিষ্পাপ হওয়া কেবল নবিদের জন্য শর্ত। কারও দ্বারা স্বাভাবিক কোন কিছু প্রকাশ পেলে তা তার জন্য ওলি হওয়ার প্রমাণ নয়। যদি সে শরীয়তে ইলাহীর অনুসারী হয় তাহলে তা তার ওলি হওয়ার নিদর্শন হতে পারে। নতুবা তার দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পেলে দাজ্জাল দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ হওয়া বলেই বিবেচ্য। কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করা বেলায়েতের জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত।

কিন্তু ওলি নিষ্পাপ নন। তার দ্বারা অন্যায় ও পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। পাপ এবং অবাধ্যতা বেলায়েতের বাধা নয়। বেঈমান বা মুরতাদ হলে ওলি হতে পারে না। মুহম্মদ ইবনে আলী তিরমিযি, জোনায়েদ বাগদাদি, আবুল হাসান নূরী এবং হারেস মুহাসেবি এই মতের পক্ষপাতী।

কিন্তু সহল তশতরি, আবু সোলায়মান দাররাসি, আবু হামদান কাচ্ছার প্রমুখের মতে কোন ধরনের কবীরাহ গুনাহ করলে ওলির বেলায়েত থাকে না। তাকে ওলির দপ্তর থেকে পদচ্যুত করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বন্ধু তথা ওলিদের দ্বারাও সময় সময় পাপ সংঘটিত হয়। কোন পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার পর যদি সে বুঝতে পারে যে সে পাপ করেছে তাহলে সাথে সাথেই সে তওবা করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করে এবং আল্লাহ মেহেরবানি করে তাকে মাফ করেন।

কারামতের ঘটনা

ক. একদিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখতে পান, একটি বাঘ অনেক লোকের পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বাঘটিকে লক্ষ করে বললেন: হে কুত্তা! আল্লাহ যদি তোকে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তা কার্যকরী কর। নতুবা পথ ছেড়ে দে! একথা শুনে বাঘটি জঙ্গলে চলে গেল।

খ. এক অনারব যুবক হজরত ওমর (রা) কে হত্যা করার জন্য মদিনায় আগমন করল। সে মানুষদের নিকট জিজ্ঞেস করল হজরত ওমর (রা) কে কোথায় পাব? মানুষেরা বলল, হয়তো রাস্তাঘাটে কোথাও শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। যুবক তালাশ করতে করতে দেখতে পেল তিনি একটি গাছের নিচে মাটিতে শুয়ে নিদ্রা গিয়েছেন।

যুবক এটাকেই সুবর্ণ সুযোগ ভেবে তরবারি হাতে অগ্রসর হতেই দেখল দুটো বিরাট বাঘ তাকে আক্রমণ করার জন্য দৌড়িয়ে আসছে। যুবক সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে দিল। হজরত ওমর (রা) এর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং যুবকের চিৎকারের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুবক তার অপকর্মের কথা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করল।

গ. হজরত আবু বকর (রা) এর খেলাফতের আমলের ঘটনা। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) এর নিকট কিছু উপঢৌকন এসে

পৌঁছল। তার মধ্যে এক কৌটা বিষও ছিল। বাহক বলল: এমন প্রাণ সংহারক বিষ কোন রাজা-বাদশাহর ভাণ্ডারেও নেই। এর অল্প পরিমাণ মুখে দিলেও প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে।

হজরত খালেদ (রা) বললেন: মরা বাঁচা আল্লাহর হাতে। তাতে কারও কোন অধিকার নেই। এ কথা বলে তিনি বিসমিল্লাহ পাঠ করত বিষ পান করলেন। কিন্তু বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল না। এই ঘটনায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঘ. হজরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন: আমি একবার এক রাখালের কাছে পান করার জন্য কিছু পানি চাইলাম। রাখাল বলল: আমার নিকট পানি নেই। দুধ আছে যে পরিমাণ ইচ্ছা আপনি পান করতে পারেন।

তিনি বললেন: আমার পানির প্রয়োজন ছিল। আমার কথা শুনে রাখাল তার হাতের লাঠি দ্বারা পার্শ্বস্থ একটি পাথরে আঘাত হানল। সাথে সাথেই পাথর ফেটে গিয়ে একটি সুন্দর সুমিষ্ট পানির ঝরনাধারা বের হলো এটা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম।

রাখাল বলল: এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? বান্দা যখন আল্লাহর অনুগত হয় তখন আল্লাহর সকল সৃষ্টি সেই বান্দার কথামত চলে।

ঙ. হজরত ইবরাহীম রাকী (র) বলেন: আমার জীবনের প্রথম পর্যায়ে আমি মুসলিম মাগরিবির সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি ইমামতী করছেন এবং সূরা ফাতেহা ভুল পড়ছেন। আমি মনে মনে বললাম: আমার এত কথা বৃথা গেল। সেই রাত আমি সেখানেই কাটালাম। ভোরে নিদ্রা হতে উঠে আমি উজু করার উদ্দেশ্যে ফোরাত নদীতে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একটি বাঘ শুয়েছিল। আমাকে দেখে গাত্রোত্থান করে আমাকে আক্রমণ করতে এলো। আমি পেছনে ফিরে দৌড় দিলাম। বাঘও আমার পেছনে পেছনে ছুটল। আমি মসজিদের নিকট এসে পৌঁছলাম।

ইত্যবসরে হজরত মুসলিম তার খানকা থেকে বাইরে এসে বাঘের কান মোচড়িয়ে ধরে বললেন: হে আল্লাহর কুকুর! আমি না তোকে বলে দিয়েছি তুই আমার মেহমানদের বিরক্ত করবি না।

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন: হে আবু ইসহাক! তুমি বাহ্য দিকটা সজ্জিত করায় ব্যস্ত। ফলে আল্লাহর সৃষ্টিকে ভয় করছ। আল্লাহর জন্য বাতেন সুসজ্জিত কর তাহলে তোমার কোন ভয় থাকবে না। হেদায়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য আহকামে ইলাহীর উদ্দেশ্য বুঝা এবং তাকে আমলের জামা পরিধান করানোর প্রয়াস পাওয়া। অন্যান্য সব কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্তব্য। ফলে হুজুর ﷺ-এর সময় ঢালাও নির্দেশ ছিল যেভাবে কেউ বাড়তে পারে বাড়ুক। তবে উদ্দেশ্য বুঝতে এবং তাতে সর্বান্তঃকরণে দৃঢ় থাকার চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমি আমার রাসূলদের প্রকাশ্য আহকামসহ পাঠিয়েছি। তার সাথে কিতাব এবং দাড়িপাল্লা অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা আমার অনুগত এবং ইবাদত বন্দেগিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কিরাম

এটাও ভালোভাবে অবগত হতে হবে যে তরীকতের সকল শায়খ একমত যে, ওলি সর্বাবস্থায় নবিদের অনুসারী এবং তাঁদের আহ্বান মান্যকারী। কারণ যেখানে বেলায়েতের শেষ সেখান থেকেই নবুয়তের সূচনা। সমস্ত নবিই ওলি কিন্তু কোন ওলি নবি নয়। যে ব্যক্তি নবির অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও ওলি হওয়ার দাবি করে সে আল্লাহর ওলি নয় শয়তানের ওলি।

৮. খাররাযিরা সম্প্রদায়

বৈশিষ্ট্য

এই সম্প্রদায়ের ইমাম হজরত আবু সাঈদ খাররায। তাসাউফের ফানা ও বাকার পরিভাষার প্রবর্তন তিনিই প্রথমে করেন। তাসাউফে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ঐ দুটো পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

ফানা ও বাকার হাকিকত

হজরত গঞ্জে বখশ খাররাযিয়া তরিকার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেছেন:

কোন কোন লোকের মতে ফানার অর্থ হচ্ছে নিজের স্বত্তা ও অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়া। বাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যাওয়া। অন্য কথায় আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করা। তবে পরিষ্কার কথা হলো স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনও মিলিত মিশ্রিত হতে পারে না। আর এমনও সম্ভবপর নয় যে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে আল্লাহর অস্তিত্বে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তিই আল্লাহ ও তার গুণাবলির অংশীদার নয়। আর হতেও পারে না। এই ধরনের বিশ্বাসী প্রকাশ্য কাফের এবং দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

এলমের ক্ষেত্রে ফানার অর্থ তুমি জেনে রেখ যে এই পৃথিবী ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুই কৃত্রিম এবং ধ্বংসসীল। বাক্য অর্থ পরকাল এবং নিকটস্থ যাবতীয় কিছু স্থায়ী এবং চিরন্তন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "পার্থিব সব কিছু ধ্বংসশীল। একমাত্র গৌরবান্বিত ও সম্মানিত তোমার প্রভুর সত্তাই চিরস্থায়ী। আরও বলেন: "পরকাল উত্তম এবং চিরন্তন।"

পৃথিবীতে মানুষের অধিকারে যা কিছু রয়েছে এবং লাভ করতে পারে তার সব কিছুই বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তার কোন লয় কিংবা ক্ষয় নেই। জ্ঞানগতভাবে এটাই ফানা এবং বাকার অর্থ এবং আল্লাহ এটাই প্রকাশ করেছেন।

কার্যত ফানা বাকার অর্থ হচ্ছে: মানুষ নিজের মধ্য থেকে অজ্ঞতা, অলসতা, কামনা-বাসনা এবং আল্লাহর নাফরমানীকে দূর করে দেওয়া, যাতে সে আল্লাহর অনুগত থেকে তাঁরই ইবাদত বন্দেগিতে সময় কাটায়।

হজরত ইবরাহীম শীবানী (র) বলেন: ফানা বাকার জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু আন্তরিকতা আর সারাজীবন খালেস তওহিদের বাহক থাকা এবং সঠিকভাবে ইবাদত বন্দেগি করা। কোন লোক যদি ফানা ও বাকার এটা ছাড়া অন্য কোন অর্থ করে তবে সে বেদিন ও যিন্দীক। সত্য ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই।

সুতরাং ফানা ও বাকার আসল অর্থ মানুষ এই নশ্বর পৃথিবীর নশ্বর বিষয়বস্তু প্রতি অনাসক্ত থেকে সমস্ত মনপ্রাণ ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা অবিনশ্বর পৃথিবীর প্রতি আসক্ত থাকা। পরকালের সুখ-শান্তির ইচ্ছায় আল্লাহর রাসূলের অনুগত থাকা।

৯. খাফীফিয়া সম্প্রদায়

যাহের ও বাতেনের আলেম হজরত মুহম্মদ ইবনে খাফীফ শিরাজি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি শাহী পরিবারের সদস্য ছিলেন। আমি শুনেছি তওবা করার পূর্বে তিনি চারশত মহিলার পানি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তওবা করার পর শিরাজের এক বুযুর্গের সান্নিধ্যে আসেন!

তওবা করার পরও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে রাজা বাদশাহ এবং আমির ওমারাদের মেয়ে তাঁর সাথে বিবাহ দিতেন। এভাবে তিনি চল্লিশ জন মহিলাকে বিবাহ করেন। তবে তাদের সাথে নির্জনে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাদের তালাক দিতেন।

তিনি এক উযীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এই রমণীই তাঁর সাথে চল্লিশ বছর থাকেন। এই মহিলা বলেন– আমার স্বামী আমাকে দেখান যে তার বক্ষদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত পেটের মধ্যে বারটি গিরা। তিনি এটা দেখিয়ে বললেন: এর সব কয়টিই সবর বা ধৈর্যের ঘাঁটি। আমি সুন্দর চেহারা এবং উৎকৃষ্ট পানাহারের দ্রব্যাদি থেকে ধৈর্য ধারণ করেছি।

গায়বত ও হুজুরের হাকিকত

খাররাযিয়া সম্প্রদায় যেমন ফানা বাকার পরিভাষা বর্ণনা করেছেন তদ্রূপ খাফীফিয়া সম্প্রদায় গায়বত ও হুজুর দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। গায়বতের অর্থ হচ্ছে মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় কিছু হতে দূরে থাকা। এমনকি নিজেও নিজের অস্তিত্ব হতে অদৃশ্য বা অজ্ঞাত থাকা এবং আল্লাহর দরবারে হাজির থাকা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যখন কোন গোলাম তার মালিকের সম্মুখে হাজির থাকে তখন তার সমস্ত মনোযোগ মালিকের সন্তুষ্টি বিধানার্থে, তার আদেশ পালনার্থে প্রস্তুত থাকে। অন্য কিছু চিন্তা করা তো দূরের কথা নিজের অস্তিত্বকেও ভুলে যায়। অতএব যে ব্যক্তি মনে করে আমি সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে আছি তার অবস্থাও উক্ত গোলামের ন্যায় হয়ে থাকে।

গায়বত ও হুজুর এর অবস্থা

হজরত জুননূন মিসরি (র)-এর মুরিদদের মধ্যে কোন এক মুরিদ হজরত আবু ইয়াযিদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করেন। যখন তিনি তার খানকায় যান তখন দরজায় করাঘাত করেন। ভেতর হতে আবু ইয়াযিদ জিজ্ঞেস করলেন: কে? কেন এসেছ?

তিনি বললেন: আমি আবু ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন: আবু ইয়াযিদ কে? কোথায় থাকেন? আমি দীর্ঘদিন তার সন্ধান করেও পাই নি।

সে ব্যক্তি ফিরে এসে হজরত জুননূনের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করায় তিনি বললেন: আমার ভাই আবু ইয়াযিদ আল্লাহর দিকে যাত্রীদের সাথে মিলে গেছেন।

১০. সাইয়ারিয়া ফেরকা

এই সম্প্রদায়ের লোক হজরত আবুল আব্বাস সাইয়ারির ভক্ত। তিনি সকল বিষয়ের আলেম এবং আবু বকর ওয়াস্তীর সাথি ছিলেন। তার মজহাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তাসাউফকে জমা এবং তাকাররাবা পরিভাষায় বর্ণনা করেছেন।

একমাত্র সাইয়ারিয়া ছাড়া তাসাউফের আর কোন সম্প্রদায়ই তার আসল আকৃতিতে নেই। কারণ নাসা ও মারদ-এ এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয় নি যখন উক্ত মাজহাবের কোন ইমাম বিদ্যমান ছিলেন না। বর্তমানেও নাসা ও মারদ-এ-আবুল আব্বাস শিরাজির বহু ভক্ত আছেন। বিশেষ করে তাদের কাছে এই মজহাবের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রয়েছে। আমি তা পাঠ করেছি– অত্যন্ত চমৎকার গ্রন্থ।

জমা ও তাকাররাবার অর্থ

নিজের গুণাবলি দ্বারা যা সম্মিলিত হয় তা-ই জমা। আর যা স্বীয় কাজ দ্বারা পৃথক হয় তা তাকাররাবা। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত।

অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলি দিয়ে এমনভাবে সজ্জিত হয় যে তার গুণাবলি ও কার্যাবলির মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য থাকে না। এমনকি আল্লাহ তাকে যে ইচ্ছা ও কর্মে ক্ষমতা দান করেছেন তাও আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করে তাকেই জমা বলা হয়।

আর যদি তার মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলি সমবেত না হয় এবং গুণাবলি ও কার্যাবলির মাঝে বিরোধ এবং পার্থক্য পাওয়া যায় তাহলে তাকে তাকাররাবা বলা হয়।

হজরত আবু আলী রুদবারী বলেন: বান্দার গুণাবলির মধ্যে জমার অর্থ হচ্ছে তার সত্য বিশ্বাসের সাথে এবং বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে তওহিদে প্রতিষ্ঠিত থাকা। অন্য কথায় বান্দার যাবতীয় কথা ও কাজ সঠিক সত্যের অনুযায়ী হয়। তার প্রতিটি কথা ও কাজের উৎস এবং সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি হবে।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আমার বান্দা নফল ইবাদত বন্দেগি দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার হাত, কান, চোখ ও জিহ্বায় পরিণত হই। যখন সে কথা বলে, শুনে বা স্পর্শ করে তখন সবকিছু আমার উদ্দেশ্যে আমার দ্বারা করে। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা মহানবি ﷺ সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন, "যখন আপনি এক মুষ্ঠি বালি নিক্ষেপ করলেন তখন তা আপনি করেন নি। আমি করেছি।"

আরও এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের অনুগত সে আল্লাহরও অনুগত।"

আরও ঘোষণা করেছেন: "হে নবিবর! তাদের বলে দিন যে যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার আদেশ পালন কর। তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

জমা ও তাকাররাবা সম্বন্ধে সুফিদের মধ্যে মতবিরোধ

সমস্ত সুফিদের মধ্যে জমার অর্থ মাওয়াহেব আর তাকাররাবার অর্থ মাকাসেব। অর্থাৎ আল্লাহ মেহেরবানিপূর্বক যা কিছু দান করেন তার জন্য কোন ধরনের শ্রম ও চেষ্টা করতে হয় না তা জমা। আর যা শ্রমলব্ধ তা তাকাররাবা। পরিশ্রমের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা হচ্ছে পরিশ্রমে মানুষ তার কাজের বিপদাপদ হতে আল্লাহর জামালের সাথে মুক্তি পায়। অর্থাৎ সে তার কাজের মাঝে এই চিন্তা করে বা উপলব্ধি করে যে সে যেন তার সম্মুখে আল্লাহকে দেখছে। এই প্রসঙ্গেই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। কারণ, তুমি যদিও তাকে না দেখ তিনি অবশ্য তোমাকে দেখছেন।

সাইয়ারিয়া সম্প্রদায়ের মতে জমা ও তাকাররাবা পরস্পর বিরোধী। তারা বলেন: যখন আল্লাহর দান ও মেহেরবানি অতি মাত্রায় বিকাশ লাভ করে তখন শ্রম ও মুজাহাদার কোন দরকার হয় না।

সঠিক নীতি

হজরত আলী হাজবিরী (র) এই নীতির বিরোধিতা করে বলেন: মানুষ যতদিন স্বজ্ঞানে জীবিত থাকে ততদিন যে শ্রম ও মুজাহাদা হতে মুক্তি পেতে পারে না। ফলে সে জমা ও তাকাররাবা অর্থাৎ হেদায়াত ও মাওয়াহাবের কসব ও মুজাহাদা হতে সে দূরে সরে থাকতে সক্ষম না। এই দু'য়ের সম্পর্ক আলো ও সূর্যের সম্পর্কের ন্যায়।

তেমনি সাধনা হেদায়াত হতে শরীয়ত তরিকত হতে এবং পাওয়া সন্ধান করা হতে পৃথক নয়। যদিও সময়ে হেদায়াত অগ্রবর্তী এবং মুজাহাদা পরবর্তী পর্যায়ে হয়ে থাকে। অবশ্য সাধারণ নিয়ম হলো মুজাহাদার পরই হেদায়াতপ্রাপ্তির আশা করা যায়। যে কোন অবস্থায় একে অন্যের পরিপোষক। পরিশ্রম ছাড়া যেমন হেদায়াত যথেষ্ট নয় তদ্রূপ হেদায়াত ব্যতীত শুধু মুজাহাদা দ্বারা কোন কিছু লাভ করা যায় না।

বান্দা চেষ্টা করে, মুজাহাদা করে এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাকে হেদায়াত দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

"যে ব্যক্তি আমার পথে চেষ্টা করে অবশ্য আমি তাকে আমার পথ দেখিয়ে থাকি।"

আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন: "যে ব্যক্তি তার দীনে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তিনি অবশ্যই তাকে সেই পথে পরিচালনা করেন।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র বাণীর প্রথমেই ঘোষণা করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটা আল্লাহর কিতাব তার সম্পূর্ণটাই হেদায়াত। তবে এই হেদায়াত সত্যসন্ধানীদের জন্য।

১১-১২. হুলুলিয়া সম্প্রদায়

হুলুলিয়া দুটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একটির নেতা আবু হালমান দামেশকি। অপরটি ফারেসের প্রতি সম্পর্কযুক্ত। সুফি সম্প্রদায়ের বহু লোক তাদের আল্লাহভক্ত বলে থাকে। তবে শায়খ হাজবিরী তাদের কাফের এবং মরদূদ মনে করেন এবং তাদের উপর লানত বর্ষণ করেন।

সম্প্রদায়ের নামেই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বান্দার রূহ তথা আত্মা আল্লাহর রূহের সাথে মিলিত মিশ্রিত হয়– এটাই তাদের অভিমত। তাদের মতে বান্দার উন্নততর মর্যাদা হচ্ছে, বান্দার রূহ আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে মিলিত মিশ্রিত হয়ে যাওয়া! বৌদ্ধ ধর্মে যাকে নির্বান বলা হয় এটা ঠিক তেমনি।

হজরত আলী হাজবিরী বলেন: আমি আবু হালমান এবং ফারেসকে চিনি না। তবে যে ব্যক্তি তওহিদ বিরোধী কথা বলে তার ধর্মে কোন অংশ নেই। যার ধর্মের মূল ঠিক নয় তার ধর্মের শাখা-প্রশাখা কিরূপে ঠিক হতে পারে। ধর্ম ও তওহিদ যার ঠিক নয় তার কাশফ কেরামত কিরূপে ঠিক হয়?

মানবাত্মা নিত্য ও সৃষ্ট। তা কোনভাবেই অনিত্য, স্রষ্টা এবং প্রস্তুতকারকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অতএব এই জাতীয় সুফিদের সংশ্রব হতে অবশ্য সকলকেই আত্মরক্ষা করে চলতে হবে।

তাসাউফ ও এর পথের বাধা-বিপত্তি

আল্লাহর মারেফাত

আল্লাহর মারেফাতের আবশ্যিকতা

আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করার এবং তার নৈকট্য লাভের প্রথম ও প্রধান বাধা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। কারণ, লোক যদি আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানে অজ্ঞ হয় তাহলে তাঁর বন্দেগি এবং নৈকট্য লাভের পথে চলার তার কোন আগ্রহই থাকবে না। বরং তার প্রতি তাঁর কোন খেয়ালই থাকবে না।

অপরদিকে কোন লোক যদি আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে যদি সেই জ্ঞান সঠিক না হয় তবে সে ইবাদত বন্দেগি করার লক্ষ্যে যে পথই অবলম্বন করে সেই পথও সঠিক হবে না। কাজেই কর্তব্য হলো আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা এবং সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ থাকা। ফলে আল্লাহ সম্পর্কীত জ্ঞান যত সঠিক থাকবে ততই আল্লাহর মারেফাতের জ্ঞান বিশুদ্ধ হবে, মর্যাদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটা সাধারণ জ্ঞানেরও কথা।

আল্লাহ তায়ালা ভ্রান্ত কার্যকর্মীদের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন:

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۞

"তারা আল্লাহর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। ফলে তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত।" (সূরা: আয্-যুমার– ৬৭)

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

لَوْ عَرَفْتُمُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ لَمَشَيْتُمْ عَلَى الْبُحُوْرِ وَلَزَالَتْ بِدُعَائِكُمُ الْجِبَالُ ـ

"তোমরা যদি আল্লাহকে জানার মতো জানতে তাহলে তোমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে চলাচল করতে এবং দোয়া দ্বারা পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারতে।"

যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্যিকারের বান্দা এবং তার প্রতিনিধি হয় তার এমন কোন কারণই থাকতে পারে না যে আল্লাহর কোন সৃষ্টি তার অবাধ্য হয় এবং তার নির্দেশ মোতাবেক না চলে।

মারেফাতের শ্রেণিবিভাগ

আল্লাহর মারেফাত দু' ধরনের এলমী এবং হালী। অর্থাৎ, জ্ঞানগত ও অবস্থাগত।

১. আল্লাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং তাতে কোন প্রকার ভুল ও ভেজাল না থাকা জ্ঞানগত মারেফাত।

২. বান্দার অবস্থা তথা কার্যময় জীবন তার জ্ঞাতগত মারেফাতের আয়নাস্বরূপ এবং প্রতিকৃত হবে এটা অবস্থাগত মারেফাত।

হালী মারেফাত এলমী মারেফাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এটাই মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এলম হাল ছাড়া হতে পারে কিন্তু হাল এলম ব্যতীত হতে পারে না। এ কারণে বলা হয়ে থাকে আরেফ জাহেল নয় এবং জাহেল আরেফ নয়।

মারেফাত অর্জনে হালের গরুত্ব

সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে যে কোন কিছুর পরিচয় লাভের জন্য একমাত্র মাধ্যম এলম। কিন্তু আল্লাহকে জানার জন্য যদি এলম এবং আমলই যথেষ্ট হতো তাহলে প্রতি জ্ঞানবান এবং আলেমই আরেফ হতো। কোনও বেআকল এবং অজ্ঞানী আল্লাহকে পেত না। এই দুটি বিষয়ই আসল ঘটনার বিপরীত।

মূল বিষয় হলো এলম ও আমল মারেফাতের কারণ নয় বরং মাধ্যম। আল্লাহর মারেফাতের একমাত্র উপাসক আল্লাহর দান। তার মেহেরবানি ছাড়া এলম ও আমল উভয়ই অর্থহীন। এই দ্বিবিধ গুণ মিলিত হয়েও মানুষকে হাকিকতের সাথে পরিচিত করতে পারে না।

হজরত আলী (র) বলেন:

عَرَفْتُ اللّٰهَ بِاللّٰهِ وَعَرَفْتُ مَادُوْنَ اللّٰهِ بِنُوْرٍ ـ

"আল্লাহর কৃপায় আমি আল্লাহকে চিনেছি। তিনি ব্যতীত যাবতীয় কিছুর পরিচয় তার নূরের সাহায্যে অবগত হয়েছি।"

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ব্যাপারে বলেন:

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۞

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানকে তোমাদের জন্য প্রিয় বানিয়েছেন এবং ঈমান দ্বারা তোমাদের অন্তরকে সুসজ্জিত করেছেন।" (সূরা: আর-হুজরাত– ৭)

কাফেরদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন:

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ۞

"যদি এইসব কাফেরদের (কেয়ামতের পরও) দুনিয়ায় পাঠান হয় তথাপি তারা পূর্বের ন্যায়ই কাজ করবে।" (সূরা: আল-আনআম– ২৮)

আরও ঘোষণা করেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

"নিশ্চয়ই যারা কাফের তাদের ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা না করুন উভয়ই তাদের জন্য সমান– তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।"
(সূরা: আল-বাকারা– ৬)

তাই আল্লাহর মেহেরবানি ছাড়া এলম ও আমল এবং অন্য কোন দিক থেকে বুঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারও কোন ক্ষমতা নেই যে কাউকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মহানবি ﷺ এর ন্যায় এমন উপদেশদাতা এবং আবু তালেবের ন্যায় এমন বুদ্ধিমান আর কে ছিল? তবে আবু তালেবের ভাগ্য হলো না আল্লাহকে জানা। ফলে বিনা প্রতিবাদে আল্লাহকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রমাণ তালাশ করার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে চিন্তা করা। আর মারেফাতের মূল হলো গায়রুল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

মারেফাত সম্পর্কে বুযুর্গদের অভিমত

মারেফাত সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অভিমত পেশ করেছেন–

১. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বলেন:

اَلْمَعْرِفَةُ اَنْ لَا تَتَعَجَّبَ مِنْ شَىْءٍ ـ

কোন কিছু দেখে বা জেনে বিস্মিত না হওয়ার নামই মারেফাত। কারণ শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কিছু সংঘটিত হলেই মানুষ বিস্মিত হয়। কিন্তু এমন কোন কিছু রয়েছে কি যা করা না করা আল্লাহর সামর্থ্যের বাইরে? ফলে আল্লাহর আরেফ কোন কিছু দেখেই বিস্মিত হন না।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۞

"জমিন ও আসমানের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহর।" (সূরা: আল-বাকারা– ২২৫)

وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞

"তিনি যা কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি শুধু বলেন হয়ে যাও। আর তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।" (সূরা: আল-বাকারা– ১১৭ ও সূরা: আলে-ইমরান– ৪৭)

২. হজরত জুননুন মিসরি বলেন:

حَقِيْقَتُ الْمَعْرِفَةِ اِطِّلَاعُ الْحَقِّ عَنِ الْاَسْرَارِ ـ

"মারিফাতের হাকিকত হচ্ছে, মানুষ ঐ সকল গুপ্ত রহস্য ও হিকমত উপলব্ধি করতে থাকে যা আল্লাহর কাজের মধ্যে লুপ্ত রয়েছে।"

আল্লাহর কোন কাজকেই তিনি হেকমতহীন জ্ঞান করে না। তার ফল এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় কিছু তাঁর কাছে একটি সরিষা পরিমাণের মূল্যও মনে হয় না। তার চিন্তা শুধু থাকে সে যেন আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগির সীমারেখা লজ্ঘন না করে।

৩. হজরত শিবলী (র) বলেন:

اَلْمَعْرِفَةُ دَوَامُ الْحَيْرَةِ ـ

"মারেফাত হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে সর্বদা আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হয়ে থাকা।"

কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা সম্পর্কে হতবুদ্ধি নয়। কারণ এটা স্পষ্ট কুফরী। আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে মানুষের যতটুকু মারেফাত অর্জন হয়, তার আমলও ততটুকু পরিমাণ মনে হবে এবং সে নিজকে দোষী ও শাস্তির উপযুক্ত বলে মনে করবে। এটা তার সার্বক্ষণিক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে যে, কিরূপে সে আরো অধিক এবং আরো উত্তমরূপে স্বীয় প্রভুর ইবাদত করবে।

৪. হজরত আবু ইয়াযিদ (র) বলেন:

اَلْمَعْرِفَةُ اَنْ تَعْرِفَ اَنَّ حَرَكَاتِ الْخَلْقِ وَسُكُنَاتِهِمْ بِاللّٰهِ ـ

"মারেফাতের অর্থ হচ্ছে এটা জানা যে, দুনিয়ার যাবতীয় চলাফেরা ও চুপ থাকা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে।"

তাঁর নির্দেশ ছাড়া কেউই কোন কিছু করতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দের মালিক তিনি। এটা অবগত হওয়ার পর মানুষের মাঝে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এরপর তার আর কোন অভিযোগ থাকে না। সবকিছু হতে পৃথকতা অবলম্বন করত নিজের ফরজ আদায়ে আত্মসমর্পিত থাকে। কেননা পরকালে তার উপর অর্পিত কাজসমূহেরই জবাবদিহি করতে হবে– নিজের অধিকারের নয়।

৫. হজরত মুহম্মদ ইবনে ওয়াসে বলেন:

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ قَلَّ كَلَامُهُ وَدَوَامُ تَحَيُّرِهِ ـ

"যে ব্যক্তি কম কথা বলেন এবং কর্তব্য পালনের চেষ্টায় থাকেন তাকেই আরেফ বলা হয়।"

কারণ মানুষ আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী থাকলে এবং নিজের ফরজসমূহ সম্পর্কে উদাসীন থাকলেই কথাবার্তা বেশি বলে।

৬. হজরত আবু বকর ওয়াসতী বলেন:

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ اِنْقَطَعَ عَنِ الْكُلِّ بَلْ خَرَسَ وَانْقَمَعَ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, সে অন্য সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে বোবায় পরিণত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছে।"

কারণ, স্বয়ং হুজুর ﷺ আল্লাহর নিকট আরজ করেছেন:

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ـ

অথচ তিনি নিজে বলেছেন:

اَنَا اَفْصَحُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ـ

"আমি সমস্ত আরব ও আজম অপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী।"

তাই লোকের এমনকী ক্ষমতা আছে যে, সে আল্লাহর প্রশংসা পরিপূর্ণভাবে করতে পারে?

৭. হজরত আবু হাফস হাদ্দাদ (র) বলেন:

مُذْ عَرَفْتُ اللهَ مَادَخَلَ فِىْ قَلْبِىْ حَقٌّ وَلَا بَاطِلَ –

"যেদিন থেকে আমি আল্লাহকে চিনেছি সেদিন থেকে সত্য মিথ্যার কোন তর্ক-বিতর্ক আমার মনে উদিত হয় নি।"

অর্থাৎ আল্লাহকে চেনার পর হতে আমি তাঁর প্রতি এমনভাবে মনোযোগী হয়েছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকার কাজকর্মের প্রতিই আমার কোন আসক্তি নেই। আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান না থাকলেই মানুষ অন্য বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়। মনে কর তোমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার কাছে এসেছে। তুমি সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তার সাথে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করছ। এখন যদি অন্য কেউ তোমাকে ডাকে বা অন্য কেউ তোমার কাছে আসে তবে কি তুমি তাকে সহ্য করতে পারবে? না, পারবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে সে কখনও অন্য কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহর পথে চলার এবং তার নৈকট্য লাভের পথের প্রধান বাধা যা দূর করার চেষ্টা করা উচিত, তা হলো আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানের অজ্ঞতা। আর তার প্রতিষেধক হচ্ছে বিশুদ্ধ জ্ঞান। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও মহানবি ﷺ এর সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করা। তা ব্যতীত আল্লাহর মারেফাত লাভের আর কোন পথ নেই।

এখন বাকি থাকল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার কৃপায় দৃষ্টি। তার মেহেরবানি ও কৃপা-দৃষ্টি লাভ করার জন্যও পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ –

"আল্লাহ তায়ালা তাকেই হিদায়েত দান করেন যে তার প্রতি আন্তরিকভাবে মনোযোগী হয়।" (সূরা: আর্-রাদ– ২৭)

তওহিদ

তওহিদের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালার মারেফাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিত্তিময় বিষয় হচ্ছে আল্লাহর তওহিদ বা একত্বের সঠিক এবং বিশুদ্ধ ধারণা। আমলের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে যে দ্বিতীয় বস্তু বান্দার সম্মুখে প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলো আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে ধারণার বিশুদ্ধতা। যতক্ষণ পর্যন্ত তার তওহিদের বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ না করবে ততক্ষণ ধরে তার আমল বা ইবাদত বন্দেগিও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে না।

তওহিদের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে যে কোন অবস্থায় জীবনের যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক বা অংশীদার না করা। দুনিয়ার যাবতীয় কিছু এই সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, তাদের স্রষ্টা এবং নির্দেশ দানকারী শুধু আল্লাহ যিনি সর্বজ্ঞান সর্ব শক্তিমান। এর চেয়ে বাস্তবা কথা আর কী হতে পারে যে, যখন আল্লাহ যাবতীয় কিছুকে কারও সাহায্য ছাড়া নাস্তি হতে অস্তিরূপ দিয়েছেন তখন তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে তিনি তার ইবাদতে অন্যকে শরীক করা সহ্য করতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালা বারবার ঘোষণা করেছেন:

اِلٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِدٌ –

"তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য।" (সূরা: আলে-ইমরান– ১৬৩ ও সূরা: আন-নাহাল– ২৩)

আল্লাহ তায়ালা আর ঘোষণা করেন:

اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ –

"নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন।" (সূরা: আন্-নিসা- ৩৭)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

"হে নবিবর! তাদের বলে দিন, উপাস্য একজন।" (সূরা: ইখলাস- ১)

আরও বিস্তারিতভাবে বুঝাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۞

"দুই আল্লাহ গ্রহণ করো না। আল্লাহ তো মাত্র একজন।"
(সূরা: আন্-নাহাল- ৫১)

তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপর প্রকৃত ঈমান আনাই ইসলামের জড় এবং ইসলামের ভিত্তি। যেখানে এই জড় বা ভিত্তি নেই, সেখানে ইসলামের কোন কিছুই থাকতে পারে না। তওহিদ বাকি থাকলেই ইবাদত বন্দেগিতে অলসতা করা হতে বিরত থাকা সম্ভবপর হয়। তওহিদ ছাড়া কোন প্রকার ইবাদত বন্দেগিই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

তওহিদের শ্রেণিবিভাগ

তওহিদ তিন প্রকার।

১. প্রথম প্রকার তওহিদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এটা কখনও পছন্দ করেন না এবং সহ্য করতে পারেন না যে সৃষ্টির কোন কিছু একমাত্র তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ বলে মানে কিংবা তার খোদায়ীতে কাউকে অংশীদার করে। কিংবা তার কাজে কাউকে শরীক করে।

ফলে হাশরের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে সমবেত করা হবে তখন জিজ্ঞেস করা হবে- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (বল) আজ কার বাদশাহী? (সূরা: মুমিন- ১৬)

সমস্ত সৃষ্টি একবাক্যে বলবে- لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

"একমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহর উদ্দেশ্যে।"

২. দ্বিতীয় প্রকার তওহিদ আল্লাহর সৃষ্টির জন্য। তথা আল্লাহ তায়ালা এটাও সহ্য করেন না যে তিনি ব্যতীত তাঁর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ মানে কিংবা তার অংশীদার করে অথবা তার কাজের অংশীদার বলে কেউ বিশ্বাস করে।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۞

"আল্লাহ অংশীবাদী কাউকেও মাফ করবেন না। তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" (সূরা: আন্-নিসা- ১১৬)

সুতরাং জীবনের যে কোন অবস্থায় এবং জীবনের যে কোন মুহূর্তে একই আল্লাহর বান্দা এবং একই আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী থাকতে হবে।

৩. তৃতীয় প্রকার তওহিদ সৃষ্টির স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি তার দৃষ্টিতে সমান। তার সৃষ্টির মধ্যে এমন কারও সাথে কোন সম্পর্ক নেই- যা অন্যের সাথে নেই। প্রতিটি ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে একই ভাবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তার দরবারে যাওয়ার পথে কোন বাধা নেই; কোন বাধা বিপত্তি নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۞

(হে নবি!) আমার বান্দা যদি আমার সম্বন্ধে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে তবে তাকে বলে দাও আমি প্রতি মুহূর্তে তার

নিকটবর্তী হই। প্রার্থনাকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বান শ্রবণ করি এবং উত্তর দিই।

তওহিদের ধারণার সঠিকতায় এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। তার অনুমান এই কাজ দ্বারাই করা যেতে পারে যে তাকে নামাযের অংশ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের দ্বারা দিন রাতে বারবার বলানো হয়- سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ যে কেউই আল্লাহর প্রশংসা করে (এবং তাঁকে ডাকে) তিনি তা শ্রবণ করেন।

তার দরবারে না কোন উকীলের দরকার হয় আর না কোন পরিচয়দানকারীর। আর না তিনি আহ্বানকারীদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করেন যে তিনি কারও আহ্বানে সাড়া দিবেন আর কারও আহ্বানে চুপ করে থাকবেন।

তওহিদ অর্থ

আল্লাহর তওহিদের অর্থ হচ্ছে এই যে, আরিফ (আল্লাহর পরিচয়লাভকারী) এটা উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ হলেন এক বা একক সত্তা। তাঁর কাছে হাজির ও গায়েব, মিলন ও পৃথক, স্থান ও কাল, চলমান ও অচল বলতে কিছুই নেই। তিনি সীমাবদ্ধ নন যে, এগুলো থেকে কোন বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হবে। তাঁর না আছে রূহ আর না আছে দেহ। কারণ রূহের জন্য দেহ এবং দেহের জন্য বিভিন্ন অঙ্গের দরকার। কিন্তু আল্লাহ এ সমস্ত থেকে মুক্ত। তাঁর কোন পিতা নেই, যে তাঁর উপর বল প্রয়োগ করবে। পুত্র নেই যে তাঁকে কোন কাজে বাধ্য করবে। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই যার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের দরকার রয়েছে। তাঁর সত্তা, গুণাবলি, শক্তি এবং ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই- যেখানে তাঁর কোন সাহায্যকারীর দরকার আছে। তাঁর সমস্ত গুণাবলি স্থায়ী। কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন। নির্দেশ কেবল তাঁরই। তাঁর নির্দেশাবলি সঠিক ও হিকমতে পরিপূর্ণ। তিনি ছাড়া সবই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর উপর সৃষ্টির কোন ক্ষমতা চলে না।

লাভ-ক্ষতি, সম্মান-অসম্মান, হায়াত-মউত, নেকী-গুনাহ সমস্তই তাঁর পক্ষ হতে নির্ধারিত। তাই আশা এবং বয়ের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। তিনি সর্বজ্ঞ ও সব খবর রাখেন, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, মেহেরবান ও দয়ালু এবং আর কিছুর উপর শক্তিমান। তিনি যাবতীয় বিপদ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাঁর কোন উদাহরণ নেই।

তওহিদ সম্পর্কে বুযুর্গদের বাণী

হজরত জোনায়েদ (র) তওহিদ সম্পর্কে বলেন:

اَلتَّوْحِيْدُ اِفْرَادُ الْقِدَامِ عَنِ الْحَدَثِ -

তওহিদ হাদেস হতে কাদীমকে (নিত্য হতে অনিত্য) আলাদা করে। আল্লাহ কাদীম আর অন্যান্য সবকিছু হাদেস। অতএব এর অর্থ এই দাঁড়াল যে-না আল্লাহর কোন গুণাবলি কোন সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আরোপ করা যায় আর না কোন সৃষ্টির গুণাবলি (দুর্বলতা) আল্লাহর দিকে সম্পর্কীত করা যায়। সৃষ্ট বস্তু অস্তিত্বে আসার পূর্বেও আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বে আসার পূর্বেও তিনি যেমন কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না তদ্রূপ পরেও কারও মুখাপেক্ষী নন।

যখন তোমাকে অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনতে কারও সাহায্য সহায়তা দরকার হয় নি, তখন তোমাকে প্রতিপালন এবং আবার অস্তিত্বহীন করতে কেন অন্যের সাহায্যের দরকার হবে? তাই বান্দার পক্ষে জায়েয নয় যে কোন হাদেসকে তার সাথে মিলিত মিশ্রিত করা এবং তিনি ব্যতীত কারও কাছে কিছু চাওয়া; অন্য কাউকে চাওয়া, কারও বাধ্য হওয়া কোন মতেই বৈধ নয়।

হজরত হুসাইন ইবনে মানসুর বলেন:

اَوَّلُ قَدَمٍ فِى التَّوْحِيْدِ فَنَاءُ التَّفْرِيْدِ -

"তওহিদের পথের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রতিটি এমন বস্তু ধ্বংস করা যা আল্লাহ ভিন্ন নিজকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।"

কারণ, তা তওহিদকে অস্বীকার করার বস্তু। ফলে তার প্রথম পদক্ষেপ শিরকের 'না'-ই হওয়া উচিত যে ইসলামের কালেমা- لا إله (নেই কেউ উপাস্য) দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

হজরত হাযরামী (র) বলেন:

أُصُوْلُنَا فِى التَّوْحِيْدِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ - رَفْعُ الْحَدَثِ وَاِثْبَاتُ الْقِدَامِ وَهَجْرُ الْاَوْطَانِ وَمُفَارَقَةُ الْاِخْوَانِ وَنِسْيَانُ مَاعَلِمَ وَجَهِلَ

আমাদের মতে তওহিদের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়বস্তুর ওপর।

১. হদস (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে অস্বীকার);

২. কাদীমের (আল্লাহ) স্বীকারোক্তি;

৩. আওতান তথা কামনা বাসনা পরিত্যাগ করা কারণ এটা মানুষের নফসকে আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে নেয়া যায়।

৪. ভাইদের হতে একাকিত্ব গ্রহণ। অর্থাৎ আল্লাহ হতে অলস এমন লোকদের থেকে একাকিত্ব গ্রহণ করা এবং তাদের হতে বেপরোয়া হয়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

৫. জানা অজানাকে ভুলে যাওয়া।

অর্থাৎ পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছুকে মূল্যহীন ভাবো। তাই উক্ত বিষয়বস্তু কম ও বেশি দ্বারাই বুঝা যায় যে কে কতটা তওহিদবাদী এবং আল্লাহর সাথে কার কতটা সম্পর্ক।

ঈমান

ঈমানের বিশেষত্ব

আল্লাহর মারেফাত ও তাঁর তওহিদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সত্ত্বেও যা আল্লাহর পথে চলার অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় তা হলো ঈমান না থাকা অথবা অসম্পূর্ণ বা দুর্বল ঈমান। যতদিন ধরে মানুষ উক্ত মারেফাত এবং তওহিদের সাথে সত্যিকারের ঈমান গ্রহণ না করে ততদিন তার উক্ত জ্ঞান কোন ফল দেয় না। আর প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ঈমানের অভাবে মানুষের কোন কাজই যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না।

এসব লোককে লক্ষ করেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ۞

"হে ঈমানদারগণ! সরলান্তঃকরণে ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি এবং যে কিতাব আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন।" (সূরা: আলে-ইমরান- ১৩৬)

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন:

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۞

"এ গ্রাম্য আরব বলে আমরা ঈমান এনেছি ও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাকে বলে দিন ঈমান আন নি বরং বল যে মুখে মেনে নিয়েছি। কারণ এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান স্থান পায় নি।" (সূরা: আল-হুজরাত- ১৪)

কারণ সত্যিকারের ঈমান গ্রহণ করার পর লোকের প্রতিটি কাজে ঈমানের আভা ফুটে ওঠে। আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন:

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ –

"ঈমান এমন বস্তু যে তুমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।"

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ –

"কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি তার অনুগত না হয় যা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

ঈমানের অর্থ

অভিধান মতেও ঈমানের অর্থ কোন কিছুকে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করা এবং ঐ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং নৈকট্য লাভ করার জন্য ঈমানই ভিত্তি। ঈমান ছাড়া বান্দার কোন ইবাদত, তার কোন কাজ এবং জান বা মালজাতীয় যতবড় উৎসর্গই করুক না কেন তা কবুল হবে না।

ঈমানের জন্য কি আনুগত্য শর্ত

ফকীহদের মতো সুফিদের মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে ঈমানের জন্য আনুগত্য শর্ত না শুধু মুখে স্বীকার এবং অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট!

একটি সম্প্রদায় যাদের মাঝে ফকীহ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং সুফিদের মধ্যে ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ, বিশরে হাফী, খাইরুন নাসাজ, আবু হামযা এবং আবু মুহম্মদ ইবনে হোসেন হারীরি আছেন তাঁরা বলেন– ঈমান অর্থ মুখে স্বীকার, অন্তরে বিশ্বাস আর তদানুযায়ী কাজ করা।

অন্য সম্প্রদায় যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহম্মদ, আবু ইউসুফ, দাউদ তায়ী এবং সুফিদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে আদহাম, জুননূন মিসরি, আবু ইয়াযীদ বোস্তামি, সোলায়মান দুররানী, হারেস মুহাসেবি, জোনায়েদ বাগদাদি, সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরি, শফীক বলখি বলেন মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস করার নামই ঈমান।

সঠিক মতবাদ

হজরত আলী হাজবিরী বলেন: উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু শব্দের কম-বেশিতে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। আহলে মারেফাত ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত বলে ঈমানের একটি আসল আর একটি শাখা রয়েছে। ঈমানের আসল মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা। বাহ্য আসল আর ঈমানের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা শাখা।

আরববাসীর নিয়ম হলো কোন বিষয়ের শাখাকে পৃথকভাবে নয় বরং আসল নামেই ডাকা। কাজেই ঈমানের বর্ণনা আসার পর আমল ও আনুগত্য পৃথকভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দরকার থাকে না। এই কথা দিনের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল যে যে ব্যক্তির অন্তরে যতটা পরিমাণ আল্লাহর ভালবাসা থাকবে সে ততটাই আল্লাহর অনুজ্ঞ এবং বাধ্য থাকবে। কেননা, মহব্বতের চিহ্ন আনুগত্য প্রকাশ করা।

যদি কারও অন্তরে আল্লাহর স্থান হয়, চোখ আল্লাহকে দর্শনকারী হয় তাহলে সে কোনভাবেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। যার কলব আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বেপরোয়া সে যদি আল্লাহর মারেফাতের দাবি করে তাহলে সে ডাহা মিথ্যুক। যে অন্তর আল্লাহকে চিনেছে সেই অন্তর আল্লাহর মহব্বতের স্থানে পরিণত হয়। সে অন্তর আল্লাহর নির্দেশকে অধিক সম্মানের সাথে পালন করে।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শনই হচ্ছে অন্তর তওহিদের আলোকে আলোকিত হয়, চোখ দ্বারা যেদিক তাকায় সে দিকেই আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু দেখে উপদেশ গ্রহণ করে; কান তাঁরই কথা শোনে। মুখ তাঁরই গুণ কীর্তন করে ; সত্য বলে, পেট হারাম দ্বারা পূর্তি করে না, সারা দেহ তার অবাধ্যতা হতে

পবিত্র থাকে। অর্থাৎ মানুষের সকল কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আদেশ পালনে উন্মুখ হয়ে থাকার নামই প্রকৃত ঈমান।

কারণ মারেফাতের বাদশাহর (ঈমান) কোন অন্তরে বিজয়ী হওয়ার অর্থই হলো সমস্ত কুস্বভাব অসচ্চরিত্রকে পরাভূত করা। যেখানে ঈমান রয়েছে সেখানে অসাধুতা থাকতে পারে না। দিনের আলো কেন? অন্ধকার দূর করার জন্যই তো! এই বিষয়কে কুরআন উল্লেখ করেছে:

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا ۝

"যখন কোন বাদশাহ কোন গ্রামে প্রবেশ করেন তখন সেখানকার পূর্বের সবকিছু বিধ্বস্ত করে ফেলেন।" (সূরা: আন্-নামাল- ৩৪)

কাজেই এটা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে যে, মারেফাতের বাদশাহ (ঈমান) যখন কোন বাড়িতে প্রবেশ করে তখন সেখানে তার অপছন্দ বস্তু থাকতে দেন। বিজয়ী বেশে ঈমানের অন্তরে প্রবেশ করার পর সে যা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা করে এবং যা কিছুই করে সবই আল্লাহর আদেশের গণ্ডির মধ্যে হয়ে থাকে।

হজরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন, তাওয়াক্কুলও ঈমানের উপাদান। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝

"যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহর প্রতি ভরসা কর।"
(সূরা: আর-মায়িদাহ- ২৩)

অতএব যে ব্যক্তি মুমিন সে তার প্রতি কাজে ও কথায় অবশ্য আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকে কোন কাজেই অন্যকে সাহায্যকারী মনে করে না।

তাহারাত বা পবিত্রতা

গুরুত্ব

ঈমানের পর তাহারাত বান্দার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর ইবাদতের পথের ঘাঁটি অতিক্রম করার এবং তার নৈকট্য লাভ করার জন্য পবিত্রতা একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। পবিত্রতা ছাড়া নামায হয় না। নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।"

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

يُطِيْلُ السَّفَرَ، اَشْعَثُ، اِغْبَرَّ، يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ؟

এক ব্যক্তি খুবই চিন্তিত ধূলিমিশ্রিত অবস্থায় বহু দূরের পথ অতিক্রম করে (হজ্জ করতে) আসে এবং আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে- হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং সে হারামের দ্বারাই প্রতিপালিত। এমন ব্যক্তির প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কীভাবে কবুল হতে পারে?

পবিত্রতার শ্রেণীবিভাগ

আল্লাহ– আল্লাহর রাসূলের বাণী অনুযায়ী পবিত্রতা দু' প্রকার– জাহেরী এবং বাতেনী। আর এই দ্বিবিধ পবিত্রতাই অত্যাবশ্যকীয়। যেমন জাহেরী বা বাহ্য পবিত্রতা ছাড়া নামায দুরস্ত হয় না তেমনি বাতেনী পবিত্রতা ব্যতীত বাতেন পবিত্র হয় না।। বরং তা ব্যতীত না আল্লাহর মারেফাত লাভ হয় আর না আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সঠিক হয়।

তাছাড়া যেভাবে অপবিত্র ও ব্যবহৃত পানি দ্বারা উজু শুদ্ধ হয় না; অজুর জন্য যেমন স্বাভাবিক পানি, পবিত্র এবং পরিষ্কার পানির প্রয়োজন তেমনি বাতেন পবিত্র করার জন্য স্বাভাবিক তওহিদের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া সম্ভবপর নয়। যদি এই বিশ্বাস সঠিক এবং মৌলিক না হয় এবং তাতে যদি কোন কিছুর মিলন মিশ্রণ থাকে তাহলে বাতেনী পবিত্রতা কোনভাবেই অর্জন হতে পারে না।

কাজেই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য প্রয়োজন জাহেরী তাহারাতের প্রতি খেয়াল রাখা এবং বাতেনী তাহারাত দ্বারা বাতেন সুসজ্জিত করে রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ –

"ধর্মকে বিশুদ্ধ করে আল্লাহকে ডাকো।"

মহানবি ﷺ জাহেরী তাহারাত সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন:

دُمْ عَلَى الْوُضُوْءِ يُحِبُّكَ حَافِظَاكَ –

"সদা-সর্বদা অজুর সাথে থাক। তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাদ্বয় তোমাদের ভালোবাসবেন।"

বাতেনী তাহারাতের জন্য স্বয়ং মহানবি ﷺ দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ –

"হে আল্লাহ! কপটতা হতে আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখ।"

বুযুর্গ পীর ও মুরশিদগণও জাহেরী বাতেনী উভয় ধরনের পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেন যে, আল্লাহর দরবারে যাওয়ার জন্য যখন কেউ জাহেরী পবিত্র হয়– তখন তার কর্তব্য হলো বাতেনী পবিত্রতাও অর্জন করে সেই পথে অগ্রসর হওয়া।

জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা পরস্পর সামঞ্জস্যময় করা কর্তব্য। এসতেঞ্জা করার পর তোমার আবশ্যক যেভাবে জাহেরী দেহকে অপবিত্রতা হতে পাক পবিত্র কর– তদ্রূপ তোমার বাতেনকে অন্যের সাথে ভালোবাসা রাখা হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা কর। যখন তোমার হাত ধৌত কর তখন তোমার কর্তব্য অন্তরকেও দুনিয়ার ভালবাসা হতে ধৌত করা। যখন কুলি কর তখন অনর্থক কথা বলা হতে মুখকে পবিত্র কর। যখন নাক পরিষ্কার কর তখন কাম প্রবৃত্তিকে তোমার উপর হারাম কর। যখন মুখমণ্ডল পরিষ্কার করার কালে যাবতীয় কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখার নিয়ত কর এবং পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কর। যখন মাথা মাসহ কর তখন সর্বপ্রকার চিন্তা আল্লাহর অনুগত কর। আবার যখন পা ধৌত কর তখন আল্লাহর পথে চলা ছাড়া অন্যান্য পথে চলা হতে পা বিরত রাখ।

এভাবে উজু করতে পারলেই তোমার জাহেরী বাতেনী পবিত্রতা অর্জন হবে।

জাহেরী তাহারাত

শরীর অপবিত্র হলে গোসল করলে জাহেরী পবিত্রতা অর্জন হয়। সাধারণভাবে উজু করলেই পবিত্র হয়ে যায়। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানি ব্যবহার করলে রোগ বাড়তে পারে এই অবস্থায় তায়াম্মুম করতে হয়।

তাহারাত সম্বন্ধে সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা হলে করণীয়

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের নিকট কেউ জানতে চাইল, নামায আদায় করার সময় আমি ভেজা অনুভব করি। তখন কি নামায ছেড়ে দিয়ে পুনরায় উজু করব?

জবাবে তিনি বললেন:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهٗ سَمِعَهٗ رَجُلٌ يَسْئَلُهٗ فَقَالَ اِنِّىْ لَاَ جِدُ الْبَلَلَ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَاَنْصَرِفُ؟ فَقَالَ لَهٗ سَعِيْدٌ لَوْ سَالَ عَلٰى فَخِذِىْ مَاانْصَرَفْتُ حَتّٰى اَقْضِىَ صَلٰوتِىْ —

ভেজা বের হয়ে যদি আমার উরু দেশও প্রবাহিত হয় তথাপি আমি নামায শেষ না করে স্থান ত্যাগ করব না।

যেহেতু অগ্রপশ্চাৎ হতে কিছু বের হলে সর্বসম্মতিক্রমে উজু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ইমাম বাগভি হজরত আবু সাঈদের কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেছেন– প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে ভেজা কিছু বের হয়েছে এই সন্দেহ হলে কোন ভাবেই উজু নষ্ট হয় না। এই সন্দেহের কারণে নামায ছেড়ে দিতে নেই বরং নামায সমাপ্ত করবে। কিন্তু যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে কিছু বের হয়েছে তবে পুনরায় উজু করতে হবে। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

হজরত আবু আলী রুদবারী কিছুদিন এরূপ সন্দেহ প্রবণতায় পতিত হয়ে খুব কষ্ট ভোগ করেছেন।

উজু করার পর তার মনে হতো আমার উজু হয় নি। পুনরায় উজু করতেন। আবার সন্দেহ হতো আবার উজু করতেন।

তিনি বলেন– একদিন ফজরের সময় নদীর তীরে গিয়ে উজু করলাম। মনে হলো উজু হয় নি। এভাবে কয়েকবার উজু করার পর লক্ষ করে দেখলাম, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। আমি এটা দেখে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললাম العافية، العافية হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই অবস্থা হতে মুক্তি দাও। উত্তর এলো– اَلْعَافِيَةُ فِى الْعِلْمِ এলমের মধ্যেই পরিত্রাণ

নিহিত। অর্থাৎ যদি পরিত্রাণ চাও তাহলে ওয়াসওয়াসা ছেড়ে এলম মোতাবেক কাজ কর। তুমি এলম মোতাবেক যখন পবিত্রতা অর্জন করেছ তখন তাতেই সুদৃঢ় থাক। সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করো না।

বাতেনী তাহারাত

বাহ্য পবিত্রতা পানি দ্বারা আর আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা তওবা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অর্জিত হয়। তওবা সম্বন্ধে পরে বর্ণনা করব।

চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে এতটা জেনে রাখতে হবে যে এই দুনিয়া গাদ্দার এবং অকৃতজ্ঞ। এটা বিপদে পরিপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্থান; এর যা কিছু ধ্বংসশীল। কাজেই তার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করা জ্ঞানহীনতার পরিচয়। পৃথিবী হতে অন্তরকে খালি করে ঐ মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে যাঁর দান ও অনুগ্রহ অসীম অনন্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۞

"ভালোভাবে জেনে রেখো যে তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।"(সূরা: আল-আনফাল– ২৮)

আরও এরশাদ করেছেন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۞

"এই দুনিয়ার সব কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে কিন্তু কেবল তোমার মহামান্বিত ও মহা সম্মানিত প্রভুই অবশিষ্ট থাকবেন।"

(সূরা: আর্-রহমান– ২৬-২৭)

আরও ঘোষণা করেছেন:

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

"যদি তুমি তোমার প্রভুর নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তা গণনা করতে সক্ষম হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"
(সূরা: আন্-নাহাল- ১৮)

কিন্তু চিন্তা-ভাবনা এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ কৃচ্ছ্র সাধনা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। সকল প্রকার সাধনার মধ্যে কষ্টকর সাধনা হলো শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলা এবং প্রতিটি অবস্থায় এবং কাজে ও কথায় নির্দোষ পন্থা অবলম্বন করা।

বাতেনী তাহারাতে শরীয়তের আদবের গুরুত্ব

মনে রেখো যে ব্যক্তি বাহ্য শরীয়তের আদব এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ যত বেশি পরিমাণে রক্ষা করে চলবে আল্লাহর প্রতি তার ততই মনোযোগ, বাতেনী পবিত্রতা এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাবে। বর্ণিত আছে, হজরত আবু তাহের হরমী একাদিক্রমে চল্লিশ বছর অবধি কাবা গৃহের খেদমত করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও মক্কার সীমানার মধ্যে উজু করেন নি। তিনি বলতেন- যে পবিত্র ভূমিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করেছেন- সেখানে আমি অজুর পাপ মিশ্রিত পানি কীভাবে ফেলতে পারি? কাজেই তিনি প্রত্যেকবার উজু করার সময় হরম শরীফের সীমানার বাইরে চলে যেতেন।

হজরত ইবরাহীম খওয়াস (র) রে-র মসজিদে অবস্থান করতেন। একবার তিনি পেটের পীড়ায় ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। প্রত্যেকবার পায়খানা করার পর গোসল করতেন। জীবনের শেষদিন তিনি আনুমানিক ষাটবার গোসল করেন। ঠাণ্ডা লেগে তিনি সেদিনই মৃত্যুবরণ করেন। তথাপি তিনি পছন্দ করেন নি যে পায়খানা করার পর সমস্ত দেহ ধৌত না করে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করেন।

হজরত আবু বকর শিবলী (র) বলেন, আমি এক মুহূর্তের জন্যও উজুহীন অবস্থায় থাকি নি এবং অজুর আদবও পরিত্যাগ করি নি। এরপর আমার বাতেনে এক প্রকার নসিহতের সৃষ্টি হলো।

তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন উজু করে মসজিদে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন- হে আবু বকর! তুমি তো তোমার বাহ্য দিক পবিত্রতা দ্বারা খুব সজ্জিত করেছ। অথচ তোমার বাতেনের পবিত্রতা কোথায় গেল?

তিনি বুঝতে পারলেন- তিনি গৃহের কোন বস্তুর চিন্তা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যাবর্তন করে ঘরের সবকিছু আল্লাহর ওয়াস্তে দান করলেন। নামাযের জন্য যেসব কাপড়ের প্রয়োজন হয় তা ছাড়া অন্য কোন কিছুই তার ছিল না। এই অবস্থায় এক বছর থাকার পর তিনি হজরত জোনায়েদ (র) এর কাছে চলে যান।

হজরত জোনায়েদ (র) তাকে বললেন: হে আবু বকর! তুমি যে পবিত্রতা হাসিল করেছ তা তোমার জন্য খুবই উপকারে পরিণত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ তিনি তোমাকে পবিত্র রাখবেন।

এরপর আমি আর কখনও অপবিত্র অবস্থায় থাকি নি। বরং সবসময়ই আমি উজুর সাথে পবিত্র অবস্থায় থেকেছি।

তওবা

গুরুত্ব

তওবার শাব্দিক অর্থ হলো আল্লাহর ভয়ে তার নাফরমানী করা হতে লজ্জিত এবং পাপ কর্ম হতে বিরত থেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তওবা করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ ۞

"হে মুমিনগণ! নাফরমানীর পথ বর্জন করে সরলান্তকরণে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। হয়তো আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতবাসী করবেন।" (সূরা: তাহরীম– ৮)

অপর আয়াতে এরশাদ করেছেন:

تُوْبُوْۤا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

"আল্লাহর দিকে সকলে প্রত্যাবর্তন কর। তাহলে আশা করা যায় মুক্তিলাভ করবে।" (সূরা: আন্-নূর– ৩১)

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

مَامِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ شَابٍّ تَائِبٍ —

"যৌবনে তওবাকারীর মতো প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোন কিছুই নেই।"

আরও এরশাদ করেছেন: "তওবা অর্থ নিজের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া।"

তওবার শর্তাবলি

তওবার শর্ত তিনটি–

১. নাফরমানী ও পাপের দরুন পরিতাপ এবং লজ্জা প্রকাশ করা।

২. নাফরমানী ও পাপ কাজ সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করা।

৩. তওবা করার পর পুনরায় পাপ না করার জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং তওবায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা।

এ তিনটি বিষয়ই লজ্জিত হওয়ার মধ্যে পরিগণিত। এর মধ্য হতে কোন একটিকেও বাদ দিলে যথার্থ তওবা হয় না। তাছাড়া তিনটি কারণে লজ্জার সৃষ্টি হয়।

ক. আল্লাহর পাকড়াও এবং তার আজাবের ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়।

খ. তাঁর নেয়ামত ও পুরস্কার পাওয়ার সন্ধান এবং নাফরমানী করার দরুন তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়।

গ. আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া যে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং একদিন কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে।

মানুষ যদি তার খারাপ কাজ এবং পাপ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার অসীম অনুগ্রহে তার জন্য তওবার পথ সমতল এবং সহজ করে দেন।

তওবাকারীদের শ্রেণিবিভাগ

তওবাকারী তিন প্রকার তায়েব, আনাব ও আওয়াব। যে ব্যক্তি অন্যায় অপরাধ কর্ম এবং আল্লাহর নিষেধিত কাজ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে সে তায়েব (تائب)। এটা তওবার প্রাথমিক স্তর এবং সাধারণ লোকের তওবা।

যে ব্যক্তি সগীরা গুনাহ এবং অন্যায় চিন্তা ও ধারণা করা হতে বিরত থেকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে সে আনিব (انيب)।

আর যে ব্যক্তি আপন সত্তা ও অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে আল্লাহতে বিলীন হয়ে যায় সে আওয়াব (اوّاب)।

হজরত জুননূন মিসরি বলেন:

تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِ مِنَ الْغَفْلَةِ ـ

"সাধারণ লোকের তওবাহ পাপ কর্ম হতে আর বিশিষ্ট লোকের তওবাহ অলসতা থেকে।"

তিনি আরও বলেন:

اَلتَّوْبَةُ تَوْبَتَانِ، تَوْبَةُ الْاِنَابَةِ وَتَوْبَةُ الْاِسْتِحْيَاءِ فَتَوْبَةُ الْاِنَابَةِ اَنْ يَّتُوْبَ الْعَبْدُ خَوْفًا مِنْ عُقُوْبَةٍ وَتَوْبَةُ الْاِسْتِحْيَاءِ اَنْ يَّتُوْبَ حَيَاءً مِّنْ كَرَمِهٖ ـ

তওবা দু' প্রকার:

১. আনাবাত ও

২. এসতিহইয়া।

আল্লাহর ভয়ে তওবা করা আনাবাত। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তওবাহ করা এসতিহইয়া।

পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তির তওবা

কোন ব্যক্তি যদি কয়েক প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত থাকে তবে তার জন্য সব পাপ কর্ম পরিত্যাগ করতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তওবা করা থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না। বরং যতটা পাপ থেকে তওবা করতে পারে ততটা হতেই তওবা করবে। তাতেই সে পুণ্য লাভ করবে এবং তার বরকতে অন্যান্য পাপ কাজ কর্ম হতে বিরত থাকার সামর্থ্য লাভ করবে। এ সম্পর্কে এতটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে পাপ করলেই কেবল পাপ হয় না বরং তার আলোচনা করলেও পাপ হয়।

তওবা নষ্ট হওয়ার ভয়

তওবা করার পর তওবাতে ঠিক থাকতে পারবে না এই অজুহাতে কখনও তওবা করা হতে বিরত থাকবে না। যতদিন সে পাপ করা হতে বিরত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। তওবার শর্ত হলো পুনরায় পাপ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হওয়া। প্রথম দিকে তওবাকারীকে দেখা যায় তওবা করার পরও সে ঐ কাজ করে যা হতে সে তওবা করেছিল। এই অবস্থায় যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবার সে কাজ না করার জন্য দৃঢ়তার সাথে তওবাহ করবে।

একজন বুযুর্গ বলেন, কোন একটি পাপ কাজ না করার জন্য আমি তওবা করি। অথচ পুনরায় সেই পাপ কাজ করি। এভাবে আমি সত্তরবার তওবা করি এবং উক্ত পাপ কাজ করি। একাত্তর বারের বার তওবা করার পর আর আমি সেই পাপ করি নি। তওবাকারীদের জন্য সর্বক্ষণ আল্লাহর দরোজা খোলা থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

"(হে নবি!) আমার বাণী আমার বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিন যে আমার যে বান্দা পাপ ও নাফরমানী করার কোন সীমা রাখে নি সে যেন আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ না হয়। আল্লাহ (তওবা করলে) সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা: আয্-যুমার– ৫৩)

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন, আমি সর্বপ্রথম হজরত আবু ওসমান হীরির কাছে তওবা করি। কিন্তু কয়েকদিন পরই আমি আবার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এমনকি পীরের নিকট যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিলাম। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলে আমি পালিয়ে যেতাম।

ঘটনাক্রমে একদিন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি স্নেহ ভরে আমাকে বললেন– বৎস। শত্রুর সাথে মেলামেশা করো না। শত্রু কামনা করে তোমার ক্ষতিসাধন হোক ও তুমি খারাপ হতে খারাপ হয়ে যাও। তোমাকে ভালো কাজ করতে দেখলে সে কখনও সন্তুষ্ট হয় না।

তুমি আমার কাছে আস। আমি তোমার বিপদাপদে সাহায্য করব। তুমিও তোমার শত্রুদের শত্রুতা হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

হজরত জোনায়েদ বলেন, এরপরই আমি দৃঢ়তার সাথে তওবা করি এবং আল্লাহ আমাকে পাপ কর্ম হতে বিরত থাকায় সাহায্য করেন।

নামায

নামাযের গুরুত্ব

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ অসংখ্যবার এরশাদ করেছেন:

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۞

"নামায আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা: আল্-বাকারা– ১১০; সূরা: হাজ্জ– ৭৮; সূরা: আন্-নূর– ৫৬, সূরা: মুয্যাম্মিল– ২০)

আরও ঘোষণা করেছেন:

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۞

"স্বীয় পরিবারের লোকদের নামায পড়তে নির্দেশ দাও এবং নিজেও নামাযে আদায় করতে থাক।" (সূরা: ত্ব-হা– ১৩২)

মহানবি ﷺ নামাযকে মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ ـ

হজরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিন ও কাফিরদের মাঝে পার্থক্যকারী বস্তু নামায ত্যাগ করা। (সহীহ মুসলিম)

তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে যে দুটো ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন তার একটি নামায। তিনি এরশাদ করেছেন: "আমার পরে তোমরা নামায ও গোলামদের হক আদায় করবে।"

নামাযের অর্থ

নামাযের শাব্দিক অর্থ যিকর এবং বাধ্যগত হওয়া। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা (আ)-কে এরশাদ করেছেন:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۞

"আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর।" (সূরা: ত্বয়াহা- ১৪)

আর যারা নামাযের মধ্যে অলসতা করে এবং উদাসীন থাকে তাদের ব্যাপারে এরশাদ করেছেন:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞

"যেসব নামাযী তাদের নামাযে অমনোযোগী তারা ধ্বংস হবে।" (সূরা: মাউন- ৪-৫)

এটাতো প্রকাশ্য কথা যে যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েও তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন থাকে তাদের সম্বন্ধে বলার আর কী থাকতে পারে?

নামাযের শর্ত এবং নীতি

ধর্মের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে নামায অন্যতম। সময়মতো এবং নির্ধারিত রাকআত সহকারে নামায ফরজ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۞

"সময়মতো নামায আদায় করা মুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা: আন্-নিসা- ১০৩)

তাছাড়াও নামাযের কিছু শর্ত রয়েছে যা আদায় করা অত্যাবশ্যক।

প্রথম শর্ত পবিত্রতা:

১. দৈহিক পবিত্রতা নাপাকী দূর করা এবং বাতেনী তাহারাত, নফসের কামনার গোলামী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের মহব্বত পরিত্যাগ করা।

২. বাহ্য পবিত্রতা তথা কাপড় পবিত্র হওয়া আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা তথা হালাল পয়সার কাপড় ক্রয় করা।

৩. স্থান পবিত্র হওয়া জাহেরী আর ঐ স্থান অন্যায় ও জবর দখল না করা বাতেনী পবিত্রতা।

দ্বিতীয় শর্ত কেবলামুখী হওয়া: কেবলার দিকে মুখ করা যাহেরী আর আরশে এলাহীর প্রতি মনোনিবেশ করা বাতেনী পবিত্রতা।

তৃতীয় শর্ত দাঁড়িয়ে নামায পড়া: দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি থাকলে এটা জাহেরী আর আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া বাতেনী রূপ।

চতুর্থ শর্ত নিয়ত করা: জাহেরী রূপ মুখে নিয়ত করা, বাতেনী রূপ আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিশুদ্ধ নিয়ত করা।

পঞ্চম শর্ত তাকবীর বলা: জাহেরী রূপ মুখে আল্লাহু আকবার বলা আর বাতেনী রূপ আল্লাহর পরাক্রমশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করে কেঁপে উঠা।

তারপর ধীরে ধীরে কেরাত পাঠ করবে, বিনম্রভাবে রুকূ সেজদা করবে এবং এভাবে নামায সম্পাদন করবে।

মহানবি ﷺ ও বুযুর্গদের নামায

মহানবি ﷺ এর নামায সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَفِىْ جَوْفِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ -

"তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন তার বক্ষদেশ টগবগ করত যেমন রান্না করার কালে তরকারী টগবগ করে।"

হজরত আলী (ক) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তার দেহ কম্পবান হতে থাকত।

হজরত হাতেম আসেমকে তার নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন- যখন নামাযের সময় হয় তখন আমি জাহেরী ও বাতেনী উজু করি। পানি দ্বারা জাহেরী উজু আর বাতেনী উজু তওবাহ দিয়ে করি। যখন মসজিদে উপস্থিত হই তখন কাবা গৃহ আমার সম্মুখে, বেহেশত ডানে,

দোযখ বামে এবং পুলসিরাতের উপর আমি আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাই। তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে মালাকুল মউত আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। সম্মানের সাথে তাকবীর বলি, আদবের সাথে দাঁড়াই মর্যাদার সাথে কেরাত পাঠ করি। বিনয়ের সাথে রুকূ সেজদা করি ও বসি এবং কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম ফিরাই।

নামাযের হাকিকত

সুফিদের একটি সম্প্রদায়ের মতে নামায হুযুরীর উপকরণ। অপর একটি দলের মতে গায়বতের উপকরণ।

কিন্তু হজরত আলী হাজবিরী বলেন: নামায এক ধরনের আদেশ যা হুজুর বা গায়বাতের উপকরণ হতে পারে না। কারণ আদেশ– যা কোন কিছুর উপকরণ হতে পারে না। হুজুর কেবল হাজিরী হয় আর গায়বতে হয় অবিদ্যমানতা। নামায তাদের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। নামায আদেশ পালন করার নাম। নামায আদেশ পালন করার বারবার পুনরাবৃত্তি যাতে মানুষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথপ্রাপ্ত হয়। বান্দার নামাযের অবস্থা দ্বারাই মূলত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং তার কাছে মর্যাদার স্তর প্রকাশ পায়।

কোন কোন পীর সাহেব তার মুরিদদের দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টায় শত রাকআত নামায আদায় করার আদেশ দিতেন। যেন নামায পড়া তার অভ্যাসে পরিণত হয় আর সে যেন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে অলসতা করা থেকে নিরাপদ থাকে।

নামাযের প্রতি মহানবি ﷺ এর কতটা মহব্বত ছিল তা তাঁর এই কথায়ই প্রকাশ পায় যে তিনি ঘোষণা করেছেন:

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ ـ

"নামাযের মাঝেই আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।"

নামাযের সময় হলেই মহানবি ﷺ হজরত বেলালকে নির্দেশ দিতেন:

اَرِحْنَا يَابِلَالُ بِالصَّلٰوةِ ـ

"হে বেলাল! নামাযের জন্য আযান দিয়ে আমাকে শান্তি দাও।"

মহানবি ﷺ যখন মেরাজের রাতে আল্লাহর দরবারে উপনীত হন এবং তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হন তখন তাঁর যাবতীয় মায়ার বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়। স্বাভাবিক শক্তি রহিত হয়ে যায়, আল্লাহর রহস্য তাঁর নিকট উন্মুক্ত হয়ে দেখা দেয় এবং আল্লাহর দর্শন লাভে অভিভূত হয়ে পড়েন। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরজ করেন: হে রব্বুল ইজ্জত! আমাকে আর বিপদাপদপূর্ণ দুনিয়াতে পাঠিয়ো না। পার্থিব স্নেহ-মমতার ডোরে আর বাধিও না!

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন: তোমাকে প্রত্যাবর্তন করাই আমার ফয়সালা। দুনিয়ায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করাই তোমার কাজ। যাও; সেখানে আমার শরীয়ত প্রতিষ্ঠা কর। এখানে আমি যা কিছু তোমাকে দান করি নি পৃথিবীতে নামাযের মধ্যে আমি তা তোমাকে দান করব।

এ কারণেই এই পৃথিবীতে আসার পর যখন তার অন্তর সেই মহান জগতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত তখনই তিনি হজরত বেলালকে বলতেন, হে বেলাল! নামাযের আজান দিয়ে আমাকে শান্তি পৌঁছাও। ফলে এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মেরাজের রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের নির্দেশ নিয়ে এভাবে নবিবর শান্ত হৃদয়ে ধরার বুকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

হজরত হুসাইন ইবনে মনসুর (র) ফরয নামায ছাড়া দিন-রাতে চারশত রাকআত নফল নামায আদায় করতেন। কোন ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি যে আদায় আছেন তখন আর এত কষ্ট কেন করেন?

তিনি উত্তর দিলেন: ফানার অবস্থায় বন্ধুর কষ্ট কোন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। যখন অন্তর গাঢ় হয় তখন বন্ধুর নির্দেশ বন্ধুর পক্ষে সহজতর হয়। দেখ, অলসতার নাম আল্লাহপ্রাপ্তি নয় আর লোভকে অনুসন্ধান নামে আখ্যায়িত করো না।

হজরত জোনায়েদ (র) বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনকালের মতো ইবাদত বন্দেগি করতেন। মুরিদগণ বলতেন, হজরত! এখন তো আপনি অতিশয় দুর্বল হয়ে গেছেন। নফল ইবাদত বন্দেগি কিছুটা কমিয়ে দিন।

তিনি উত্তর দিলেন: যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন এই শেষ বয়সে কি তা ছেড়ে দিতে পারি?

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন: শৈশবকালে আমি একজন আবেদা মহিলাকে দেখেছি যে তাঁর নামাযরত অবস্থায় একটি বিচ্ছু তাকে চল্লিশবার দংশন করে। অথচ তিনি এক মুহূর্তের জন্যও একটু নড়াচড়া করলেন না।

তাঁর নামায শেষ হওয়ার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, আপনি কেন বিচ্ছুটিকে দূরে ফেলে দিলেন না?

তিনি বললেন: বৎস! তুমি ছেলে মানুষ। আল্লাহর কাজ করার সময় আমি আমার কাজ কীভাবে করব?

হজরত আবুল খায়র আকতা (র) এর পা আঘাতজনিত কারণে পচন ধরে যাওয়ায় ডাক্তার পা কেটে ফেলার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

মুরিদগণ বললেন: তিনি যখন নামাযরত থাকেন তখন পা কেটে ফেলবেন। এমনটিই করা হলো। নামায শেষ করে তিনি দেখতে পেলেন, তার পা কেটে ফেলা হয়েছে।

সহল ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন: প্রকৃত ঈমানের পরিচয় এই যে যখন নামাযের ওয়াক্ত হয় তখন এক ফেরেশতা তাকে সতর্ক করে দেন। আর যদি নিদ্রিত থাকে তাহলে তাকে জাগ্রত করে দেন। কাজেই মানুষ কি নামায আদায় না করে পারে?

সুফিদের একটি সম্প্রদায় বলেন: মানুষ উন্নতি করতে করতে বন্ধুত্বের এমন একটি স্তরে পৌঁছে; যেখানে আনুগত্যের কোন প্রয়োজন হয় না; শরীয়তের নির্দেশ পালন করা হতে তার অব্যহতি মিলে, নামায রোযা কোন কিছু আদায় করাই তাদের জন্য আর ফরজ থাকে না।

হজরত আলী হাজবেরী বলেন: এটাতো সরাসরি বেদীনী। হুশ জ্ঞান থাকা অবস্থায় কোনভাবেই শরীয়তকে অমান্য করার বা পালন করার দায়িত্ব থেকে

কেউ অব্যহতি পেতে পারে না। সবাই একমত যে হুজুর ﷺ এর শরীয়ত কখনও রদ হবে না। তবে উন্মাদ ও শরীয়তের ওজরের কথা আলাদা। বুদ্ধিহীন লোকের ওপর শরীয়তের নির্দেশ প্রযোজ্য নয়।

হাঁ, তবে এতটা হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালা তার কোন বান্দাকে স্বীয় বন্ধুত্বে এরূপ মর্যাদা দান করেছেন যে আল্লাহর আনুগত্য এবং ইবাদতে কষ্ট পাওয়াতো দূরের কথা বরং উৎসাহ ও আনন্দের সাথে তা সম্পাদন করে থাকেন। বরং না করতে পারলেই চঞ্চল হয়ে যান। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যতটা প্রগাঢ় হবে তার পক্ষে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা ততই সহজতর হয়ে থাকে।

এ কারণেই হুজুর ﷺ এত অধিক নামায আদায় করতেন যে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা ফুলে যেত। এরপরও নামাযের প্রতি তার মনের টান বেড়েই চলত।

ফরয ও নফল নামায

বুযুর্গদের নীতি ও ধর্মের নিয়ম ফরজ প্রকাশ্যে এবং নফল নির্জনে আদায় করতে হবে যেন রিয়া হতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ফরজ আদায় করা ব্যতীত নফল বা অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি কোন কাজেই আসবে না। ফরজ আদায় করা ছাড়া কেউই আল্লাহ নিকট প্রিয় হতে পারে না। ফরজ আদায় করার পরই নফল ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসিলা হতে পারে। নফল ইবাদত যত বেশিই করা হোক না কেন তা একটি অতি ক্ষুদ্র ফরজের সমতুল্যও হতে পারে না।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَايَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَرِجْلًا وَلِسَانًا ـ

"আমি বান্দার প্রতি যা ফরজ করেছি তা আদায় করা ব্যতীত কেউ আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। ফরজ সম্পাদন করার পর নফল দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। ফলে আমিও তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার হাত, পা, চোখ, কান এবং নাকে পরিণত হই।"

ঈমান, আল্লাহর মহব্বত এবং নামায

আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۞

"ঈমানদারগণ সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালোবাসে।"

(সূরা: আল-বাকারা– ১৬৫)

কারণ আল্লাহর সাথে গভীর ও আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত ইবাদতে দৃঢ়তা আসে না।

অতঃপর আল্লাহর সাথে ভালবাসা স্থাপন করার কার্যত মাধ্যম হচ্ছে মহানবি ﷺ-কে ভালোবাসা এবং তাঁর অনুসরণ করা। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۞

"হে নবি! লোকদের বলে দিন; যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের মাফ করবেন।" (সূরা: আলে-ইমরান– ১৬৫)

আরও এরশাদ করেন:

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۞

"যে ব্যক্তি রাসূলের অনুজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহরই অনুজ্ঞ।"

(সূরা: আন্-নিসা– ৮০)

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

"পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার যাবতীয় কিছু থেকে আমি যার নিকট অধিক প্রিয় নই, সে প্রকৃত মুমিন নয়।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেছেন:

مَا تَرَدَّدْتُ فِىْ شَىْءٍ كَتَرَدُّدِىْ فِىْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَكْرَهُ سَاعَتَهٗ وَلَابُدَّ لَهٗ مِنْهُ ـ

"মুমিন বান্দার জান কবজ করতে আমি যতটা দ্বিধান্বিত হই তেমন অন্য কাজে হইনা। কারণ আমি তার অপছন্দনীয় কাজ করতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু মৃত্যু এমনই একটি বিষয় যা কেউ কোনমতেই এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় না।"

মহব্বতের পরিণতিই হলো মাহবুবের সাথে মিলন কামনা। আল্লাহর সাথে মিলনের উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে নামায হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন।"

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا قَالَ لِجِبْرِيْلَ: يَاجِبْرَئِيْلَ: إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يَقُوْلُ جِبْرَئِيْلَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْأَرْضِ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ الْأَرْضِ ـ

কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় হলে আল্লাহ হজরত জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, হে জিবরাইল! আমি অমুককে ভালোবাসি তুমিও তাঁকে ভালোবাস। হজরত জিবরাঈলও তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তারপর হজরত জিবরাঈল (আ) আসমানবাসীকে ডেকে বলেন, হে আসমানবাসী! আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন তোমরাও তাঁকে ভালোবাস। আসমানবাসীও তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এই ভালোবাসা অতঃপর পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। তখন পৃথিবীবাসীও তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে।

যাকাত

যাকাতের গুরুত্ব

ঈমান ও নামাযের পর অন্যান্য ফরজের মধ্যে যাকাত একটি ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ⊛

"নামায আদায় কর এবং যাকাত দান কর।" (সূরা: আল-বাকারা– ১১ ও ২২ঃ ৭৮; ২৪ঃ ৫৬; ৭৩ঃ ২০)

অপর আয়াতে এরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ـ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ⊛

"যারা স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে এবং আল্লাহর পথে দান (যাকাত) করে না; তাদের ভীষণ শাস্তির সংবাদ দান করুন। যেদিন তাদের সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্যের উপর জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এটাই তোমাদের ঐ সঞ্চিত ভাণ্ডার যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এখন সে সঞ্চিত ভাণ্ডারের আজাব ভোগ কর।"

আরও এরশাদ করেছেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۞

"আল্লাহ তায়ালা যাদের প্রতি সদয়, অতঃপর সে কৃপণতা করে; সে যেন মনে না করে যে সে উত্তম কাজ করছে না। এই কৃপণতা তার জন্য খুবই খারাপ। কৃপণতা করে যা কিছু জমা করে কেয়ামতের দিন তা বেড়ীতে পরিণত করে তার গলায় পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে।"

হাদীসে হজরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে–

مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يَطْلُبُهٗ حَتّٰى يُمَكِّنَهٗ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ ـ

"যারা কাছে এমন ধনসম্পদ আছে যার সে যাকাত আদায় করে না কেয়ামতের দিন তার উক্ত সম্পদকে এক সাংঘাতিক বিষাক্ত সাপের আকৃতি দেওয়া হবে। সাপের মুখে বিষের দুটো থলে থাকবে। উক্ত সাপ তাকে খুঁজে বের করবে এবং বলবে, আমিই তোমার পার্থিব জমাকৃত সম্পদ।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক– যাকাত অধ্যায়)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন: যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না, ভাণ্ডার শব্দ হতে তা-ই বুঝানো হয়েছে।

যে যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সর্বসম্মতিক্রমে সে ইসলাম থেকে খারিজ। হজরত আবু বকর (রা) এই জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন এবং সকল সাহাবা তাঁর এই কাজের সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যাকাত হিসেবে প্রাপ্য একটি উটের রশি দিতেও যে অস্বীকৃতি জানাবে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করব।

যাকাতের হাকিকত

আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই যাকাতের হাকিকত তথা মূলতত্ত্ব। তাই টাকা-পয়সা, স্বর্ণরৌপ্য, গরু, ছাগল, পর্যন্তই যাকাত সীমিত নয় বরং যাবতীয় নেয়ামতের উপরই যাকাত প্রযোজ্য। মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন– আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মর্তবার উপরও এমনভাবে যাকাত ফরজ করেছেন যেমন তোমাদের ধনসম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন– প্রতিটি বিষয়েরই যাকাত রয়েছে। গৃহের যাকাত মেহমানদারী করা। সুস্থতা ও শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ আল্লাহর বড় নেয়ামত। তার যাকাত হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করা, প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং নাফরমানী না করা।

সুফি ও শায়খদের একটি সম্প্রদায় কেবল যাকাত দেওয়াকেও কৃপণতা বলে থাকেন। তারা বলেন, এর চেয়ে কৃপণতা আর কী হতে পারে যে তার আশ-পাশের মানুষ অনাহারে থাকে, উলঙ্গ থাকে আর সে সারা বছর টাকা-পয়সা আঁকড়িয়ে ধরে থাকে এবং বছরের পর পাঁচ দশ টাকা যাকাত দিয়েই কর্তব্য পালন করেছে বলে মনে করে।

মুমিনদের আলামত হলো দানশীল হওয়া। দানশীলদের স্বভাব দান-খয়রাত করা। দানশীল ব্যক্তি এত পরিমাণ টাকা-পয়সা কখনই জমা করে রাখে না যে বছর শেষে তাঁর উপর যাকাত ফরজ হতে পারে।

এক জাহেরী আলেম হজরত শিবলী (র) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন: কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয়?

তিনি উত্তর দিলেন– দুশ' দেরহাম যদি এক বছর কারও কাছে থাকে তবে পাঁচটি দেরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। বিশটি দীনার এক বছর থাকলে অর্ধ দীনার যাকাত হয়। অবশ্য এই মাসয়ালা তোমাদের নীতি মোতাবেক। আমাদের নীতি মোতাবেক তোমার কাছে এমন কোন সম্পদ থাকাই উচিত নয়– যাতে যাকাত ওয়াজিব হতে পারে।

উক্ত আলেম জানতে চাইলেন: আপনাদের এই নীতির ইমাম কে?

তিনি বললেন: এই নীতিতে আমার ইমাম হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। মুতার জিহাদে তিনি যখন তাঁর যাবতীয় ধনসম্পদ দান করলেন: তখন মহানবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ?

তখন হজরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন: তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলইতো যথেষ্ট।

হজরত আলী (র) এই ব্যাপারে একটি কবিতা বলেছেন।

فَمَا وَجَبَتْ عَلَىَّ زَكٰوةُ مَالٍ

وَهَلْ يَجِبُ الزَّكٰوةُ عَلَى الْجَوَادِ

আমার উপর মালের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নয়।

দানশীলদের উপরও কি যাকাত ওয়াজিব হয়?

অর্থাৎ দানশীলদের হাতে টাকা-পয়সা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দান করে ফেলেন। সারা বছর টাকা-পয়সা সঞ্চিত করে রাখার মতো সুযোগই তাদের হয় না। ফলে তাদের জন্য যাকাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর অর্থ এই নয় যে দানশীল ব্যক্তিদের কাছে বছরান্তে যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে না। আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যত বেশি পরিমাণ নফল দান খায়রাতই করা হোক না কেন তা ফরজ এবং ওয়াজিবের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

মহানবি ﷺ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ মহানবি ﷺ কে দু'মণ কস্তুরি হাদিয়াস্বরূপ পাঠান। মহানবি ﷺ তা পাওয়ার পরই সঙ্গে সঙ্গে সব দান করে দেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন: এক ব্যক্তি মহানবি ﷺ এর কাছে আগমন করল। তখন একটি জঙ্গলের দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান

ছাগপালে পরিপূর্ণ ছিল। মহানবি ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে ঐসব ছাগ দান করলেন। তা হুযুর ﷺ এর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল।

ঐ ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন: হে আমার স্বগোত্র! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। মুহম্মদ ﷺ এত দান করেন যে তাঁর দরিদ্র হওয়ার খেয়ালই করেন না।

হজরত আনাস (রা) বলেন: মহানবি ﷺ এর নিকট কোন এক স্থান হতে আশি হাজার দিরহাম আসল। মহানবি ﷺ তা তাঁর চাদরে ঢেলে দান করতে শুরু করলেন। সম্পূর্ণ দেরহাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠলেন না।

হজরত আলী (রা) বলেন: মহানবি ﷺ যখন এই দিরহাম গরীবদের মধ্যে বণ্টন করছিলেন তখন তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন: একটি চারণভূমির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম একজন রাখাল ছাগ চরাচ্ছে। এমন সময় একটি কুকুর এসে তার পাশে বসল। রাখাল তার ঝোলা থেকে একখানি রুটি বের করে কুকুরের সামনে দিল। তারপর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয় আর একখানি রুটিও দিল।

হজরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন: তুমি দৈনিক কয়টি রুটি পাও?

রাখাল বলল: তিনটি।

তিনি বললেন: তাহলে তিনখানা রুটিই কেন কুকুরকে দিলে?

রাখাল বলল: এখানে কোন কুকুর থাকে না। এই কুকুরটি বহু দূর-দূরান্ত হতে এই আশা নিয়েই এসেছে যে সে খেতে পাবে। কাজেই আমি তাকে বিমুখ করতে পারি না।

হজরত আবদুল্লাহ বলেন: তাঁর একথা আমার কাছে খুবই প্রিয় মনে হলো। আমি সেই চারণ ভূমি, সমস্ত ছাগ এবং গোলাম তাঁর মালিকের নিকট

থেকে ক্রয় করে গোলামকে বললাম, তুমি মুক্ত এবং এই চারণভূমি ও ছাগ তোমাকে দান করলাম।

গোলাম আমার জন্য দোয়া করল। সে সব কিছু দান করে সেখান থেকে বিদায় নিল।

হজরত হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান। আমার চারশ দেরহামের দরকার। তিনি সাথে সাথে তাকে চারশত দেরহাম এনে দিলেন।

অতপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। মানুষেরা তার ক্রন্দন করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন: আমি এজন্য কাঁদছি যে তাঁর চাওয়ার আগেই কেন আমি তার প্রয়োজন জিজ্ঞেস করে দান করলাম না। সে কেন প্রয়োজনের তাকিদে এসে আমার নিকট হাত প্রসারিত করল।

আবু সাহল সায়ালু সম্পর্কে বর্ণিত আছে তিনি কখনও দান খয়রাত কারও হাতে দিতেন না বরং মাটিতে রেখে দিতেন। অভাবগ্রস্ত তা উঠিয়ে নিত।

মানুষেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলতেন, আমি চাই না যে আমার হাত কোন মুসলমানের হাতের চেয়ে উঁচু এবং উপরে হোক। আর আমি টাকা পয়সাকে এমন কোন মর্যাদাসম্পন্নও ভাবি না যে তার নিচে কোন মুসলমানের হাত হোক।

দান-খয়রাতের বেলায় আল্লাহ মহানতাকে সম্মুখে রাখবেন। ফলে দান করার ব্যাপারে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করবে না।

সহীহ হাদীসে এসেছে, হজরত ইবরাহীম (আ) মেহমান ছাড়া এক বেলাও আহার করতেন না। একবার তিনদিন ধরে কোন মেহমান আসল না। চতুর্থ দিনে একজন বৃদ্ধ তাঁর গৃহদ্বার দিয়ে যাচ্ছিল। হজরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করায় সে বলল, আমি একজন অগ্নিপূজক।

হজরত ইবরাহীম (আ) বললেন: তাহলে তো তুমি আমার এখানে মেহমান হওয়ার উপযুক্ত নও।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: হে ইবরাহীম! আমি সত্তর বছর ধরে তাকে পানাহার করিয়ে আসছি। আর তুমি একবেলা আহার করাতে কৃপণতা করলে?

যাকাত গ্রহণ

পবিত্র কুরআনে যাদের যাকাতের হকদার ঘোষণা করা হয়েছে তাদের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা লজ্জার কিছু নেই। বস্তুত তারা যাকাত গ্রহণ করে যাকাত দানকারীদের জন্য এই অনুগ্রহ করে যে– তাদের মাথার বোঝা হালকা করে দিয়ে তাদের ধনসম্পদ পবিত্র করে দেয়।

কিন্তু যারা যাকাত ও দান-খয়রাত গ্রহণ করার উপযোগী নয় তারা যদি গ্রহণ করে তাহলে তারা অন্যের হক নষ্ট করে। মহানবি ﷺ এই প্রকারের লোকের তুলনা এমন লোকের সাথে করেছেন যেন, গরমের সময় কোন মোটা লোক কোন ব্যক্তির এসতেঞ্জায় ব্যবহৃত পানি পান করছে।”

রোযা

রোযার গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۞

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল।"

(সূরা: আল-বাকারা- ১২৩)

আরও এরশাদ করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۞

"রমজান এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যার সব কিছুই হেদায়াতে পরিপূর্ণ। আর এমন সুন্দর শিক্ষার সমন্বয় যা সরল পথ প্রদর্শনকারী এবং সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্যকারী। ফলে যে ব্যক্তি এই মাস পায় তার কর্তব্য এসব দিনে রোযা রাখা।" (সূরা: আর-বাকারা- ১৮৫)

হুজুর ﷺ এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ اِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ مِنْ اَجْلِيْ

فَالصِّيَامُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ـ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلَّا الصِّيَامُ فَهُوَ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ـ

যিনি আমার জীবনের মালিক তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধীময়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– রোযাদার ব্যক্তি কেবল আমার সন্তুষ্টির জন্য কামনা-বাসনা এবং পানাহার করা হতে বিরত থাকে। কাজেই যখন সে শুধু আমার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখে তখন আমি নিজেই তাকে তার রোযার প্রতিদান দিব। আমি অন্যান্য পুণ্যের প্রতিদান দশ হতে সাতগুণ দিয়ে থাকি। কিন্তু রোযা তার ব্যতিক্রম (অসীম)। কারণ, রোযা শুধু আমার জন্যই রাখা হয়। ফলে রোযার প্রতিদান আমার ইচ্ছামতো আমি দেব।

রোযার এই বিশেষত্বের কারণ এই যে সমস্ত ফরজ ইবাদত বন্দেগির মধ্যে কেবল রোযাই এমন ইবাদত যা সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়। বাহ্য কোন কিছুর সাথেই তার সম্পর্ক নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য আর কারও কোন অংশ নেই। রোযা এমন এক ইবাদত যদি কারও মনে আল্লাহর কোন ভয় না থাকে তাহলে সে অতি সহজে পানাহার করে লোককে দেখাতে পারে যে সে রোযাদার এবং আল্লাহ ভক্ত।

রোযার মধ্যে চুরি করা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই যে তা করতে পারবে। তাই হজরত জোনায়েদ (র) বলেছেন: রোযা তরীকতের অর্ধাংশ। কারণ রোযার মধ্যে লোক দেখানো কিছু নেই। আন্তরিকতা ছাড়া কেউ রোযা রাখতে পারে না।

রোযার শর্ত

প্রতি রোযার জন্য নিয়ত করা শর্ত। ফরজ রোযার নিয়ত ফজরের পূর্বে করা আবশ্যক। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন: যে ব্যক্তি ফজরের আগে নিয়ত না করে তার রোযা হয় না। হজরত আয়েশা ও হজরত হাফসা (রা)-ও এই কথা বলতেন। নফল রোযার নিয়ত সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা) বলেন:

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ لَا، قَالَ فَانِّيْ اِذًا اَصُوْمُ ـ

“একদিন মহানবি ﷺ আমার নিকট তাশরীফ এনে বললেন: আয়েশা! খাবার কিছু আছে কি? হজরত আয়েশা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কিছুই তো নেই। তখন তিনি বললেন, তবে আজ আমি রোযা রাখলাম।” (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

এ থেকে আলেমগণ বলেছেন, নফল রোযার নিয়ত দিনেও করা যায়। অবশ্য রোযার নিয়ত করা ব্যতীত যদি কেউ সারাদিন পানাহার করা হতে বিরত থাকে, তাহলে তাতে রোযা হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, পেটকে পানাহার হতে, চোখকে খারাপ কিছু দেখা হতে, কানকে খারাপ কিছু শোনা হতে এবং পুরো দেহকে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করা হতে বিরত রাখা।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَكُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ ـ

যখন তুমি রোযা রাখবে তখন তোমার সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গকে আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্ম এবং তার নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত রাখবে।

আরও এরশাদ করেছেন:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَالْعَطْشُ ـ

“বহু রোযাদারের অনাহারে থাকা ছাড়া আর কিছু লাভই হয় না।”

আমি ভেবে অবাক হই যে, কোন কোন লোক নফল রোযা রেখে শুকিয়ে কাঠে পরিণত হয় অথচ ফরজের কোন তোয়াক্কা করে না। অথচ আল্লাহর অপছন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ। নফল রোযা রাখা মাত্র সুন্নত। আমরা আল্লাহ নিকট এ জাতীয় কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

রোযার হাকিকত

রোযার হাকিকত ইমসাক। অর্থাৎ নফসের কামনাকে সংযত রাখা এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাই হজরত জোনায়েদ (র) বলেছেন, রোযা তরিকতের অর্ধাংশ।

হজরত আলী হাজবিরী বলেন, আমি একবার মহানবি ﷺ কে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন– اِحْبِسْ حَوَّاسَكَ “তোমার পঞ্চইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখ।” চোখ, কান, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চইন্দ্রিয় যেমন সৎ কাজে তদ্রূপ পাপের কাজের জন্য সমান উপযোগী। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই লোকে আল্লাহর ফরমাবরদারী করে; আবার নাফরমানীও করে। কাজেই পঞ্চইন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখার জন্য রোযাই একমাত্র সামান।

হুজুর ﷺ ও বুযুর্গদের নীতি

রোযার এই প্রতিক্রিয়ার দরুনই মহানবি ﷺ এবং তার অনুসরণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম অধিকহারে রোযা রাখতেন। মহানবি ﷺ রমজান ছাড়াও একাধিক্রমে রোযা রাখতেন। সাহাবায়ে কেরাম তার অনুসরণ করতে গেলে মহানবি ﷺ ঘোষণা করলেন:

اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالِ، قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللهِ ـ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّكُمْ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ ـ

“তোমরা সওমে বিসাল (কোন কিছু পানাহার না করে একাধিক্রমে রোযা রাখা) থেকে বিরত থাক। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো করেন। মহানবি ﷺ বললেন, আমি তোমাদের মতো নই।

আমার ঘটনা তোমাদের থেকে আলাদা। তোমাদের প্রভুর নিকট আমি রাত অতিবাহিত করি। তিনি আমাকে পানাহার করান।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে একটি সম্প্রদায় বলে, এই নিষেধ মাকরূহে তাহরিমী জাতীয় নিষেধ নয়। বরং হাকিকত বর্ণনা জাতীয়। তথাপি এঁরা বলেন, এই রোযা রাখার মধ্যে যদি এক ফোঁটা পানিও পান করে তবে সওমে বিসাল হবে না।

হজরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি প্রতি মাসের পনের তারিখে একবার মাত্র আহার করতেন। রমজান মাসের প্রথম হতে ঈদ পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার হতে বিরত থাকতেন। এটা সত্ত্বেও তিনি প্রতি রাতে চারশত রাকআত নফল নামায আদায় করতেন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এটা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

হজরত ইবনে আদহাম সারা রমজান মাসে কোন কিছু পানাহার করতেন না। এই রমজান মাস ছিল গরমের মাস। তিনি সারাদিন গম কেটে যা মজুরি পেতেন তা গরিবদের দান করে দিতেন। লোকে তাঁর পেছনে লেগে থাকল যে তিনি কিছু পানাহার করেন কিনা? কিন্তু কেউই তাঁর পানাহার করার প্রমাণ পান নি এবং কেউই তাঁকে রাতে ঘুমাতে দেখেন নি।

হজরত শায়খ আবু নসর তাউসুফ ফোকারা রমজান মাসে বাগদাদে হাজির হন এবং তাকে শোনেযিয়া মসজিদের একটি কোঠায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তারাবি পড়ানোর দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। তারাবিতে তিনি পাঁচবার কুরআন খতম করেন। প্রতি রাতে তাঁর খাবার হিসেবে একটি করে রুটি দেওয়া হতো।

ঈদের দিন তিনি ঈদের নামায পড়তে গেলে খাদেম তাঁর কামরায় প্রবেশ করে দেখেন ত্রিশখানি রুটি তেমনই পড়ে রয়েছে।

আলী ইবনে বাকা (র) বলেন: হাফছ মাসীসী (র) রমজানের পনের রোযা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না।

গ্রন্থকারে বলেন: আমি বহু বুযুর্গকে চাঁদের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখে রোযা রাখতে দেখেছি। আবার অনেককে একদিন পর একদিন রোযা রাখতে দেখেছি। মহানবি ﷺ-এই রোযাকে ভালো রোযা নামে অভিহিত করেছেন।

আমি এমন বুযুর্গও দেখেছি তারা রোযা রাখতেন। অবশ্য কেউ খাবার এনে সম্মুখে হাজির করলে কোন কথা না বলে আহার করতেন। অর্থাৎ তারা চাইতেন না যে তিনি রোযা রাখেন একথা অন্য লোকে জানুক।

এটা সুন্নত অনুযায়ী আমল। হজরত আয়েশা ও হাফসা (রা) বলেন, মহানবি ﷺ গৃহে তাশরীফ আনলে তাঁরা বললেন, আমরা আপনার জন্য হাইস (ঘি), খেজুর এবং ছাতু মিশ্রিত এক প্রকার খাবার, রান্না করে রেখেছি। মহানবি ﷺ বললেন: আমি তো আজ রোযা রাখার নিয়ত করেছিলাম। আচ্ছা নিয়ে এসো, এর পরিবর্তে অন্য আর একদিন রোযা রাখব।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা নফল রোযার ক্ষেত্রে। শরীয়তসিদ্ধ কোন কারণ ব্যতীত ফরজ রোযা ছাড়া যায় না। ছাড়লে কাফফারা ওয়াজিব হয়।

পৃথিবীতে দু'শ্রেণির লোক আছে। এক শ্রেণির লোক বাতেন এবং পরকালের সম্পদ আহরণে নিয়োজিত থাকে যেন সর্বোতভাবে আল্লাহরই হয়ে যায়। অপর শ্রেণির লোক আজীবন শরীয়ত পালনে লিপ্ত থাকে। তাই প্রথম শ্রেণির লোক এই নিয়তে পানাহার করে থাকেন যে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা দেহে শক্তি হবে এবং উক্ত শক্তি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে ব্যয় করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণির লোক পার্থিব সাচ্ছন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে পানাহার করে। সুতরাং উভয় শ্রেণির লোকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

হজরত হাজবিরী (র) তাঁর সমসামায়িক লোকদের লক্ষ করে বলেন:

وَكَانَ الْمُتَقَدِّمُوْنَ يَاكُلُوْنَ يَعِيْشُوْا وَاَنْتُمْ تَعِيْشُوْنَ لِتَاْكُلُوْا

"পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এজন্য খাবার গ্রহণ করতেন যেন তারা জীবিত থাকেন। কিন্তু তোমাদের পানাহারের উদ্দেশ্য শুধুই পানাহার করা।"

হজ্জ

হজ্জের গুরুত্ব

মুমিনদের জন্য হজ্জ ফরজে আইন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ـ

"সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য এই ঘরের হজ্জ করা ফরজ।"
(সূরা: আলে-ইমরান– ৯৭)

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন: হাজি আল্লাহর সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। তাঁরা যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা দান করেন এবং যে দোয়া করেন আল্লাহ তা কবুল করেন।

আরও ঘোষণা করেন:

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْسُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًا وَّإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ـ

"যে ব্যক্তি টাকা-পয়সার অভাবে হজ্জ করতে অক্ষম নয়, কোন উৎপীড়ক বাদশাহ হজ্জ করতে বাধা না দেয় অথবা অসুস্থতার কারণে হজ্জ করতে অসমর্থ না হয় এমন ব্যক্তি যদি হজ্জ না করে মারা যায়– এমন ব্যক্তির মৃত্যু ইহুদি অথবা খ্রিস্টানদের মৃত্যুর সমতুল্য। কাজেই জ্ঞানবান, বয়প্রাপ্ত এবং ধনী প্রত্যেকের জন্যই হজ্জ করা ফরজ।"

হজ্জের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। যেমন কাবার প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

"যখন ইবরাহীমের প্রভু ইবরাহীমকে বললেন, তুমি পূর্ণভাবে আমার বাধ্য হয়ে যাও। তখন ইবরাহীম বলল, আমি আপাদমস্তক বিশ্বপ্রভুর সমীপে বাধ্য হলাম।" (সূরা: আল-বাকারা– ১৩১)

এরপর থেকে তিনি অন্যের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহতে আত্মসমর্পিত হয়ে থাকেন। এমনকি যখন বাপ-ভাই আত্মীয়-স্বজন এমনকি বাদশাহ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গরুর চামড়ার মধ্যে সেলাই করে আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুতি নিল– তখন হজরত জিবরাঈল (আ) আগমন করে জিজ্ঞেস করলেন: هَلْ لَكَ إِلَىَّ حَاجَةٌ؟ "হে নবিবর! আমার কোন সাহায্যের কোন দরকার হলে বলুন।"

হজরত ইবরাহীম (আ) বললেন: أَمَّا إِلَيْكَ فَلاَ "আপনিই যদি সাহায্যকারী হন তাহলে আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আমার নেই।

হজরত জিবরাঈল (আ) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে চঞ্চল হয়ে বললেন, তবে আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করুন।

তিনি বললেন:

حَسْبِىْ مِنْ سُوَالِىْ عِلْمُهُ بِحَالِىْ ـ

"তার নিকট সাহায্য চাওয়ার আমার কোন প্রয়োজনই নেই। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।"

হজ্জের মূলতত্ত্ব হজরত ইবরাহীম (আ) এর এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হজ্জের মূল উদ্দেশ্য বান্দার মধ্যে এ জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপনা এবং

আল্লাহর সাথে এ জাতীয় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۞

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য হজরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর সাথিদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা: মুমতাহানাহ– ৪)

হজ্জের মূলতত্ত্ব হজরত জোনায়েদ (র) এর নিম্ন ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

এক ব্যক্তি হজরত জোনায়েদ (র) কাছে আগমন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–

–তুমি কোথা থেকে এসেছ?

– সে জবাব দিল, আমি হজ্জ করে এসেছি।

– তুমি হজ্জ করেছ?

– জি হাঁ! আমি হজ্জ করেছি।

– যখন তুমি হজ্জ করার নিয়তে বাড়ি থেকে বের হও, তখন পাপ পরিত্যাগ করার নিয়ত করেছিলে কি?

– না, আমি তো এই ব্যাপারে কোন চিন্তা করি নি।

– তবে তো তুমি হজ্জ করার জন্য বাড়ি হতে বের হও নি। আচ্ছা। হজ্জের সফরে তুমি যে সকল মনযিল অতিক্রম করেছ এবং যেসব স্থানে রাত অতিবাহিত করেছ তখন তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মনযিল এবং সেই পথের ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করার নিয়ত করেছিলে কি?

– না, আমি করি নি।

– তাহলে তোমার হজ্জ কীভাবে শুদ্ধ হলো? আচ্ছা যখন তুমি এহরাম বাধার নিয়ত করেছ প্রাত্যহিক কাপড় দেহ হতে ছেড়েছ, তখন তার সাথে তোমার খারাপ স্বভাবও বর্জন করেছ কি?

– আমি সেদিক খেয়ালই করি নি।

– তাহলে তোমার এহরাম বাঁধাই ঠিক হয় নি। যখন তুমি আরাফাতে দণ্ডায়মান হয়েছিলে তখন কি তোমার মনে এই ধারণা হয়েছিল যে তুমি আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান এবং তুমি তাকে দেখছ?

– না আমার এমন কল্পনা হয় নি।

– তাহলে তুমি যেন আরাফাতেই যাও নি। তুমি মুযদালেফায় গিয়ে তোমার কামরিপু পরিত্যাগ করেছ কি?

– না।

– তাহলে তুমি মুযদালেফায়ও যাও নি। তুমি তওয়াফ করার সময় আল্লাহর অনুগ্রহ অনুভব করেছ কি?

– না, আমি অনুভব করি নি।

– তাহলে তুমি তওয়াফও কর নি। সাফা মারওয়া দৌড়ানোর সময় তার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?

– না! করি নি।

– তাহলে তোমার সায়ী হয় নি। কুরবানী করার সময় তোমার পাপ বিসর্জন দেওয়ার নিয়ত করেছ কি?

– না, করি নি।

– তাহলে তোমার কুরবানী কী করে হলো? আচ্ছা কঙ্কর নিক্ষেপ করার কালে তোমার অসৎ সঙ্গীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার নিয়ত করেছিলে কি?

– না।

– তাহলে তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় নি। তুমি ফিরে যাও এবং এসব গুণাবলির সাথে হজ্জ সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছ। যে মাকাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى "ইবরাহীম তার প্রবুর কৃতজ্ঞতার হক আদায় করেছেন।" (সূরা: আন-নাজম– ৩৭)

বুযুর্গদের হজ্জ

হজরত আবু ইয়াযিদ (র) বলেন– আমি প্রথমবার হজ্জ করতে গিয়ে শুধু কাবাগৃহ ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে গিয়ে কাবা গৃহ ও তাঁর মালিককে দেখেছি। তৃতীয়বার হজ্জ করতে গিয়ে কাবার মালিক ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি।

হজরত ফুজায়েল ইবনে আইয়াজ বলেন: আমি আরাফাতে অবস্থানকালীন দেখলাম, সবাই দোয়া করছে আর এক যুবক মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রয়েছে।

আমি তাকে বললাম: হে যুবক! তুমি কেন দোয়া করছ না?

যুবক বলল: আমি ভেবে দেখলাম যে, আমি মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছি। লজ্জায় দোয়া করার জন্য আমি হাত উঠাতে পারছি না।

আমি বললাম– তুমি দোয়া কর! এসব লোকের বরকতে আল্লাহ তোমাকে তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।

আমার কথা শুনে সে দোয়া করার উদ্দেশ্যে হাত উঠাতেই তার মুখ থেকে এমন জোরে চিৎকার বের হলো যে সাথে সাথেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)

সাহচর্যের আদব ও আহকাম

আদবের অর্থ ও গুরুত্ব

আদব শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নিজের মধ্যে সচ্চরিত্রের সমাবেশ করা এবং তা রক্ষা করা। যার মধে উত্তম স্বভাব বিদ্যমান সে চরিত্রবান বা শিষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ۞

"হে ঈমানদারগণ! নিজকে ও পরিবারবর্গকে অগ্নি হতে হেফাজত কর।"

অর্থাৎ তাদের এমন আদব শিক্ষা দাও যার ফলে তারা দোযখ হতে মুক্তি পায়।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

حَسَنُ الْاَدَبِ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ

"মানুষের উত্তম স্বভাব ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"

আরও ঘোষণা করেন:

اَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَادِيْبِىْ ـ

"আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দান করেছেন।"

মোদ্দাকথা পার্থিব হোক বা পারলৌকিক সব কাজেই শিষ্টতা রক্ষা করে চললে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। মুমিন হোক বা কাফের, তওহিদবাদী হোক বা

অংশীবাদী সবাই একমত যে পারস্পরিক সম্পর্কে শিষ্টতাই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে না বরং দুনিয়ার সকল রীতিনীতি ও সম্পর্ক সুন্দর হওয়ার মূলেও সৎ স্বভাব।

ধর্মে আদব রক্ষার অর্থ হচ্ছে সুন্নতের পায়রবী করা। লোকের সাথে আদব রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সদয় হওয়া। পার্থিব ব্যাপারে আদব রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিজের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা। অর্থাৎ এমন কোন কাজ না করা যার ফলে তার মানসম্মানকে আঘাত করতে পারে।

আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করার অর্থ তার আদেশ-নিষেধের প্রতি সম্মান দেখানো। আর এটা তাসাউফের পথে পরহেযগারী অবলম্বন করলে অর্জন হয়। আর তার নীতি হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে নিষেধিত কাজ হতেই নয় বরং সন্দেহজনক কাজ করা হতেও দূরে থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করতে বেপরোয়া তার তিকতে দাবি করার কোন কিছুই নেই। এটা সুরে (মত্ততা) গালবাহ (ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত) কোন অবস্থায়ই বাতিল হয় না।

যে ব্যক্তি বলে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর ভালবাসায় বিভোর হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে শরীয়তের হুকুম পালন করার দরকার হয় না। এমন কথা যে বলে, সে মুলহিদ। তার উপর আল্লাহর লানত। কারণ, আদব পরিত্যাগকারী কোন ভাবেই ওলি হতে পারে না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাকে অবশ্য আদব রক্ষা করে চলতে হবে।

অবশ্য এতটা ঠিক যে কখনও এই অনুসরণ লৌকিকতা আবার কখনও লৌকিকতা বিহীন হবে। তার সীমারেখা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক মোতাবেক হয়ে থাকে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যতটা কম হবে বা ভাসাভাসা হবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা তার পক্ষে ততই কষ্টকর হবে। অপরদিকে সম্পর্ক গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ হলে– সে কোন প্রকার কষ্টই অনুভব করবে না। বরং তাঁর আদেশ পালনেই সে আরাম পাবে। না করতে পারলে তার মনে কোনমতেই শান্তি আসে না।

আদবের শ্রেণিবিভাগ

আদব তিন প্রকার। যথা:

১. আল্লাহর সাথে তার তওহিদ সম্পর্কীয়।

আল্লাহর সাথে আদবের চাহিদা হচ্ছে মানুষ নিজের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যেন সে এমন কোন কাজ না করে বসে যাতে আল্লাহর প্রতি অসম্মান করার ইঙ্গিত বহন করে। তার ব্যবহার কমপক্ষে এমন হওয়া আবশ্যক যেমন বাদশাহর দরবারীগণ ও খাদেমগণ বাদশাহর সাথে করে থাকে।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে একদিন মহানবি ﷺ পা প্রসারিত করে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় হজরত জিবরাঈল (আ) আগমন করে বললেন:

يَا مُحَمَّدُ ﷺ اِجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ـ

"হে মুহম্মদ। এমনভাবে বসুন যেমন কোন গোলাম তার মনিবের সামনে বসে থাকে।"

হজরত হারেস মুহাসেবি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি একবারের জন্যও দেয়ালে হেলান দিয়ে উপবেশন করেন নি। যখন বসতেন তখন সেজদার ভঙ্গিতে জানু পেতে বসতেন।

মানুষেরা বলল, আপনি এত অসুবিধা করে কেন বসেন? কোন কিছুতে হেলান দিয়ে কেন বসেন না?

তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহর দরবারে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসা ব্যতীত একজন গোলামের ন্যায় না বসে অন্যভাবে বসতে আমার লজ্জা হয়।

হজরত আলী হাজাবিরী বলেন, আমি খোরাসানে একজন বুযুর্গ দেখেছি। মানুষেরা তাকে বুলন্দ বলত। তিনি বিশ বছর ধরে

দণ্ডায়মান ছিলেন। শুধু নামাযে বসা ব্যতীত আর কোনও সময় বসতেন না।

আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এখনও আল্লাহর দরবারে বসার উপযুক্ত হই নি। অথাৎ আমি দাবি করছি যে আমি তাঁর গোলাম। অথচ তিনি আমাকে বসা দেখবেন এটা কিরূপ কথা।

হজরত আবু ইয়াযিদের নিকট লোকে জানতে চাইল, আপনি এরূপ মর্যাদা কীভাবে পেয়েছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে সর্বক্ষণ আদব রক্ষা করে চলার কারণেই আল্লাহ আমাকে এটা দান করেছেন।

২. পরস্পরের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধীয়। সত্য ছাড়া মিথ্যা না বলা। এতেই যাবতীয় সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে উঠে।

৩. অপরের যা দেখা উচিত নয় নিজেও তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। নিজের সতর অপরকে দেখানো হতে ঢেকে রাখাই নয় বরং নিজেও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

আদব শিক্ষার পন্থা : সৎ-সঙ্গ

সংসর্গের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর নেক বান্দা ও বুযুর্গদের সংশ্রবে থাকলেই চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। একা একা থাকলে কেউ কোনদিন আদব-কায়দা শিখতে পারে না। বরং একা থাকাই মুরিদের জন্য ক্ষতিকর।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَلشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ -

"মানুষ যখন একাকী থাকে তখন শয়তান তার সাথি হয়। দু'জন দেখলে পলায়ন করে।"

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন:

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ⊛

তিন ব্যক্তির এমন কোন গোপন কথা নেই যেখানে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত না থাকেন। না পাঁচ ব্যক্তির গোপন পরামর্শ যেখানে ষষ্ঠজন হিসেবে আল্লাহ না থাকেন, আর না তা থেকে কম কিংবা বেশি সংখ্যায় হয় যেখানে আল্লাহ তাদের সাথে না থাকেন। (সূরা: মুজাদালাহ- ৭)

এখানে আল্লাহ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাথে তাঁর থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ দু'জন না হলে পরামর্শ হতে পারে না। কাজেই একা থাকার চেয়ে বিপদ আর কিছুই নেই।

বর্ণিত আছে, হজরত জোনায়েদ বাগদাদির এক মুরিদের খেয়াল হলো আমি ওলি হয়ে গেছি। ফলে লোক সংশ্রবে থাকার চেয়ে নির্জনে থাকাই আমার জন্য মঙ্গলময়। এ কারণে তিনি লোক-সংশ্রব পরিত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করলেন।

গভীর রাতে কয়েকজন লোক তার কাছে উট নিয়ে এসে বলল– আপনাকে আমরা বেহেশতে নিয়ে যেতে এসেছি। কাজেই দরবেশ সাহেব উটে চেপে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করার পর তারা তাকে একটি মনোরম স্থানে এনে উপস্থিত করল। এখানে সুন্দর সুন্দর লোক, নানাজাতীয় খাবার, ফল ফুল কোন কিছুরই অভাব ছিল না। ফজরের পূর্বে তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখতে পেতেন তিনি তার গৃহদ্বারে পড়ে আছেন।

বেশ কিছু দিন একইভাবে কেটে যেতে থাকে। দরবেশ সাহেবও প্রতিদিন উটে আরোহণ করে বেহেশত ভ্রমণ করেন বেহেশতী খাবার খান। ফলে তার মধ্যে অহঙ্কার এসে যায়। এমনকি "আমি কিছু একটা হয়েছি" একথাও মানুষের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল।

হজরত জোনায়েদ (র) এর কানেও একথা গেল। তিনি নিজেই একদিন তার কাছে গিয়ে দেখলেন সে রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তিনি মুরিদের অবস্থা জিজ্ঞেস করায় মুরিদ পুরো ঘটনা খুলে বলল।

হজরত জোনায়েদ তাকে বললেন– এরপর যেদিন তুমি ঐ জায়গায় যাবে তখন তিনবার লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ বলে ফুঁক দেবে।

পরের রাতে তিনি আবার সেখানে গেলেন। এবার তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো যে তিনি আসলেই একটা কিছু হয়েছেন। পীরের প্রতি তার শ্রদ্ধার লেশমাত্রও আর থাকল না। তদুপরি শুধু অভিজ্ঞতার জন্যই তিনবার 'লা হাওলা' পাঠ করে ফুঁক দিলেন।

মুরিদ নিজেই বলেন– আমার ফুঁক দেওয়ামাত্র জান্নাতের লোকজন যারা খানাপিনায় মত্ত ছিল সব ছেড়ে পাগলের ন্যায় চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। আমি লক্ষ করলাম, আমি একটি আবর্জনার স্তূপের উপর বসা এবং

আমার চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো হাড়। আমি আমার কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলাম এবং নির্জনতা পরিত্যাগ করে লোকের সংশ্রবে ফিরে আসলাম।

ছোটদের সংশ্রব

সংসর্গের জন্য বড়দের এবং নিজের অপেক্ষা উত্তম লোকের সংস্রবেই থাকবে এমন কোন শর্ত নেই। নিজের চেয়ে ছোটদের সংশ্রবেও থাকা যায়। শুধু পার্থক্য এতটা যে বড়দের সাহচর্যে থাকলে নিজে উপকৃত হয়। আর ছোটদের সাথে থাকলে তারা লাভবান হয়। জ্ঞানার্জন করা এবং দান করা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন, পরহেযগারীর পূর্ণতা হচ্ছে এমন ব্যক্তিকে জ্ঞানদান কর যার জ্ঞান নেই।

সঙ্গী নির্বাচন ও তার গুরুত্ব

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যে কোন অবস্থায় এবং যে কোন লোকের সান্নিধ্যে থাকা যায়। ভালো হোক বা মন্দ তার সাথেই থাকতে হবে।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ ـ

"মানুষের ধর্ম এবং চালচলন মূলত তা-ই হয়ে থাকে যা তার বন্ধুর হয়। কাজেই নিশ্চয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে সে কেমন লোকের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখে।"

সংশ্রব রাখার ব্যাপারে সর্বপ্রথম ধর্ম ও চরিত্রকে স্থান দিতে হবে। তাছাড়া ভালো ব্যক্তিদের মাঝে বহুজনের সাথে বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক স্থাপন করার ও বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

কারণ মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَكْثِرُوْا مِنَ الْاِخْوَانِ فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ اَنْ يُّعَذِّبَ عَبْدَهٗ بَيْنَ اِخْوَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"তোমরা বহুজনের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও। কারণ, তোমার প্রভু চিরঞ্জীব ও মেহেরবান। কেয়ামতের দিন কারও সম্মুখে তার কোন বান্দাকে শাস্তি প্রদান করতে লজ্জাবোধ করবেন।"

আবার এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে এই ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য হওয়া আবশ্যক– কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়।

সংশ্রব এবং তা ভালো হওয়ার গুরুত্ব এবং উপলব্ধি যার রয়েছে সে তার নিজের চেয়ে বন্ধুদের উপকারের কথাই বেশি চিন্তা করে।

বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি কাবার তাওয়াফ করার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন– "হে আল্লাহ! আমার ভাই এবং বন্ধুদেরকে পুণ্যবান কর।"

মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই পবিত্র স্থানে নিজের জন্য দোয়া না করে বন্ধুদের জন্য কোন দোয়া করছেন?"

তিনি বললেন: "যারা আমার ভাই আমি তাদের কাছেই ফিরে যাব। যদি তারা সৎ হয় তবে আমিও তাদের সান্নিধ্যে থেকে সৎ হব। আর যদি তারা অসৎ হয় তবে আমিও তাদের ন্যায় হব।"

সাহচর্যের সাধারণ আদব

সাহচর্যের আদব এবং শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির পদমর্যাদানুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করবে। বয়োবৃদ্ধকে বাপের ন্যায় মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করবে। সমবয়স্ককে ভাইয়ের মতো জ্ঞান করে তাদের ভালোবাসবে, উপকার করবে। ছোটদেরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করবে ; ভালোবাসবে।

হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা এবং অন্যের ক্ষতি করা থেকে অবশ্য বিরত থাকবে। প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করবে। কোন ব্যক্তিকেই সদুপদেশ দিতে দ্বিধান্বিত হবে না। গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে কুরআনে তুলনা করা হয়েছে। পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ মানুষের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে।

পরস্পর ভালবাসা বর্ধিত করার বিষয়বস্তু

পরস্পর বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক উন্নত করার জন্য মহানবি ﷺ ঘোষণা করেছেন:

ثَلٰثٌ لَكَ وُدٌّ اَخِيْكَ لَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِنْ لَقِيْتَهٗ وَ تَوَسَّعُ لَهٗ فِى الْمَجْلِسْ وَتَدْعُوْهُ بِاَحَبِّ اَسْمَائِهِ ـ

"তিনটি বিষয় দ্বারা পরস্পর ভালোবাসা উন্নত ও দৃঢ় হয়। যখন কারও সাথে দেখা হবে সালাম করবে। মজলিশে আসলে তার বসার স্থান দেবে এবং যে নামে ডাকলে সে খুশি হয় তাকে সে নামেই ডাকবে।"

মহানবি ﷺ আরও এরশাদ করেছেন:

تَصَافَحُوْ يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُوْا وَتَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ ـ

"পরস্পর মোসাফাহা কর। এতে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায় মনের কালিমা দূর হয়। একে অন্যকে হাদিয়া দাও। তাতে ভালবাসা গভীর হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়।"

আমি (গ্রন্থকার) হজরত শায়খ আবুল কাসেম গুরগানীকে জিজ্ঞেস করলাম: সঙ্গ লাভের শর্ত কী? তিনি বললেন: মানুষকে আনন্দ দেবে এবং উপকার করবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করার মাঝেই সংশ্রবের সমূহ বিপদ নিহিত। নিজের চেয়ে অন্যের স্বার্থ ও শান্তিকে অগ্রাধিকার দিলেই পুণ্য লাভ করবে উপকৃত হবে।

একজন দরবেশ বলেন, একবার আমি কূফা হতে পবিত্র মক্কার উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হজরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁর সাথে থাকার জন্য তাঁর কাছে আরজ করলাম।

তিনি বললেন সাহচর্যের জন্য প্রয়োজন একজন আমীর তথা নেতার অন্যরা যার আদেশ পালন করবে। তুমি আমীর হতে চাও না আজ্ঞানুবর্তী।

আমি বললাম: আপনি আমির হবেন আর আমি আপনার হুকুম পালন করব।

তিনি বললেন: আমার আদেশ মোতাবেক চলবে তো? আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ তা-ই হবে।

আমরা প্রথম মনযিলে অবতরণ করার পর তিনি বললেন, তুমি বস। আমি বসে থাকলাম। তিনি কূপ থেকে পানি উঠালেন। লাকড়ি সংগ্রহ করলেন এবং চুলায় আগুন জ্বালিয়ে আমাকে গরম রাখার ব্যবস্থা করলেন। আমি কোন কাজ করতে অগ্রসর হলেই বলতেন, তুমি তোমার শর্ত মেনে চল।

রাতে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। তিনি তার গুদরী খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং সারারাত আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। গুদরী আমার শরীর হতে একটু এদিক সেদিক সরে গেলে তিনি সাথে সাথে ঠিক করে দিতেন। লজ্জায় আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেন– তোমার শর্ত ঠিক রাখ, কাজেই আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

ফজরের পর আমি বললাম: হে শায়খ! আজ আমি আমির হব।

তিনি বললেন: বেশ ভালো কথা!

আমরা যখন রাতে মনযিলে অবতরণ করলাম তখন তিনি গতকালের ন্যায়ই কাজ শুরু করলেন। আমি বললাম: আমি আমির। আপনি আমার নির্দেশানুযায়ী চলুন।

তিনি বললেন: যে ব্যক্তি আমিরকে কাজ করার কষ্টে ফেরে সে-ই নির্দেশ অমান্যকারী। আমার আমিরের খেদমত করাই কর্তব্য।

এভাবেই আমরা মক্কা পর্যন্ত পৌঁছলাম। লজ্জায় আমি তার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু মিনায় তিনি আমাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, বৎস! এভাবেই দরবেশের খেদমত করা উচিত। আমি যেমন তোমার সাথে স্নেহময় ব্যবহার করেছি তুমিও তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহার কর।

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন:

صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ خَدَمْتُهُ فَوَ اللهِ مَاقَالَ لِىْ اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِيْ بِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَلاَ بِشَيْءٍ لَمْ اَفْعَلْهُ لِم لاَفَعَلْتَ كَذَا ـ

"আমি দশ বছর পর্যন্ত মহানবি ﷺ এর সান্নিধ্যে থেকে তার খেদমত করি। কিন্তু আল্লাহর কসম! এই দীর্ঘ সময়ে তিনি আমার প্রতি উহ্ শব্দ পর্যন্ত করেন নি। আমি কোন কাজ করলে তিনি কখনও জিজ্ঞেস করতেন না যে, তুমি কেন এই কাজ করেছ? আবার কোন কাজ না করলেও জিজ্ঞেস করেন নি কেন তুমি ঐ কাজ কর নি।"

দরবেশদের শ্রেণিবিভাগ এবং তাঁদের কর্তব্য

দরবেশ দু' প্রকার। যথা:

১. যাঁরা একাগ্রতার সাথে আল্লাহর কাজে লেগে থাকে এবং তার দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে একস্থানে স্থায়ী হয়ে যায়।
২. যাঁরা মুসাফির, সত্যের সন্ধানে দেশ-বিদেশে সফর করে।

শায়েখগণ প্রথম প্রকারের দরবেশদের খেদমতকে মর্যাদাসম্পন্ন বলেছেন। কারণ, তারা এদিক-সেদিক ঘুরে-ফিরে জীবিকা অর্জন করতে পারেন না।

কিন্তু এই মুকীমদের কর্তব্য মুসাফিরদের নিজের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ভাবা এবং তাদের খেদমত করা। কারণ মুকীম নিজের বাড়িতে থেকে কিছুটা আসবাব উপকরণের মালিক থাকেন। অথচ মুসাফির একেবারেই সম্বলহীন।

তেমনি যিনি বৃদ্ধ তার কর্তব্য যুবককে নিজের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান করা এবং বিশ্বাস করা যে যুবক আমার চেয়ে কম বয়স্ক এবং কম পাপ করেছে। অপর দিকে যুবকের কর্তব্য বৃদ্ধকে এই মনে করে শ্রদ্ধা করা যে তিনি আমার চেয়ে বয়স্ক, আমার চেয়ে বেশি পুণ্যের কাজ করে আল্লাহর স্নেহের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।

মুকীম লোকের আদব

যখন কোন দরবেশ (সত্যিকারের মুমিন) কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তখন তার জন্য নিম্নোক্ত আদবগুলো মেনে চলা আবশ্যক।

তার কাছে কোন মুসাফির আসলে তাকে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করবে। যেমন হজরত ইবরাহীম (আ) মেহমানদের সাথে করতেন।

তার মেহমানদারী সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আছে–

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ –

"তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতেন এবং সাথে সাথেই একটি হৃষ্ট-পুষ্ট ভুনা বাছুর নিয়ে আসতেন।"

দরবেশের কর্তব্য তিনি কখনও মুসাফিরকে জিজ্ঞেস করবেন না। যে আপনি কে, কোথা থেকে আসলেন এবং কোথায় যাবেন?

এসব কিছু জিজ্ঞেস করা শিষ্টতা বিরোধী। তাঁর যাওয়া আসা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে বলে ভাববে।

আরও মনে করবে তাঁর নাম আবদুল্লাহ কিংবা আবদুল হক।

তারপর খেয়াল করবে মেহমান নির্জনে থাকতে না লোক সংশ্রবে থাকতে পছন্দ করেন। যদি তিনি একা থাকতে ভালোবাসেন, তবে তাকে সেই ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি লোক সংশ্রবে থাকা পছন্দ করেন তাহলে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করবে, কথাবার্তা বলবে। এর ফলে পারস্পরিক স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি পায় এবং মেহমান আনন্দ পান।

মেহমান রাতে শয়ন করলে তার পা টিপে দেবে। আর যদি তিনি পা দাবানো পছন্দ না করেন তাহলে অযথা তাঁকে বিরক্ত করবে না।

সকালে তার গোসলের ব্যবস্থা করে দেবে। মুকীমের সাধ্যে কুলালে তাকে নতুন জামা-কাপড় দেবে। নতুবা তাঁর ময়লা কাপড় ধৌত করে দেবে। নিজে মেহমানের সেবা করবে কোন অপরিচিত বা অজ্ঞ লোককে খেদমত করতে দেবে না। আর এই বিশ্বাস রাখবে যে মেহমানকে পাকসাফ

করতে এবং তৃপ্তি দিতে সক্ষম হলে আমি যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করে তৃপ্ত হব।

ঐ শহরে কোন পরহেযগার আলেম, বুযুর্গ বা নেক ব্যক্তি থাকলে মেহমানকে তার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা বলবে। যদি তিনি সাক্ষাৎ করতে রাজি হন ভালো। নতুবা তাঁকে পীড়াপীড়ি করবে না। কিন্তু দুনিয়াদার ধনী বা রাজা-বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে বলা কোনমতেই বৈধ নয়।

কিন্তু নিজের দরবেশী ফলাও করে প্রচার করার জন্য মেহমানকে দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা মেহমানের এমন খেদমত না করাই ভালো। কারণ এরূপ করলে মেহমানকে অপদস্থ করা হয়।

আমি একবার এরূপ মুকীম পীরের হাতে পড়ে খুবই নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। এই স্বার্থপর আমাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরাচ্ছিল। আমি শুধু লৌকিকতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তার পেছনে পেছনে ঘুরছিলাম। আমি মনে মনে বললাম– আমি যদি কোনদিন মুকীম হই তাহলে মেহমানের সাথে এরূপ ব্যবহার করব না।

মেহমান যদি মেজবানের নিকট পার্থিব কোনকিছু চান তাহলে সামর্থ্যে কুলালে তাকে দান করবে। যদি সাধ্যে না কুলায় তাহলে না দিলে কোন ক্ষতি হবে না। যারা আল্লাহর জন্য দরবেশী গ্রহণ করেছেন তাঁদের পক্ষে এমনকিছু চাওয়াও ঠিক নয়। দরবেশদের কাছে এমন কিছু না চেয়ে বরং ধনী ও রাজা-বাদশাহদের কাছে যাওয়া উচিত। মোটের উপর নিজের সাধ্যের বাইরে কাউকেও কিছু সাহায্য করার জন্য কেউ বাধ্য নয়।

একবার আমি (গ্রন্থকার) ইরাকে মুকীম থাকাকালীন যে যা আমার কাছে চাইত তা পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। দেখা গেল আমি বেশ ঋণী হয়ে পড়েছি। কীভাবে ঋণ পরিশোধ করব সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম।

আমার এই অবস্থা দেখে তৎকালীন বুযুর্গদের একজন বললেন বৎস! অপরের চিন্তা করে তুমি এমন বিপদে জড়িত হয়োনা যা তোমার আল্লাহর

পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর বান্দার জন্য আল্লাহই তো যথেষ্ট। কোন বান্দা তার জন্য যথেষ্ট নয়।" তার এই নসিহত আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করল।

সফরের আদব

দরবেশের সফরের (দেশ ভ্রমণ) সর্বপ্রধান বিষয় হলো পার্থিব কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে না হয়ে কেবল আল্লাহ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হতে হবে। যেমন– হজ্জ, ওমরা, জিহাদ, জ্ঞানার্জন, কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কিংবা কোন পবিত্র স্থান জিয়ারত করা।

প্রথমত হাদীস শরীফে এসেছে, মক্কার কাবা, মদিনায় মসজিদে নববী জেরু-জালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস ব্যতীত অন্য কোন স্থানের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করা বৈধ নয়।"

দ্বিতীয়ত সফর করতে হলে প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে নিয়ে বের হবে। যেমন লোটা, জায়নামায, জুতা, লাঠি, প্রয়োজনীয় কাপড়, বিছানা, রশি, চিরুনী, ছুরি, সুরমাদানী এবং তেল। আল্লাহ যদি সামর্থ্য দান করেন তবে তার চেয়েও প্রয়োজনীয় বেশি কিছু সাথে নেওয়া যায়। কারণ দুনিয়াদারের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে আল্লাহর পথের বাধা হয়ে দেখা দেয়, তা-ই আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

শায়খ আবুল মুসলিম ফারেস ইবনে গালেব ফারেসি (র) বলেন: আমি আবু সাঈদ আবুল খায়র ফজলুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ (র) এর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে তার দরবারে উপস্থিত হই। আমি দেখলাম তিনি পায়ের উপর পা রেখে গদীতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তার গায়ে বহু মূল্যবান একখানি মিসরীয় চাদর শোভা পাচ্ছিল।

অপরদিকে আমার পরিধেয় ছিল ময়লায় তেল চিটচিটে এবং শত তালিযুক্ত। কৃচ্ছ্র সাধনায় আমার দেহ ছিল জরাজীর্ণ। তার অবস্তার বিপরীতে

আমার অবস্থার তুলনা করে আমি মনে মনে বললাম, তিনিও দরবেশ আর আমিও দরবেশ। তিনি এত আরাম আয়েশে রয়েছেন আর আমি কৃচ্ছ্র সাধনায় এবং অনাহারে থেকে জরাজীর্ণ। এখানে এসে আমার কী লাভ হলো।

তিনি তাঁর কাশফের মাধ্যমে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, হে আবু মুসলিম! তুমি কোন কিতাবে পেলে যে আত্মদর্শক দরবেশ হতে পারে? তুমি শুধু তোমাকেই দেখেছ। নিচে বসা ব্যতীত তোমার স্থান কোথায় হতে পারে? আমি আমাকে ছাড়া আল্লাহকে দেখেছি। ফলে তিনি আমাকে গদীতে বসিয়েছেন। যে ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করে তার নিকট হতে আল্লাহ অতি দূরে আল্লাহ যাকে নেয়ামত দান করেন তার কর্তব্য উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। আর যদি আল্লাহ কাউকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েও তাকে নৈকট্য দান করেন তজ্জন্য তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

একথা শুনে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম এবং আমার চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসলে আমি তওবা করলাম এবং আল্লাহ আমার তওবা কবুল করলেন।

মুসাফিরকে অবশ্য সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে। যখন কোন মুকীমের কাছে পৌছবে তখন তাকে খুব সম্মান করবে এবং সালাম করবে। প্রথমে বাম পা জুতা হতে বের করবে। কারণ মহানবি ﷺ এরূপ করতেন। জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা জুতায় প্রবেশ করাবে তারপর বাম পা। পা ধৌত করার কালে প্রথমে ডান পরে বাম পা ধৌত করবে।

মনযিলে উপস্থিত হয়ে দরবেশের সাথে আলোচনা করার আগে সুন্নত মোতাবেক প্রথমে দু' রাকআত নফল নামায আদায় করবে। যা না হলেই নয় তা ছাড়া কোন কিছু চেয়ে মুকীমকে বিরক্ত করবে না। তার সাথে বাদানুবাদ করবে না। অন্য কারও সাথে বাড়াবাড়ি করবে না। এমনকি নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা বর্ণনা করে মুকীমকে কষ্ট দিবে না। মুকীম কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে বললে যথাসম্ভব তার কথা মোতাবেক কাজ করবে।

মুকীমের কোন কথা মনমতো না হলে তর্কবিতর্ক করবে না বরং ভাববে নিশ্চয়ই এই কথার কোন ব্যাখ্যা রয়েছে। মুকীমের আস্তানায় বেশিদিন থেকে তার গলগ্রহ হবে না।

মোটকথা দরবেশ মুকীম হোক বা মুসাফির তার কেবল উদ্দেশ্য থাকতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধান ও কামনা করা। সর্বক্ষণ সুন্নতের পায়রবী করবে।

পানাহারের আদব

পানাহার মানুষের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। কারণ, পানাহার করা ব্যতীত কেউ জীবিত থাকতে পারে না। পানাহারের প্রথম আদব হলো, পানাহারে বাড়াবাড়ি না করা। অর্থাৎ বেশি খাবে না এবং সাধ্যের বাইরে সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে না।

শুধু পেটের ধান্ধায় সদা-সর্বদা থাকবে এটাও উচিত নয়। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন:

مَنْ كَانَ هِمَّتُهُ مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفِهِ كَانَ قِيْمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ـ

"মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং শ্রম যদি উদর পূর্তির উদ্দেশ্যেই হয় তবে তার মানমর্যাদা এরূপই হবে যা তার পেট হতে বের হয়।"

বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথের পথিক তাঁদের পক্ষে অধিক পানাহারের চেয়ে এমন ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। হজরত আবু ইয়াযিদ (র) এর মুরিদগণ তার নিকট জানতে চাইলেন, ক্ষুধার্ত থাকাকে আপনি কেন এতো পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন।

তিনি জবাব দিতেন: অভিশপ্ত ফেরআউন যদি ক্ষুধার্ত থাকত তাহলে সে কখনও أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু" বলত না। কারুন খেতে না পেলে সে কখনও আল্লাহর নাফরমানী করত না। সা'লাবা যতদিন অভাবগ্রস্ত ছিল ততদিন সর্বজনপ্রিয় ও সাহাবা ছিল। যখন পেট পুরে খেতে পেল তখন মুনাফিক হয়ে গেল।

সালাবা মহানবি ﷺ এর সাহাবা ও সর্বজনপ্রিয় ছিল। কিন্তু অভাবগ্রস্ত ছিল। সম্পদশালী হওয়ার জন্য মহানবি ﷺ এর নিকট দোয়াপ্রার্থী হলো। মহানবি ﷺ বললেন: অর্থ-সম্পদ তোমার জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু তার বারবার অনুরোধে দোয়া করলেন। যার দরুন তার ছাগল ভেড়া এত পরিমাণ হলো যে তাদের স্থানের সংকুলান করার জন্য মদিনায় বাইরে বহুদূরে চলে যেতে হয়। প্রথমে সে মহানবি ﷺ এর পেছনে পাঞ্জেগানা এবং পরে জুমআও আদায় করা বাদ দিল। অতঃপর যাকাত দেওয়াও বন্ধ করে দিল। তার সম্পদে ভাটা পেড়ে গেল। হজরত আবু বকরের খেলাফতের সময় যাকাত নিয়ে আসলে হজরত আবু বকর যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। সে যে ইসলাম বহির্ভূত হয়ে গিয়েছিল এটাই তার প্রমাণ।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞

"তাদের স্বীয় অবস্থার উপরই ছেড়ে দিন। খুব পানাহার করুক ও আনন্দ করুক এবং নিজেদের আশায় ডুবে থাকুক। অতি সত্বরই তারা তাদের কার্যফল ভোগ করবে।" (সূরা: হিজর– ৩)

আরও ঘোষণা করেছেন:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ـ

"কাফের সম্প্রদায় পরিণাম সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার খুব মজা নিচ্ছে এবং পশুর ন্যায় উদর পূর্তি করে খায়। অথচ আগুন হবে তাদের বাসস্থান।" (সূরা: মুহাম্মাদ– ১২)

হজরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলতেন: হালাল বস্তু দ্বারা পেট পূর্ণ করার চেয়ে আমি মনে করি মদ্য পান করে পেট ভরা অনেক ভালো।

লোকে জানতে চাইল, এটা আপনি কেমন কথা বললেন? তিনি বললেন: মানুষ যখন পেট ভরে মদ্যপান করার পর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে তখন আল্লাহর সৃষ্টি তার অনিষ্টতা হতে মুক্তি পায়। কিন্তু যখন সে পেট ভরে খায় তা হালাল হলেও তার নফস উত্তেজিত হয়, কামরিপুর তাড়না বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য সে বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই বুযুর্গগণ দরবেশদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন: তাঁরা রোগীর ন্যায় খায়, গভীর ঘুমে আক্রান্ত না হলে ঘুমায় না এবং সন্তানহারা মায়ের মতো কম কথা বলে।

পানাহারের দ্বিতীয় আদব হচ্ছে: যথাসম্ভব একাকী না খাওয়া বরং অন্যান্য ভাইদের সাথে নিয়ে খাওয়া। কারণ, মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

شَرُّ النَّاسِ مَنْ اَكَلَ وَحْدَهُ وَضَرَبَ عَبْدَهُ وَمَنَعَ وَفْدَهُ ـ

"যে একা একা খায়, স্বীয় গোলামকে প্রহার করে এবং নিজের জমায়াতের লোকের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"

তৃতীয় আদব বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা। দস্তরখানের আহার্য এদিক সেদিক করবে না যাতে অন্যে খারাপ কিছু মনে না করে। অন্যকে খাওয়ার অগ্রাধিকার দিবে, ছোট গ্রাস নিবে, তাড়াহুড়া করে খাবে না। এটাই খাওয়ার সুন্নত পন্থা।

খাওয়ার পর বলবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

দরবেশের উচিত দরবেশের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান না করা। অবশ্য যতটা সম্ভব দুনিয়াদারের দাওয়াত গ্রহণ করবে না ও তাদের নিকট যাবে না এবং তাদের নিকট কিছু চাইবে না। কেননা এতে ধার্মিক এবং তরিকতপন্থীদের অবমাননা হয়। এরা দরবেশদের করুণার পাত্র মনে করে।

অবশ্য এতটাও স্মরণ রাখতে হবে যে শুধু সম্পদশালী হলেই দুনিয়াদার হয় না। সম্পদশালী লোকও দরবেশ হয়। অপরদিকে দরিদ্র লোকও দুনিয়াদার হতে পারে। দরবেশীর সম্পর্ক অন্তরের সাথে– সম্পদের সাথে নয়।

অন্য আর একটি আদব হলো– পানাহারের বেলায় এটা খাব তো ঐটা খাব না এমন কথা বলতে নেই। বরং যা সম্মুখে আসবে তাই গ্রহণ করবে। শুধু পেট ভরার জন্য কাউকেও কষ্ট দিবে না। হজরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন: মহানবি ﷺ কখনও কোন খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করতেন না। যা তার সম্মুখে রাখা হতো ইচ্ছা হলে তা হতে গ্রহণ করতেন ইচ্ছা না হলে খেতেন না।

চলাফেরার আদব

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ۝

"আল্লাহর বান্দা বিনয়ের সাথে মাটিতে চলাফেরা করে।"

(সূরা: ফুরকান– ৬৩)

চলাফেরা করার সময় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে তার যে পদক্ষেপ হচ্ছে তা আল্লাহর পথে, আল্লাহর নির্দেশের দিকে হচ্ছে না তার বিরুদ্ধে হচ্ছে। আল্লাহ না করুন যদি বিরুদ্ধে চলে তাহলে সাথে সাথে তওবা করবে এবং সেদিক চলা হতে বিরত থাকবে।

দরবেশের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার দিকে হতে হবে। বর্ণিত আছে হজরত দাউদ তায়ী (র) একদিন ওষুধ পান করেন। মুরিদগণ আরজ করলেন, আপনি কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারী করুন তাহলে ওষুধ ক্রিয়াশীল হবে।

তিনি বললেন: আমার ভয় হচ্ছে না জানি আমার এই পদক্ষেপ আল্লাহর কাছে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় কি না যে, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য পদক্ষেপ করেছ। কারণ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞

"তাদের পা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে তারা দুনিয়ায় কী উপার্জন করেছে।"
(সূরা: ইয়াসীন- ৬৫)

দরবেশদের কর্তব্য চলার সময় ঘুরাফেরা করতে এবং এদিক সেদিক লক্ষ করা থেকে বিরত থাকা। অন্যান্য লোকের সাথে গমন করলে আগে চলা হতে বিরত থাকবে। কারণ এতে আত্মগর্ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পেছনে চলা এবং বানোয়াট বিনয়তা প্রকাশ করবে না। কারণ এটাও এক প্রকার গর্ব। সাধারণ লোকের ন্যায় চলাফেরা করবে। পথ চলাকালীন ময়লা বা অপবিত্র বস্তু যেন জুতায় না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবে।

কয়েকজনের সাথে চললে পথিমধ্যে কারও সাথে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলবে না এবং নিজের জন্য অপরকে অপেক্ষমান রাখবে না। দ্রুতবেগে চলবে না। কারণ এটা লোভীদের অভ্যাস। আর খুব আস্তেও চলবে না। এটা গর্বিত লোকের চলন। মধ্য গতিতে চলাফেরা করবে।

নিদ্রার আদব

নিদ্রা যাওয়া সম্পর্কে শায়েখদের মতবিরোধ:

নিদ্রা যাওয়া সম্পর্কে শায়েখদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। একটি দলের মতে ঘুমে অত্যন্ত কাতর না হওয়া পর্যন্ত মুরিদের জন্য নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয়। শিবলী (র) বলেন: আল্লাহ তায়ালা আমাকে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রা যায় সে অলস হয় আর যে অলস হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়।

হজরত আলী ইবনে সহল (র) বলেন, যে নিদ্রা যায় তাকে অলসতায় পায়। কাজেই প্রেমিকের কর্তব্য দিবারাত্র কোন সময়ই নিদ্রা না যাওয়া। কারণ তন্দ্রাভিভূত হলেই তার উদ্দেশ্য তার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা হজরত দাউদ (আ)-কে ওহি পাঠালেন, হে দাউদ! যে ব্যক্তি আমার মহব্বতের দাবি করে এবং রাত আগমন করলে নিদ্রিত হয়ে পড়ে সে তার দাবিতে মিথ্যুক।

অপর দিকে অন্য সম্প্রদায়ের মতে জাগ্রত থাকার চেয়ে নিদ্রা যাওয়া মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাকে বান্দার জন্য আল্লাহর দান মনে করে। হজরত জোনায়েদ (র) বলেন, জাগ্রত থাকা আল্লাহর পথে আমাদের বিষয় আর নিদ্রিত হওয়া আমাদের জন্য আল্লাহর কাজ। যে কাজ আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা আমাদের ইচ্ছাধীন কাজের চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন: নিদ্রা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে দান। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: পাপী লোকের নিদ্রিত হওয়া অপেক্ষা অধিক চিন্তিত হওয়ার বিষয় শয়তানের নিকট আর কিছুই নেই। শয়তান বলে, এই ব্যক্তি কখন জাগ্রত হবে আর আল্লাহর নাফরমানী করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ ধরে শয়তান তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَنْتَبِهَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ -

"তিন ধরনের লোক যাদের আমলনামা লেখা হতে কলম বিরত রাখা হয়েছে। প্রথম নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়। দ্বিতীয় শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। তৃতীয় উন্মাদ যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থ না হয়।"

সঠিক সিদ্ধান্ত

মোট কথা ফরজ, ওয়াজিব এবং স্বীয় দায়িত্বকে অবহেলা করে নিদ্রা যাওয়া যেমন ভুল তেমনি জোর জবরদস্তি করে নিদ্রাকে ঠেকিয়ে রাখাও ভুল।

যেমন হজরত শিবলী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে লবণ মিশ্রিত এক পেয়ালা পানি নিজের নিকট রাখতেন। নিদ্রা আসলে সেই পানি দিয়ে চোখ ধৌত করতেন। ফলে নিদ্রা দূর হয়ে যেত। কিন্তু মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করাই আল্লাহর শরীয়তের নিয়ম।

মহানবি ﷺ হজরত আবু জর গেফারি এবং হজরত সালমান ফারসি (র) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়িয়ে দেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন আহলে সুফ্ফার নির্ভীক সৈনিক এবং বাতেনের নেতা।

একদিন হজরত সালমান (রা) হজরত আবু জর গেফারি (র) এর ঘরে যান। হজরত আবু জরের স্ত্রী স্বামীর সাক্ষাতেই অভিযোগ করলেন যে, আপনার এই ভাই প্রত্যহ রোযা রাখেন এবং সারারাত ইবাদত বন্দেগি করেন।

হজরত সালমান (রা) বললেন: খাবার কিছু থাকলে দিন। খাবার দিলে হজরত সালমান (রা) বললেন: হে ভাই! আপনি আমার সাথে বসে খান। এটা আপনার ফরজ রোযা নয়। হজরত আবু জর তার সঙ্গে খেতে বসলেন।

রাতে হজরত সালমান বললেন: নিদ্রা যাওয়াতেও আপনি আমার অনুসরণ করুন। কেননা আপনার উপর দেহের হক রয়েছে। তেমনি আপনার স্ত্রীরও আপনার উপর হক রয়েছে।

দ্বিতীয় দিন হজরত আবু জর (রা) মহানবি ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হলে মহানবি ﷺ বললেন: সালমান তোমাকে যা কিছু বলেছে তা-ই আমার অভিমত।

নিদ্রা যাওয়ার আদব

প্রতিবার যখনই নিদ্রা যাবে তখন মনে করবে এটাই আমার শেষ নিদ্রা। কাজেই পাপ কাজ কর্ম হতে তওবা করবে। কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলে তাকে সন্তুষ্ট করবে। পবিত্র অবস্থায় শুবে। ডান হাতের উপর মাথা রেখে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করে বলবে যদি এই নিদ্রা হতে জাগ্রত হই তাহলে আল্লাহর নাফরমানী করব না। বরং এমন কিছু করার নিয়তও করব না।

চুপ থাকা ও কথা বলা

শায়েখদের মতবিরোধ:

এক সম্প্রদায়ের মতে কথা না বলে চুপ করে থাকাই উত্তম। আবার অন্য আর সম্প্রদায়ের মতে চুপ করে থাকার চেয়ে কথা বলাই উত্তম।

যারা কথা বলাকে ভালো বলেন, তাদের মতে নিজের অবস্থা প্রকাশ করা আল্লাহর নির্দেশ। কারণ, এতে দাবি ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় যদি কোন ব্যক্তি হাজার বছর অন্তরে এবং বাতেনে আরেফ থাকে আর তা প্রকাশ করায় যদি শরীয়তের কোন বাধা না থাকে তাহলে যতদিন পর্যন্ত মৌখিক স্বীকৃতি উক্ত মারেফাতের সাথে শামিল না হবে ততদিন সে কাফেরের দলে পরিগণিত হবে। আল্লাহ যতটা প্রশংসা করেছেন তা মুমিনদের জন্য করেছেন, আর মুমিনদের জন্য মৌখিক স্বীকৃতিরও দরকার রয়েছে।

তাই মহানবি ﷺ কে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۔ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞

"হে নবিবর! আপনি বলে দিন আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী এবং যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাসী এবং আমরা ঐ শিক্ষাতেও বিশ্বাসী যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুবের প্রতি এবং তাঁদের বংশধরের প্রতি নাযিল হয়েছে। মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাঁদের প্রভু যা দান করেছেন তাঁদের প্রতিও আমাদের ঈমান আছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন ধরনের তারতম্য করি না। আমরা আল্লাহর অনুজ্ঞ ও মুসলমান।"

(সূরা: আলে-ইমরান– ৮৪)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা মহানবি ﷺ কে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞

"হে মুহাম্মদ! স্বীয় প্রভুর নেয়ামত এবং তার অনুগ্রহ বর্ণনা করুন।"

(সূরা: দোহা– ৮৪)

আরও বলেছেন:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۞

"স্বীয় প্রভুকে অধিকহারে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তসবিহ পড়।" (সূরা: আলে-ইমরান- ৪১)

আরও বলেছেন- "আমাকে স্মরণ কর" আমি সাড়া দিব। আরও এরশাদ করেছেন:

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۞

"কান্নাকাটি কর এবং গোপনে তোমার প্রভুকে ডাক।"(সূরা: মুমিন- ৬০)

এই ব্যাপারে একজন শায়খ বলেছেন: যে ব্যক্তি স্বীয় ঘটনা বিবৃত না করে তার পরিণতি সঠিক হবে না। ব্যক্ত করার শক্তি আল্লাহর দান- আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত। তার কৃতজ্ঞতা এভাবে আদায় হতে পারে যে তাকে বান্দা আল্লাহর কাজে লাগায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ۞

"যে ব্যক্তি মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎকাজ করে তার মতো সৎ ব্যক্তি আর কে হতে পারে?" (সূরা: আয্-যুখরুফ- ২৬৩)

আরও বলেন:

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ۞

"যে সদকা দান করার পর কষ্ট দেওয়া হয় তার অপেক্ষায় মিঠা কথা বলে দেওয়াই উত্তম।" (সূরা: আল-বাকারা- ২৬৩)

কাজেই দেখা যাচ্ছে কথা বলাই শুধু ভালো নয় বরং প্রমাণিত হয় কথা বলা অত্যাবশ্যক এবং ফরজ।

অপর সম্প্রদায়ের অভিমত এই কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে কথা বলার শক্তি আল্লাহর বড় নেয়ামত। তবে এই প্রকাশ্য নেয়ামতের মধ্যে বহু বিপদও লুক্কায়িত রয়েছে। কথা বলা শরাবের মতো। একবার কথা বলার অভ্যাস

হয়ে পড়লে তা থেকে বিরত থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَخْوَفُ عَلٰى اُمَّتِىْ اللِّسَانِ -

"আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা ভয় করি তাদের কথা বলাকে।"

আরও এরশাদ করেছেন:

مَنْ صَمَتَ نَجٰى -

"যে চুপ রয়েছে সে মুক্তি লাভ করেছে।"

এই সম্প্রদায়ের বুযুর্গগণ বলে থাকেন, অর্থহীন দাবি কপটতা, দাবিহীন অর্থ আন্তরিকতা। অর্থাৎ ভেতরে ঈমান না থাকা অবস্থায় যদি কেউ ঈমানের দাবি করে তাহলে তা হবে তা মুনাফেকী। আর যদি ভেতরে ঈমান থাকে আর আল্লাহর আনুগত্যকারী হয় তবে দাবি না করলেও প্রকৃতপক্ষে তা আন্তরিকতা।

প্রকাশ করার প্রয়োজন সেখানেই হয় যেখানে যার জন্য বর্ণনা করা হয় সে ঐ ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহর তা প্রয়োজনই নেই যে তার সম্মুখে বান্দা কিছু দাবি করুক অথবা বর্ণনা করুক।

হজরত জোনায়েদ (র) বলতেন: যে আল্লাহকে চিনতে সক্ষম হয়েছে তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে। বান্দা আল্লাহকে কী সম্বন্ধে অভিহিত করবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لاَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۞

"মানুষেরা কি এটাই মনে করে যে আমি তাদের কানাঘুষা এবং গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত নই? না। আমি সব কিছুই অবগত আছি। তথাপি আমার ফেরেশতাগণ তাদের পাশে পাশে থেকে তাদের সব কিছু লিখে রেখেছে।" (সূরা: যুখরুফ- ৮০)

সঠিক সিদ্ধান্ত

আমি (গ্রন্থকার) বলি বেশি কথা বলা বা চুপ করে থাকা সময়মতো প্রয়োজনবোধে উভয়েই আপন আপন স্থানে ঠিক আছে। কথা বলা দু' প্রকার, চুপ করে থাকাও দু' প্রকার। প্রথম প্রকার সত্য কথা দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা কথা।

চুপ করে থাকার প্রথম প্রকার চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার পর চুপ করে থাকা। অন্য প্রকার চুপ করে থাকা অলসতা ও অবজ্ঞার জন্য হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কথা বলার সময় খেয়াল রাখবে যে তার কথা বলা যদি সত্যের জন্য হয় তাহলে চুপ করে থাকা অপেক্ষা কথা বলাই ভালো। আর যদি অযথা হয় তবে চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

তদ্রূপ কোন চিন্তা-ভাবনা করার জন্য অথবা কথা বলার উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে চুপ করে থাকাই ভালো। আর যদি অলসতা ও অজ্ঞতার জন্য চুপ করে থাকতে হয় তাহলে এই অলসতা ও অজ্ঞতা অবশ্য দূর করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু এক পকারের অথর্ব লোক আছে যারা মিনার এবং কুপের মাঝে কী পার্থক্য তা বুঝতে পারে না। তারাও চুপ করে থেকে স্বীয় বুযুর্গী প্রকাশ করে।

কথা বলার আদব

কথা বলার আদব হলো– অযথা না বলা, প্রয়োজনবোধে সত্য বলা। কথা না বলার আদব হচ্ছে অজ্ঞ না হওয়া এবং স্বীয় অজ্ঞতায় তৃপ্ত না থাকা এবং অজ্ঞতা দূর করার অলস না হওয়া। তাছাড়া বুযুর্গদের বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় কমবেশি না করা। নিজের কথা পৃথকভাবে বলবে। আবার এমন কোন কথা বলবে না যা সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম হয়। সহজ ও সরল ভাষায় কথা বলবে।

দরবেশদের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করবে। অহেতুক কথা বলবে না। তাছাড়া কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত চুপ করে থাকাই ভালো। কখনও অন্যায় অত্যাচার দেখে চুপ করে থাকা দরবেশের জন্য উচিত নয়। অন্যায় দেখে যে চুপ করে থাকে মহানবি ﷺ তাকে বোবা শয়তানের সাথে তুলনা করেছেন।

চাওয়া বা প্রার্থনা করা

চাওয়া সম্বন্ধে মতভেদ

চাওয়া তথা অন্য লোকের নিকট কিছু যাঞ্চা করা সম্পর্কেও দরবেশদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট কিছু চাওয়া এবং সাহায্য কামনা করা অবৈধ। অন্য সম্প্রদায় বলে– পার্থিব কোন কাজের জন্য বান্দার নিকট কিছু চাওয়া জায়েয।

প্রথম সম্প্রদায়ের মতে অন্যের কাছে কিছু চাওয়া আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যার ফলে আল্লাহর দরবার হতে দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বর্ণিত আছে, হজরত রাবেয়া বসরিয়াকে এক দুনিয়াদার ব্যক্তি বলল: আপনার যদি কোন প্রয়োজন হলে আমাকে বলুন। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

হজরত রাবেয়া বললেন: ওহে, আমি তো দুনিয়ার মালিকের কাছে চাইতেও লজ্জাবোধ করি। তুমি তো আমার মতোই একজন লোক! তোমার কাছে চাইতে কেন লজ্জাবোধ করব না?

অন্য আর একটি কাহিনিতে বর্ণিত আছে, খলিফা আবু মুসলিমের শাসনামলে এক দরবেশকে চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলে পাঠানো হয়। সে রাতেই আবু মুসলিম মহানবি ﷺ কে স্বপ্নে দেখলেন। মহানবি ﷺ তাকে বলছেন– "হে আবু মুসলিম! আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমার কাছে এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, তুমি আল্লাহর এক নিরপরাধ বন্ধুকে জেলখানায় বন্দি করেছ। এখনই গিয়ে তুমি তাঁকে মুক্তি দাও।"

দরবেশকে বের করে আনলে আবু মুসলিম তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে বললেন: আপনার কোনকিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলুন।

দরবেশ বললেন– হে আমির! যার মালিক আবু মুসলিমকে তার আরামদায়ক বিছানা থেকে অর্ধ রাত্রে জাগ্রত করে তাঁর এক নগণ্য বান্দাকে মুক্তি দেওয়াতে পারেন তিনি ছাড়া অন্যের কাছে আমি কীভাবে সাহায্য কামনা করতে পারি।

আবু মুসলিম এ কথা শুনে কাঁদতে শুরু করলেন এবং দরবেশও সেখান থেকে চলে গেলেন।

অপর এক সম্প্রদায় বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধুকে বলেছেন:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

"যাঞ্চাকারীকে ধমকি দিয়ো না।" (সূরা: আদ-দোহা– ১০)

আরও বলেন:

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۝

"তাঁরা মানুষের পেছনে লেগে থেকে যাঞ্চা করে না।"

(সূরা: আল-বাকারা– ২৭৩)

লোকের নিকট দরবেশদের চাওয়া জায়েয। কিন্তু পেছনে লেগে থাকা কোনভাবেই ঠিক নয়। মহানবি ﷺ নিজেও সাহাবা এবং ধর্মের কাজের জন্য লোকের নিকট চেয়েছেন। অবশ্য তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, সুন্দর মুখমণ্ডলের অধিকারীর নিকট চাও।

যে উদ্দেশ্যে চাওয়া যায়

শায়েখগণ বলেন: নিম্নোক্ত কারণে অপরের কাছে চাওয়া যেতে পারে।

১. অন্তঃকরণকে চিন্তামুক্ত করার জন্য। যেমন অত্যন্ত ক্ষুধার সময় কারও নিকট খাদ্যদ্রব্য চাওয়া যেন ক্ষুধা নিবারণ হওয়ার পর একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া যায়। পানাহারের অপেক্ষায় বসে থাকা দরবেশের জন্য অনুচিত।

হজরত বায়েযিদের একজন মুরিদের নাম ছিল শফীক। হজরত বায়েযিদ তার অন্য এক মুরিদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, শফীকের অবস্থা কী?

উক্ত মুরিদ বললেন: তিনি জনমানব হতে দূরে গিয়ে তাওয়াক্কুল করে রয়েছেন।

হজরত বায়েযিদ বললেন: তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বলবে সে যেন দু' টুকরা রুটি দিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা না করে। যখন তোমার ক্ষুধা লাগবে তখন তুমি মানুষের কাছে দু' টুকরা রুটি চেয়ে খেয়ো। তোমার এই তাওয়াক্কুল হতে দূরে থাক। তোমার এই বদবখতীর দরুণ যেন এই শহর ও শহরবাসী ধ্বংস না হয়ে যায়।

২. নফসের রিয়াজাত করার জন্যও চাওয়া বৈধ। বরং কোন কোন সময় প্রয়োজন হয় যেন এই অবমাননা দ্বারা নফসের অহঙ্কার হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

একবার হজরত আবু বকর শিবলী (র) হজরত জোনায়েদ (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। হজরত জোনায়েদ (র) তাকে বললেন: তোমার মাঝে এখনও এই অহঙ্কার রয়ে গেছে যে, তুমি খলিফার বডিগার্ডদের কমান্ডারের ছেলে এবং সামেরার আমির। তোমার অন্তর থেকে যতদিন পর্যন্ত এই অহঙ্কার দূর না হবে ততদিন তোমার দ্বারা কোন কাজই হবে না। বাজারে যাও। সবার কাছে ভিক্ষা চাও। তারপর বুঝতে পারবে তোমার মূল্য কত!

হজরত শিবলী পীরের নির্দেশ মতো বাজারে গিয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলেন। প্রথম প্রথম লোকে ভিক্ষা দিত। তারপর একদিন সারা বাজার ঘুরেও এক টুকরা রুটি না পেয়ে পীরের কাছে ফিরে আসলেন।

তখন হজরত জোনায়েদ বললেন: এখন নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ মানুষের কাছে তোমার মূল্য কত? সুতরাং পৃথিবীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করো না। পৃথিবী যেমন তোমার প্রতি কোন মর্যাদা দেখায় না তুমিও তাকে কোন মূল্য দিয়ো না।

কাজেই এই জাতীয় চাওয়া উপার্জনের জন্য নয় নফসের রিয়াজাতের জন্য।

৩. আল্লাহর প্রতি আদব রক্ষার্থে আল্লাহর পরিবর্তে ঐসব মানুষের কাছে চাওয়া যাদের আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে তার সম্পদের জামিনদার করে রেখেছেন তাদের মাধ্যমে অপরকে দান করেন।

অর্থাৎ লোকে এর প্রতিই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে যাবতীয় সম্পদের মালিক কেবল আল্লাহ। মানুষের নিকট মানুষ যা কিছু পায় তা আল্লাহর করুণা। আর যা মানুষে না দেয় তা আল্লাহরই না দেওয়া।

বর্ণিত আছে, হজরত ইয়াহইয়া মাআয (র) এর এক মেয়ে ছিল। একদিন সেই মেয়ে মায়ের কাছে কিছু চাইলেন। মা বললেন, বেটি। আমার কাছে নয় বরং আল্লাহর কাছে চাও।

মেয়ে বললেন: মা! নফসের কামনায় আল্লাহর কাছে চাইতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আর আপনি আমাকে যা দিবেন– তাতো আল্লাহর পক্ষ হতেই দেওয়া হবে।

সঠিক সিদ্ধান্ত

অতি প্রয়োজনে দরবেশ অন্যের কাছে চাইতে পারেন। কিন্তু কারও পেছনে লেগে থাকা ঠিক নয়। অবশ্য যে কোন অবস্থায়ই আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে এবং পাওয়া না পাওয়া আল্লাহর পক্ষ হতেই মনে করবে। দরবেশ যার নিকট কিছু চান তার কর্তব্য যতটা সাধ্য দরবেশকে সাহায্য করা। কোন ভাবেই যাঞ্চাকারীকে ধমকি দিতে নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞

"প্রার্থনাকারীকে ধমকি দিয়ো না।" (সূরা: আদ্-দোহা– ১০)

আরও বলেন–

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۞

"মিষ্টি কথা এবং ক্ষমা এমন দান অপেক্ষা উত্তম যার পর কষ্ট দেওয়া হয়।" (সূরা: আল-বাকারা– ২৬৩)

চাওয়ার আদব

কারও নিকট কিছু চাইতে হলে নিম্নোক্ত আদবের প্রতি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে :

১. মানুষের নিকট চাইতে হলেও অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে আমি আল্লাহর নিকটই চাচ্ছি। মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। যদি পাওয়া অথবা না পাওয়া যায় তবে মনে করতে হবে এটা আল্লাহরই ইচ্ছা।

২. বাজারী মানুষের কাছে চাওয়া হতে বিরত থাকবে। এমন লোকের নিকট চাইবে যাদের রোজগার সম্বন্ধে হালাল হওয়ার বিশ্বাস থাকে।

৩. একান্ত প্রয়োজনেই চাইবে। সাজসজ্জা বা আরাম-আয়েশের জন্য কারও নিকট কিছু চাইবে না। সামাজিক প্রয়োজন সমাধা হলে পরের চিন্তা করবে না।

৪. মহান আল্লাহর নামকে কখনও দরবেশীর মাধ্যম করবে না। অর্থাৎ মানুষের কাছে বলবে না যে আল্লাহর নামে আমাকে কিছু দাও। আবার কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে দরবেশীকেও মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে না।

বর্ণিত আছে, একজন দরবেশ জঙ্গল হতে কুফার বাজারে উপস্থিত হন। কয়েকদিনের অনাহার এবং পথশ্রমে তিনি একটি পাখি হাতে নিয়ে বললেন: এই পাখিটির জন্য আমাকে কিছু দাও।

মানুষেরা বলল, এটা কেমন চাওয়া?

তিনি বললেন: দীন দুনিয়ার জন্য আমি আল্লাহকে মধ্যস্থ বানাব? এর জন্য তো এই পাখিটিই যথেষ্ট।

বিবাহ করা ও না করার আদব

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۞

"রমণীরা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।" (সূরা: আল-বাকারা– ১৮৭)

আরও এরশাদ করেন:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ـ

"তারা (মা-বোন-মেয়ে ইত্যাদি) ছাড়া যত রমণী আছে অর্থ-সম্পদ দ্বারা তাদের পাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে তবে শর্ত হলো তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কর। কামবাসনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নয়।"
(সূরা: আন্-নিসা– ২৪)

আরও ঘোষণা করেন:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۞

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি খানদানী মুসলিম মহিলা বিবাহ করার অসামর্থ্য হয় তাদের উচিত তোমাদের অধীনস্থ কোন মুসলিম দাসীকে বিবাহ করা।" (সূরা: আন্-নিসা– ২৫)

আরও বলেন:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ـ وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۞

"যাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের সুবিধার জন্য এই অব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারলেই মঙ্গল হয়।"
(সূরা: আন্-নিসা– ২৫)

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

تَنَاكَحُوْا وَتَكْثُرُوْا فَإِنِّيْ أُبَاهِيْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْطِ ـ

"তোমরা বিবাহ কর এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করো। তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি কেয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ব করব। তোমরা সংখ্যা বর্ধিত করার চেষ্টা কর যদিও সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ গর্ভপাতও হয়।"

আরও ঘোষণা করেছেন:

حُبِّبَتْ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلٰثٌ، وَالطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ ـ

"তিনটি জিনিস আমার প্রিয়। সুগন্ধি, রমণী এবং আমার চোখের শীতলতা নামায।"

হুজুর ﷺ আরও এরশাদ করেছেন:

تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلٰى أَرْبَعَةٍ، عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْحُسْنِ وَالدِّيْنِ، فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّيْنِ فَإِنَّهُ مَا اسْتَفَادَ امْرَءٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ مِنْ زَوْجَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُوَافِقَةٍ يَسُرُّ بِهَا إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا

"চারটি কারণে মহিলাদের বিবাহ করা হয়। তার সম্পদের জন্য, বংশের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য এবং তার ধর্মীয় কাজ কারবারের জন্য। তোমাদের কর্তব্য ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আসলে ইসলামরূপ নেয়ামতের পর মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও উপকারী বস্তু হচ্ছে ধর্মপ্রাণ এবং স্বামীর অনুকূলে থাকা স্ত্রী। এমন স্ত্রীর প্রতি তাকালে হৃদয় আনন্দে ভরে উঠে।"

তাই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ أَقَلُّهُنَّ مُؤْنَةً وَأَحْسَنُهُنَّ وُجُوهًا وَأَحْصَنُهُنَّ فُرُوجًا ـ

"সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রী হলো যার খরচ কম, সদাহাস্য মুখ আর স্বীয় লজ্জাস্থানকে রক্ষণাবেক্ষণকারিণী।"

বিবাহ করা এবং অবিবাহিত থাকা

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণীর আলোতে হজরত বুযুর্গানে কেরাম সাধারণত ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, যদি দরবেশের মনে কোন প্রকার বিপদে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে এবং কামবাসনার কাছে পরাজয়বরণ না করার দৃঢ় ভাবনা থাকে তবে অবিবাহিত জীবন যাপন করাই তার জন্য শ্রেয়। কারণ, এই অবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু যদি রমণী তার নিকট প্রিয় মনে হয় তবে বিবাহ করাই তার পক্ষে উত্তম।

বিবাহ করা না করার বেলায় এটাও দেখার বিষয় যে, যেই দরবেশ লোকালয়ে থাকতে ইচ্ছুক তার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। আর যদি লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চলে যায় তাহলে বিবাহ করে কোন মহিলাকে কষ্ট না দেওয়াই ভালো।

বিবাহ করা এবং অবিবাহিত থাকার শরয়ী অবস্থা

উক্ত অবস্থাদ্বয়ের কোনটি দরবেশগণ অবলম্বন করবেন এই সম্বন্ধে আরও একটি পন্থা বর্ণিত হয়েছে যে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা মোবাহ বা নির্দোষ। তবে যে ব্যক্তির ব্যভিচারিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তার পক্ষে বিবাহ করা ফরজ। এই প্রকারের লোকের জন্যই আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: "কারও যদি খানদানী রমণী বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে যেন কোন দাসীর পানি গ্রহণ করে।"

পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন করার সামর্থ্য যার থাকে তার ব্যভিচারিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য তার বিবাহ করা সুন্নত।

তাই মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

"বিবাহ করা সুন্নত ও আমার নীতি। যে আমার সুন্নত থেকে দূরে সরে থাকে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

অবশ্য পরিবারের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ না করে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম।

বিবাহ করা না করা এই দুটি বিষয় সম্মুখে রেখে দরবেশগণ চিন্তা করে দেখবেন কোনটি গ্রহণ করা তার জন্য ভালো। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সকল চিন্তা-ভাবনা একা থাকলেই এসে ভিড় করে এবং মেলামেশার মধ্যেই আনন্দ নিহিত থাকে।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

اَلشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ ـ

"একা ব্যক্তির সাথি শয়তান।"

অন্যায় ও অপরাধযুক্ত কাজকে তার নিকট সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করে। আর এটাও সত্য কথা যে বিবাহিত জীবন পুরুষ ও নারীকে বহু পাপ ও

অন্যায় কর্ম হতে রক্ষা করে। তবে উভয়ের মধ্যেই সকল দিক হতে মিল থাকতে হবে। অবশ্য অবিবাহিত থাকার মধ্যেও যেমন বিপদ তেমনি বিবাহিত জীবনেও নানা প্রকার বিপদাপদ থাকে।

অবিবাহিত থাকার মধ্যে দ্বিবিধ বিপদ। প্রথম সুন্নতের বরখেলাফ। দ্বিতীয় নিজের মাঝে কামনাকে পোষণ করে রাখা যা যে কোন সময় আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

বিবাহ করার মধ্যেও দু' ধরনের বিপদ নিহিত রয়েছে। প্রথমত আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি দরবেশের মনোনিবেশ। দ্বিতীয়ত নফসের স্বাদে দেহের লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। রমণীর প্রতি স্নেহমমতা আর তার প্রতি আসক্তি সবচেয়ে বড় বিপদ। শয়তান সর্বপ্রথম রমণী দ্বারাই মানুষের প্রতি আঘাত হেনেছে, আর আজও হানছে।

এ কারণেই রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَمَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ـ

"আমি আমার পর পুরুষের জন্য মেয়েদের অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকারক আর কোনকিছু রেখে যাচ্ছি না।"

আমি (গ্রন্থকার) নিজেই এই বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কাজেই আমি জানি তা কতবড় বিপদ। এগার বছর পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে বিবাহ করার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। অবশ্য এই বিপদে জড়িত হওয়া তিনি আমার ভাগ্যে লিখিয়া রেখেছিলেন। আমি পরীর ন্যায় সৌন্দর্যময়ী এক মহিলাকে দেখে এক বছর ধরে সেই চিন্তায় বিভোর থাকি। আমি প্রায় বেদীন হতে চলেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তা হতে হেফাজত করেছেন। আল্লাহর নিকট অসংখ্য শোকরিয়া।

বিবাহে সুন্নতের অনুসরণ

যে দরবেশ (সৎ লোক) বিবাহ করা সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করে তার খেয়াল রাখতে হবে সত্যই কি সে সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করছে না

কামনার তাড়নায় বিবাহ করছে। যে ব্যক্তি রিপুর তাড়নায় বিবাহ করে বলে আমি সুন্নত পালনের জন্য বিবাহ করছি সে বড় ভুল করে। সে তার কামনাকে সুন্নত নামে আখ্যায়িত করে।

আর যদি কেউ সুন্নত পালনের নিয়তেই বিবাহ করে তাহলে তার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই সুন্নত পালন যেন তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে না যায় এবং এই কারণে সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে হারামে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। অন্তরের খারাবীই মানুষের ধ্বংসের কারণ।'আর অন্তরের খারাবী অপেক্ষা মানুষের বড় শত্রু আর কিছুই নেই। তাই ধর্মপ্রাণ মহিলাকে বিবাহ করবে।

সুফিদের অবিবাহিত থাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ

যেহেতু আমাদের যুগে ধার্মিক এবং ফরমারদরার মহিলা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে ওঠেছে। অযথা কথাবার্তা তর্কবিতর্ক এবং অযথা বায়না করার প্রবণতাই তাদের মাঝে বেশি। ফলে লোকে বিবাহ না করে হালকা পাতলা থাকাকে বেশি পছন্দ করেছে এবং এই হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

خَيْرُ النَّاسِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَفِيْفُ الْحَاذِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خَفِيْفُ الْحَاذِ؟ قَالَ الَّذِيْ لَا اَهْلَ لَهٗ وَلَا وَلَدَ لَهٗ ـ

আখেরী জামানার 'খাফীফুল হাজ' ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'খাফীফুল হাজ' কারা? এরশাদ করলেন, যাদের স্ত্রী-পুত্র নেই।

আরও এরশাদ করেছেন: দ্রুত অগ্রসর হও, অবিবাহিত লোক বাজি মেরে নিয়ে যাচ্ছে।

আরও এরশাদ করেছেন: "আমার পেশা দুটি। একটি দারিদ্রতা এবং অপরটি জিহাদ।" পরিবার-পরিজন এই দুটির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সঠিক পথ

বিবাহ করা না করার মাঝে দরবেশের ধ্বংস নয়। বরং কামনার বশীভূত হওয়া এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাই ধ্বংসের আসল কারণ। এই বিষয় সতর্ক থাকলে সন্দেহের কোন কারণ নেই। অবস্থা বুঝিয়ে বিবাহ করবে কিংবা করবে না। যে কোন অবস্থায়ই আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিকতার সাথে সুদৃঢ় থাকবে। আর এটাই দাসত্বের আসল উদ্দেশ্য।

বিবাহ করা এবং অবিবাহিত থাকার আদব

বিবাহের আদব:

১. বিবাহের কারণে দরবেশের ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নতই নয় বরং একটি ওজিফাও যেন ছুটে না যায়। অনর্থক সময় ও আহওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২. স্ত্রীকে হালাল রুজি ভক্ষণ করাবে, হালাল উপার্জন দ্বারা মোহর আদায় করবে, তার প্রতি মমতাশীল থাকবে। তার খরচ বহন করার উদ্দেশ্যে অত্যাচারী বাদশাহদের খোশামদ করবে না।

বর্ণিত আছে, একদিন কিছু সংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তি আহমদ ইবনে হরব নিশাপুরিকে সালাম করার জন্য তার দরবারে আসলেন। তারা তার দরবারে বসে উপদেশ শুনছিলেন।

এমন সময় এই বুযর্গের এক পুত্র মদ্য পান করে মাতাল অবস্থায় তাঁদের পাশ দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। বুযুর্গ পিতার কাছে কিছু সংখ্যক সম্মানিত লোক বসা ছিলেন সেদিকে ভ্রূপেক্ষ করল না।

উপস্থিত সবাই এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের মুখের ভাব দেখে বললেন– এই ছেলেটি মাজুর অর্থাৎ সে এরূপ করতে বাধ্য। একরাতে আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য আমার প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কিছু খাবার আসল এবং আমরা খেলাম। ঐ রাতে আমি স্ত্রী সহবাস করি এবং এই ছেলেটি তার মাতৃগর্ভে আসে।

সেই রাতে আমি এমন নিদ্রামগ্ন ছিলাম যে কোন ধরনের ইবাদত বন্দেগি আর ওজিফা পড়ার সুযোগ পাই নি। প্রাতে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম বাদশাহর বাড়ি হতে আমার প্রতিবেশীকে ঐ খাবার দেওয়া হয়েছিল।

৩. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং প্রাত্যহিক ওজিফা পরিপূর্ণভাবে আদায় করার পর স্ত্রীর বিছানায় যাবে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলবে– হে আল্লাহ! তুমি কামনাকে মানুষের মধ্যে প্রদান করে দিয়েছ যেন এই পৃথিবী আবাদ হয়। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি এমন সন্তান দান কর যে তোমার বন্ধু এবং ওলি হয়।

অবিবাহিত থাকার আদব

দরবেশ যদি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক হন তাহলে যা দেখার মতো নয় তা দেখা থেকে, যা শোনার নয় তা শোনা থেকে এবং যা চিন্তা করার উপযুক্ত নয় সেই ব্যাপারে চিন্তা করা হতে অবশ্য বিরত থাকবে। অনাহারে থেকে কাম রিপুকে দুর্বল করে রাখবে।

নিজের নাফসানী খাহেশাতকে এলম ও এলহাম নাম দিয়ে কোনভাবেই প্রচার করার চেষ্টা করবে না।

সুফিদের ভাষা ও পরিভাষা

বিশেষ ভাষা ও পরিভাষার গুরুত্ব

অন্যান্য বিষয় ও বিভাগের আলেম ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের বিষয় ও বিভাগের জন্য এমন কিছু শব্দ ও পরিভাষার প্রচলন করে রেখেছেন যাতে তাদের বিষয়বস্তু বুঝাতে ও বুঝতে সহজসাধ্য হয়। তদ্রূপ সূফি সম্প্রদায়ও তরিকত ও হাকিকত বুঝতে ও বুঝাতে এমন কিছু শব্দ ও পরিভাষার প্রচলন করেছেন: যা দ্বারা উক্ত বিষয় তারা অনায়াসে তাদের অনুগামীদেরকে বুঝাতে পারেন। যেমন ব্যাকরণবিদগণ, বর্তমান ভবিষ্যৎ, একবচন, বহুবচন অঙ্কশাস্ত্রবিদগণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিজেদের বিষয়বস্তুকে সুন্দররূপে প্রকাশ করেছেন। তদ্রূপ সুফিগণও ওয়াক্ত, হাল, মোকাশেফাহ্, মোহাজিরা প্রভৃতি পরিভাষা দ্বারা তাদের বিষয়বস্তুকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অবশ্য সহজভাবে বুঝানো এবং বুঝা ছাড়াও হাকিকত ও তরিকতে পরিভাষা ব্যবহার করার লক্ষ্যে আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। সুফি সম্প্রদায়ের এই উদ্দেশ্যও ছিল যে এই বিষয়বস্তু যাদের কাছে প্রকাশ না করে গোপন রাখার প্রয়োজন তা তাদের কাছে অপ্রকাশ রাখা এবং নিজেদের উদ্দেশ্যের সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাখা। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, তরিকত ও তাসাউফধারিদের লক্ষ্য ছিল– নবি ও রাসূলদের দাওয়াতের যেই উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারী বাদশাহদের এটা মোটেই পছন্দনীয় ছিল না। কাজেই সুফি সম্প্রদায় এমন শব্দ ও পরিভাষায় প্রচলন করেন যা তাদের মতাবলম্বীগণই বুঝতে পারেন। তাদের সীমারেখার বাইরে গেলেও যেন অন্যে তা বুঝতে না পারে।

এখন আমরা সুফিদের বিশেষ ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব।

ওয়াক্ত ও হাল

ওয়াক্ত

(وقت) ওয়াক্ত সুফিয়ায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ পরিভাষা। এর অর্থ এমন সময় বান্দা যখন তার প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার নিজস্ব অস্তিত্বসহ পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থ যা কিছু রয়েছে সব তার নিকট হতে দূর হয়ে যায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত যাবতীয় কিছু থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বীয় ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হতে সর্বোতভাবে পৃথকতা অবলম্বন করে সে নিজে বিশ্ব প্রভুর ইচ্ছা, অনিচ্ছা এবং আদেশ-নিষেধের মাঝে আত্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায়ই কাশফ (আল্লাহর রহস্য আর হাকিকতের অবস্থা প্রকাশ লাভ) হয়ে থাকে।

এটা বান্দর জন্য এমন সীমাহীন আনন্দ এবং সান্ত্বনার অবস্থা যে তার পরিবর্তে এমন কোন মূল্যবান বস্তু নেই যা সে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে। এই কারণেই মেরাজের রজনীতে মহানবি ﷺ এর সম্মুখে আসমান-জমিনের বাদশাহী সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অথচ মহানবি ﷺ তার দিকে ফিরিয়েও চাইলেন না।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন: আমি একজন বুযুর্গকে জঙ্গলে দেখেছি যে একটি বাবলা গাছের নিচে অত্যন্ত অসমতল ভূমিতে খুবই কষ্টের সাথে বসে রয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: ভাই আপনি কেন এমন কষ্ট করে এখানে বসে রয়েছেন?

তিনি বললেন: আমি আল্লাহর দরবারে ওয়াক্ত অর্জন করেছিলাম। এখানেই আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। তারপর থেকেই আমি এখানে উপবিষ্ট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কতদিন ধরে এই অবস্থায় বসা আছেন?

তিনি বললেন: বার বছর যাবৎ। তারপর আমি আর তা পাই নি। আমার জন্য দোয়া করবেন।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন: এরপর আমি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে চলে যাই। সেখানে আমি তার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করলেন।

আমি হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় দেখলাম ঐ ব্যক্তি সেই বাবলা গাছের নিচেই বসে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম: হে যুবক! আপনার কামনা তো আল্লাহ পূর্ণ করেছেন। তাহলে আর এখানে কেন বসে রয়েছেন?

তিনি বললেন: আমার হারানো সম্পদ আমি যেখানে ফিরে পেয়েছি সেই স্থান ত্যাগ করে আমি কীভাবে যেতে পারি আমি আমার এই মাটির দেহকে এই মাটির সাথেই মিশিয়ে দেব। কেয়ামতের দিন আমি এই মাটি হতেই মাথা উঠাব।

উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারাই বুঝা যেতে পারে যে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে ওয়াক্ত কী বস্তু এবং তার মর্যাদা কী? মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম মক্কা মুয়াজ্জমা ছেড়ে কেন অশ্রু প্রবাহিত করেছিলেন। কারণ, তারা যা কিছু লাভ করেছিলেন তা মক্কার অলিগলিতেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হয়ত তারা পবিত্র মক্কা নগরীতেই ওয়াক্ত লাভ করেছিলেন।

হাল

(حال) 'হাল' এমন এক কার্যকরী অবস্থা যে যদি বান্দা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ওয়াক্তের মর্যাদা উপলব্ধি করে তখন তার উপর অবশ্যম্ভাব্য রূপে প্রকাশ পায়। হাল মনে হয় বান্দার উপর ওয়াক্তের সময় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়বস্তু এবং হাল দ্বারাই ওয়াক্ত প্রতিষ্ঠিত তথা সুদৃঢ় হয় যতক্ষণ পর্যন্ত হাল বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত হবে। আর যদি হাল অবতীর্ণ না হয় তবে ওয়াক্ত নষ্ট হয়ে যায়।

এই অবস্থা হতে পারে যে বান্দার পরকালীন ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হওয়ার উপযুক্ত হয়। কারণ, বিশ্বজগতের মালিক তো তাকে এতটা সম্মান দান করেছেন যে তাকে তার

দরবারে উপস্থিতির ওয়াক্ত দান করেছেন। কিন্তু সে তার মহান প্রভুর এই মহান দানের প্রতি সম্মান দেখায় নি।

কাজেই মাশায়েখগণ বলেছেন:

اَلْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ اِمَّا هَلَكَ وَاِمَّا مَلَكَ –

"ওয়াক্ত দু'দিকে ধারবিশিষ্ট তরবারী। ইচ্ছা করলে সে মানুষকে বাদশাহ বানিয়ে দিতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।"

অর্থাৎ কেউ যদি ওয়াক্তের মর্যাদা বুঝে সেই অনুযায়ী কাজ করে তবে সে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে ইহকাল ও পরকালের শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। আর যদি সে ওয়াক্তের অমর্যাদা করে তাহলে সে আল্লাহর দরবার হতে বিতাড়িত হতে পারে।

হালবিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বজগতের প্রতিটি বিষয়বস্তুতে আল্লাহর মারেফাত এবং সত্যের নিদর্শন দেখে থাকে। তাই যে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে হজরত ইবরাহীম (আ) এর গোত্রপূজা করত হজরত ইবরাহীম (আ) তাদের দেখে তার মাঝেই সত্যের ঝলক অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত দেখতে পেয়ে বললেন:

يَا قَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ –

"হে আমার জ্ঞাতি! তোমরা যাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করছ আমি তা হতে মুক্ত।" (সূরা: আল-আনমা– ৭৮)

অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে হালবিশিষ্ট ব্যক্তি মানুষের নিকট নিজের বুযুর্গী এবং বেলায়েতের ঢোল বাজিয়ে ফিরেন না। এ ধরনের লোকের সারাজীবনের আচার ব্যবহার এবং কার্যফলাফলই সাক্ষ্য প্রদান করে যে তিনি কোন ধরনের কাফেলার সহগামী এবং কোথায় তার ঠিকানা।

তাই বুযুর্গগণ বলেছেন: হালবিশিষ্ট লোকের ভাষা তার অবস্থা বর্ণনা করা হতে চুপ হয়ে গেছে। তবে তার হাল আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের সাক্ষ্য দান করে।

মাকাম ও তামকীন

মাকাম

যারা আল্লাহর পথের পথিক তাদের সবারই একটি করে মাকাম রয়েছে। নিয়তের বিশুদ্ধতা, বুঝ শক্তি এবং গবেষণার উন্নত মান, আল্লাহর হক আদায় করার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প এবং আল্লাহর কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার পরিপ্রেক্ষিতেই এই মাকাম নির্ধারণ করা হয়। নিয়তের বিশুদ্ধতা, আল্লাহর হক আদায়ে সে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তার মাকাম উন্নত হতে উন্নততর হতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞

"প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য (আল্লাহর দরবারে) একটি স্তর এবং মাকাম নির্দিষ্ট রয়েছে যা তার কার্যানুযায়ী নির্দিষ্ট থাকে। তোমাদের প্রভু তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে উদাসীন নয়।" (সূরা: আল-আন্‌আম– ১৩২)

কেবল মানুষের জন্যই নয় আল্লাহর ফেরেশতাদের জন্যও এমন নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۞

"(আমাদের ফেরেশতাদের মধ্যে) এমন কেউ নেই যে, যার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন নির্ধারিত স্থান নেই।" (সূরা: আস্‌-সাফ্‌ফাত– ৭৯)

তামকীন

তামকীন অর্থ বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারে সম্মানিত মর্যাদা তথা স্তর। মাকামধারী লোক মাকামসমূহ অতিক্রম করার পর তামকীনের স্তরে পৌঁছেন। যেন তামকীন শেষ সীমায় উপনীত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আবাসস্থল এবং মাকামাত তামকীনের পথের মধ্যবর্তী মনযিল।

যে ব্যক্তি সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব পরিহার করে পাক পবিত্র হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করে সে তামকীনের মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ তাবারাক ওয়াতায়ালা বলেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۔

মুমিন কেবল তারা যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। এঁরাই সত্যবাদী।

একজন বুযুর্গ বলেছেন: "সর্বপ্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে তামকীন পবিত্র।"

মুহাজারা ও মুকাশিফা

মুহাজারা

হুজুরে দিলকে মুহাজারা বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ যেন সদা-সর্বদা আল্লাহর খেদমতে উপস্থিত থাকে। এই অবস্থাকেই হুজুর ﷺ নিম্নোক্ত ভাষায় এরশাদ করেছেন:

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ـ

"তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।"

মুহাজারার অবস্থার নিদর্শন আল্লাহর কার্যাবলি এবং তার নিদর্শনসমূহে বান্দার চিন্তা করা। কাজেই যখন হজরত ইবরাহীম (আ) একান্ত একাগ্রতার সাথে আসমান ও জমিনের বাদশাহীর প্রতি চিন্তা-ভাবনার সাথে দৃষ্টিপাত করেন তখন কর্ম হতেই কর্মকর্তার সন্ধান লাভ করেন। এমনকি পরিপূর্ণ মারেফাত তথা জ্ঞানের সাথে বললেন:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

"আমি সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আমার মুখ তার দিকে করছি যিনি জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। আমি কখনও অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

(সূরা: আল-আনআম– ৭৯)

এই আসমান ও জমিনের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহ বলে মানা এবং তার সামনে মাথা অবনত করা তো দূরের কথা বরং কোনমতে এবং কোনক্রমেই অন্য কারও সাথে আসমান ও জমিনের আল্লাহর খোদায়ীর সাথে অংশীদার মেনে নিতেও প্রস্তুত নই।

মুকাশাফা

মুকাশাফা আল্লাহর রহস্যসমূহের মধ্যে কোন হাকিকতের প্রকাশ লাভ বা অন্য কথায় ঐ ব্যাপারে দৃঢ় জ্ঞান লাভ করার নাম যা মুহাজারার অবস্থার চিন্তা-ভাবনা করার পর হাসিল হয়। শায়েখগণ বলেছেন– মুকাশাফার চিত্র হলো হয়রান পেরেশান থাকা যা আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য এবং তার মহানতার উপলব্ধি এবং তার সম্পর্ক দ্বারা সৃষ্টি হয়।

মুকশাফার পর দলিল প্রমাণ শেষ হয়ে যায় এবং নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণিত আছে, একবার আবু সাঈদ খাররায ও ইবরাহীম সায়াদ উলুবী এক সঙ্গে নদীর তীর দিয়ে পথ চলছিলেন। তারা এক আল্লাহওয়ালার দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর দরবারে যাওয়ার পথ কোন দিকে?"

আল্লাহওয়ালা বললেন: আল্লাহর দরবারে যাওয়ার দুটি পথ। একটি সাধারণ মানুষের পথ এবং অন্যটি বিশিষ্ট মানুষের পথ।

তারা বললেন: দয়া করে একটু বিস্তারিতভাবে বলুন।

আল্লাহর বন্ধু বললেন: তোমরা যে পথে চলছ তা সাধারণের পথ। যে পথে চলার উদ্দেশ্যে তোমরা প্রমাণের সন্ধান কর; প্রমাণ না পেলে সেই পথে চলা ত্যাগ কর।

বিশেষ লোকের পথ হলো– তারা না প্রমাণ চায় আর না প্রমাণিত বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে। দলিল প্রমাণের প্রয়োজনও তাঁদের হয় না। বরং যখনই তাঁরা জানতে পারে যে এটা– "তাঁর" কথা তখনই তাঁরা তাঁর সামনে মাথানত করে দেন।

কবজ ও বসত

সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের অভিজ্ঞদের উপর বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সময়ে তারা গভীর থেকে গভীরতর এবং কঠিন হতে কঠিনতর অবস্থার মুখোমুখি হন এবং তার সমাধান করে। আবার কখনও বা স্থূল হতে স্থূলতম বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। অদ্রূপ আল্লাহওয়ালাদের অবস্থাও সময়ে এমন হয় যে আল্লাহর রহস্য তাদের অন্তঃকরণ কোন প্রকার অনুসন্ধান

ব্যতীত পেতে থাকে এবং স্বয়ং হৃদয় আল্লাহর প্রতি অগ্রণী হতে থাকে। আবার কোন সময় অনুসন্ধান ও চেষ্টা করার পরও অন্তরের কলি প্রস্ফুটিত হয় না আর না আত্মা এই দিকে উৎসাহী হয়। এরই প্রথম অবস্থাকে বস্‌ত এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে কবজ বলা হয়ে থাকে।

বস্‌ত অবস্থায় হৃদয় প্রফুল্ল এবং কবজ অবস্থায় মনক্ষুণ্ন এবং ক্রোধান্বিত থাকে।

তাই হজরত বায়েযিদ (র) বলেছেন নফস বসতের হালতে থাকলে কলব কবজের অবস্থায় থাকবে। অপরদিকে কলব বসতের অবস্থায় থাকলে নফস কবজের অবস্থায় থাকবে।

কবজের অর্থ সংকুচিত হওয়া, বন্ধ হওয়া। বস্‌তের অর্থ উন্মুক্ত হওয়া, বিকশিত হওয়া এবং প্রস্ফুটিত হওয়া। যদিও এই অবস্থাদ্বয় মানুষের কলবের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে তদুপরি আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⊛

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর এমন জনের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"
(সূরা: শুরা– ১৩)

হায়বত ও উন্‌স

হায়বত ও উন্‌স আল্লাহর পথ অতিক্রমকারীদের দুটি হালত। হায়বত মহান আল্লাহর মহানতাকে ভয় করার হালত আর উন্‌স তাঁর জামাল ও সীমাহীন রহমত ও দানের দরুন তাঁর সাথে প্রেমপ্রীতির সম্পর্কের অবস্থা।

শায়েখগণের মতে হায়বত আরেফদের অবস্থা আর উন্‌স মুরিদদের অবস্থা। তাঁরা বলেন– আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান বা মারেফাত লাভ করার পর হায়বত ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না। কারণ আল্লাহর সিফাত আজমত এবং আজমত হতে হায়বাতই সৃষ্টি হয়।

আর উন্‌স হতে পারে সমগোত্রীয়ের সাথে। যেমন মানুষে মানুষে উন্‌স তথা ভালবাসা। মানুষ যখন না আল্লাহর স্বগোত্র এবং না তাঁর আকৃতিবিশিষ্ট

তখন আল্লাহর সাথে উন্‌স কিরূপে হতে পারে? তবে হাঁ, আল্লাহর জিকর ও তাঁর স্মরণের সাথে উন্‌স হতে পারে।

হজরত আবু বকর শিবলী (র) বলেন: কিছুদিন ধরে আমার ধারণা ছিল আমি আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং তার মুশাহাদায় অচঞ্চল রয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি উন্‌স কেবল স্বগোত্রের সাথেই হতে পারে।

কিন্তু আমার পীর বলেন: আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্মিত হই যে, যে ব্যক্তি বলে আল্লাহর সাথে উন্‌স হওয়া সম্ভবপর নয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা বারবার তাঁর বান্দাকে প্রেমপ্রীতির সাথে বলেন:

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⊛

"হে নবি! আমার বান্দাকে সংবাদ দিন যে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা: আল-হিজর– ৪৯)

আরও বলেন:

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ⊛

"হে নবি! লোকদের বলে দিন, হে আমার বান্দা! যারা স্বীয় জীবনের উপর জুলুম করেছ তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন।"

অপর আয়াতে বলেন:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ⊛

"হে নবি! আমার বান্দাগণ যদি আমার ব্যাপারে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে তবে বলে দিন আমি তাদের নিকটই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি।"
(সূরা: আল-বাকারা– ১৮৬)

আরও এরশাদ করেন:

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۞

"হে আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই। আর না চিন্তা ও আক্ষেপ করবে।" (সূরা: আয্-যুখরুফ– ৬৮)

কাজেই দেখা যাচ্ছে– আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার সাথে এমন অনুগ্রহ করেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর অন্তরে মহব্বত আছে। উন্স ও মহব্বত বন্ধুদের জন্য অপরিহার্য বিষয়বস্তু। হায়বত অনাত্মীয়তার আলামত। দাতার দ্বারা উন্স প্রকাশ পায়। না ভয় বা হায়বত নয়।

আমি বলি এ ধরনের তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোন অর্থই হয় না। দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এই প্রকারের মতবিরোধ এবং তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপরদিকে যারা ফানাধারী তাঁরা হায়বতকে অগ্রাধিকার দান করেন। আর যাঁরা বাকাধারী তাঁরা উন্সকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন।

ফলে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কখনও নফস ও নফসের কামনা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে পারে না এবং তাকে ধ্বংসও করতে সক্ষম হয় না। নফসের কামনার প্রতি আসক্তি অবস্থায় ঈমানদারের উপর হায়বত আসা উচিত। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনে আল্লাহর ভয় না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পাপের প্রতি মানুষের আসক্তি কমে না।

অপরদিকে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার আল্লাহর সাথে উনস না হয় ততক্ষণ আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা বান্দার জন্য সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে হায়বত এবং উন্স উভয়েরই প্রয়োজন আছে এবং উভয়েই স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান।

কহর ও লুত্ফ

সুফিদের পরিভাষায় নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে ধ্বংস করা, নফসের কামনাকে দমিয়ে রাখা এবং কঠোর রিয়াজাত মুজাহাদার জীবন অতিবাহিত করাই কহর। অপরদিকে আরাম আয়াশে থেকে আল্লাহর পথে চলা লুত্ফ।

একটি সম্প্রদায় লুত্ফকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর এই বাণী পেশ করে:

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ ۞

"আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়াবান।" (সূরা: শুরা– ১৯)

অপর একটি সম্প্রদায় কহরকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর এই বাণী বলেন:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۞

"তিনি তাঁর বান্দার উপর বিজয়ী।" (সূরা: আল-আনআম– ১৮)

কিন্তু এটা বিতর্কমূলক এক ধরনের ঝগড়া। আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যে অবস্থা পছন্দ করেন– তাতেই বান্দার সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য। নিজের ইচ্ছেমতো কোন কিছু প্রার্থনা করা উচিত নয়। কারণ, আমরা যা নিজেদের জন্য পছন্দ করি তা বিপদপূর্ণ হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরীক্ষা করার জন্য তা আমাদের উপর চাপিয়ে দেন।

কাজেই আল্লাহ যা পছন্দ করেন আমি আমার জন্য তা-ই পছন্দ করি। ফলে আল্লাহ আমাকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করেছেন এবং নফসের প্ররোচনা হতে নিরাপদ রেখেছেন। তিনি আমার জন্য কহর কিংবা লুত্ফ যা-ই পছন্দ করেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

এ কারণে একজন বুযুর্গ বলেছেন– আল্লাহ তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর বান্দার জন্য যে অবস্থা পছন্দ করেছেন– তা বান্দার নিজের ইচ্ছেমতো পছন্দ করার অবস্থার চেয়ে অনেক উত্তম।

তাই মানুষ তার অজ্ঞতা ও সীমিত জ্ঞান দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয় না যে তার জন্য কোন ব্যবস্থা ভালো হতে পারে।

নফী ও এছবাত

সুফিদের পরিভাষায় নিজ থেকে মন্দ-স্বভাব দূর করাকে নফী এবং নিজকে সচ্চরিত্রে সৌন্দর্যমণ্ডিত করাকে এছবাত বলা হয়। আবার নফীর অর্থ নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দূর করে দোয়া এবং এছবাতের অর্থ আল্লাহর ইচ্ছাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এমনভাবে পদদলিত করবে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। মৃত ব্যক্তিকে যেমন গোসলদানকারী নড়াচড়া করে ঠিক বান্দা নিজকে তদ্রূপ আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে। মহানবি ﷺ এ কারণে এরশাদ করেছেন:

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ –

"তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নফসের কামনাকে ঐ বিষয়ের অনুগত করে না দেবে যা আমি নিয়ে এসেছি।" (মেশকাত শরীফ)

আল্লাহতে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা সম্পর্কে বর্ণিত আছে এক দরবেশ নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন। নদীর কূল থেকে এক ব্যক্তি ডেকে বলছিল– হে ভাই! আমি কি তোমার সাহায্যার্থে আসব?

দরবেশ বললেন না।

– তাহলে কি তুমি ডুবে যেতে ইচ্ছে করেছ?

– না।

– আশ্চর্যের কথা, না তুমি বাঁচতে চাও আর না ডুবতে?

– বাঁচা মরার আমার কোন ইচ্ছাই নেই। আমার মালিক আমার যে ব্যবস্থা করবেন– তা-ই আমার জন্য মঙ্গল!

মুসামারা ও মুহাদাছাহ

রাতের কোন এক সময় বান্দা যখন তার মালিকের সাথে মিলিত হয় তাকে মুসামারা আর দিনের কোন এমন এক সময় যখন বান্দা যাহের

বাতেনে তার মওলার সাথে সওয়াল জওয়াব করে তাকে মুহাদাছাহ বলে। অর্থাৎ রাতের মুনাজাতকে মুসামারা এবং দিনের দোয়াকে মুহাদাছাহ বলা হয়।

মুসামারার আসল ও সম্পর্ক মহানবি ﷺ এর মেরাজের সাথে যখন হুজুর ﷺ মেরাজের সময় আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং রহস্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। যখন তিনি আল্লাহর সমীপে আলাপ-আলোচনা করছিলেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে– لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ "আমি তোমার যথাযথ গুণ কীর্তন করতে অক্ষম।"

হজরত মূসা (আ) তুর পাহাড়ে যেমন আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন– তার সাথে মুহাদাছাহর তুলনা করা যায়।

ইলমুল ইয়াকীন, হক্কুল ইয়াকীন ও আইনুল ইয়াকীন

ইলমুল ইয়াকীনের অর্থ হচ্ছে– মানুষের জ্ঞান-সম্প্রাপ্ত প্রমাণাদি দ্বারা বিশ্বজগতের ভেদ অবগত হওয়া। এটা আলেমদের স্তর। হক্কুল ইয়াকীন এর পরবর্তী পর্যায়। অর্থাৎ বিশ্বজগৎ এবং স্বয়ং মানুষের নফসের হাকিকতের যে নিদর্শন বিদ্যমান আছে তার মুশাহাদা দ্বারা হাকিকত সম্পর্কে ইয়াকীন বা বিশ্বাস এতটা দৃঢ় হয় যে তা সত্য হওয়ায় কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। বরং অন্তর সর্বোতভাবে প্রশান্তরূপ ধারণ করে। অবশ্য এই সত্য তার জীবনের প্রতিটি ধ্যান-ধারণায় মূর্ত হয়ে উঠে। হক্কুল ইয়াকীন আল্লাহর অলীদের স্তর।

এর পরের স্তর আইনুল ইয়াকীনের। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যেমন চাক্ষুষ দর্শন করে বিশ্বাস হয়ে থাকে। এটা আল্লাহর আরেফদের স্তর। অর্থাৎ হাকিকত সম্পর্কে মানুষের এমন দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে যদি হাকিকতের পর্দা উন্মোচন করা হয় অবশ্য আরেফের ইয়াকীনে কোন প্রকার বর্ধিত হবে না।

এই স্তরে পৌঁছার পরই নবিগণ নবুয়তপ্রাপ্ত হন। এই স্তরে পৌঁছেই হজরত ইবরাহীম (আ) পরবর্তী ফলাফলের চিন্তা না করে বলেছিলেন:

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ــ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

"হে আমার স্বজাতি। তোমরা আল্লাহর সাথে যা কিছুকে অংশীদার করছ আমি তা থেকে মুক্ত। যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আমি সর্বান্তঃকরণে এবং একাগ্রতার সাথে তার প্রতি মাথাবনত। আমি কখনও অংশীবাদীদের মধ্যে নই।" (সূরা: আল-আন্‌আম– ৭৮-৭৯)

এলম ও মারেফাত

এলম অর্থ কোন কিছু জানা তথা অবগত হওয়া। এই অবগত হওয়া জ্ঞাত ব্যক্তির কোন উপকারে আসুক কিংবা না আসুক। কিন্তু মারেফাতের অর্থ হচ্ছে– সেই জানা বা এলম আলেমের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হওয়া। মারেফাত অর্জন করার পর এটা অসম্ভব যে লোকের আকিদা ও আমল হতে শুরু করে তার স্বভাব চরিত্র পর্যন্ত জীবনের কোন দিক তার এলমের বিপরীত ও বিরোধ হয়। যেন আলেম তার এলমকে ভাষায় আর আরেফ তার মারেফাতকে হাল দ্বারা বর্ণনা করেন।

শরীয়ত ও হাকিকত

কোন কোন সম্প্রদায় যেমন– মুশাব্বাহ, কেরামাতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় বলে থাকে তাসদীক ও একরার একটি হতে অপরটি পৃথক তেমনি শরীয়ত ও হাকিকতও একটি হতে অন্যটি পৃথক। যখন কোন বান্দার নিকট হাকিকত প্রকাশ লাভ করে তখন তার জন্য শরীয়তের বিধি নিষেধ পালন করা জরুরী নয়।

এই জাতীয় লোক মুলহিদ ও বেদীন। শরীয়ত ও হাকিকত একটি অন্যটি হতে আলাদা নয় এবং একটি অন্যটি ছাড়া কোন উপকারে আসে না। যেমন

একরার ছাড়া ঈমানের তাসদীক হয় না তেমনি তাসদীক ব্যতীত ঈমানের একরার হয় না।

তেমনি হাকিকত ব্যতীত শরীয়তের বাহ্য অনুসরণ করা শুধু রিয়া ও কপটতা। আর বাহ্য শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত হাকিকতের দাবী করা সরাসরি যিন্দেকী ও এলহাদী। একরার ও তাসদীকের মতো শরীয়ত এবং হাকিকত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। একটির অস্তিত্ব ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা দুষ্কর।

শরীয়ত দেহ; হাকিকত দেহস্থিত আত্মা তথা রূহ স্বরূপ। যেমন দেহ ও রূহের সম্মিলনে মানুষ। তদ্রূপ শরীয়ত ও হাকিকতের সমন্বয়ে দীন তথা ধর্ম। হাকিকতের মানব জীবনের কার্যকরী প্রকাশ শরীয়ত। শরীয়তের আমলের মধ্যে বাতেনী রূহ এবং নিয়তের আন্তরিকতাই হাকিকত। শরীয়ত ছাড়া হাকিকত এবং হাকিকত ব্যতীত শরীয়ত মূল্যহীন। নিয়তের বিশুদ্ধতা আল্লাহর প্রতি খাঁটি মহব্বত এবং তার যথার্থ ভয়ের সাথে কার্যকরী করার নামই হাকিকত এবং তাসাউফ।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য পরিভাষা

আল হক

'আল হক' এর অর্থ আল্লাহর সত্তা।

আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম।

আল হাকিকত

আল হাকিকত সৃষ্টির পেছনে কার্যকরী মূল ঘটনা। তা অবগত হতে সক্ষম হলে আল্লাহর সত্তা, তাঁর সিফাত, হক এবং ইচ্ছার মারেফাত লাভ হয়।

আল খাতরাত

আল্লাহর পথে চলাকালীন সালেকের অন্তরে যেসকল বিপদ ও প্ররোচনার সৃষ্টি হয় তাকে খাতরাত বলা হয়।

আল ওয়াতানাত

আল হাকিকতের জ্ঞান ও আল্লাহর রহস্যের মাঝে যে বস্তু সালেকের অন্তরে স্থান পায় তাকে ওয়াতানাত বলে।

আল আলায়েক

আলায়েক এমন সব উপকরণ যার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়লে আল্লাহর পথের পথিক তার অভীষ্ট বস্তু লাভে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেসকল বিষয়বস্তু মানুষের মনোযোগ আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এটাও তার মধ্যে পরিগণিত।

আল ওসায়েত

যেসব মাধ্যম দ্বারা সালেক তার অভীষ্ট বস্তু লাভ করে তাকে ওসায়েত বলা হয়। "ওসায়েত" আল্লাহর আদেশ, আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে পালন করা এবং নিবেদিত বিষয় হতে দূরে থাকা।

যাওয়ায়েদ

নফল ও মুস্তাহাবকে যাওয়ায়েদ আখ্যা দেওয়া হয়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত আদায় করার পর যত নফল আদায় করবে ততই তার হৃদয় নূরের স্থানে পরিণত হবে, আল্লাহর সান্নিধ্য ততবেশি লাভ করবে।

আল মালজা ওয়াল মানজা

মালজা অর্থ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয়স্থল এবং এখানে আত্মসমর্পণ করা। আর যেখানে বা যার নিকট বিপদাপদ হতে রেহাই পায় তাকে মানজা বলে। সালেকের নিকট এই উভয়স্থলই কেবল আল্লাহ।

আল লাওয়ামে ওয়াত তাওয়ালে

কলবে আলোকপাত হওয়ার নাম লাওয়ামে। কলবে মারেফাত প্রকাশ পাওয়াকে তাওয়ালে বলা হয়। অর্থাৎ মারেফাতের অধস্তন স্তর লাওয়ামে আর তার পরবর্তী স্তর তাওয়ালে।

আত তাওয়ারেক

রাতে মুনাজাত করার পর কোন ধরনের সুসংবাদ বা ভয়ভীতি প্রকাশ পাওয়াকে তাওয়ারেক বলা হয়।

আল ওয়ারেদ

আল্লাহর নির্দেশাবলি কোন হাকিকত এবং তার অর্থ অন্তরে স্থিতি লাভ করাকে ওয়ারেদ বলা হয়।

আল ইনতিবাহ

অন্তরের গাফলত তথা অলসতা দূর হয়ে যাওয়া এবং সাবধানতা অবলম্বন করাকে ইনতিবাহ বলা হয়।

আল ইশতিবাহ

হক ও বাতিলের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থাকে আল ইশাতবাহ বলা হয়। ধর্মীয় দিক বিবেচনায় এটা একটি মারাত্মক অবস্থা।

এই জাতীয় লোক সম্পর্কে কুরআন মজীদ এরশাদ করেছে–

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۞

এরা (কুফর ঈমানের মধ্যে) দোদুল্যমান। তারা না এদিক আর না সেদিক। আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করেছেন তাদের জন্য আপনি কোন পথ পাবেন না।

আল কারার

হাকিকতের হাল সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন এবং ঐ ব্যাপারে দৃঢ়তাকে কারার বলা হয়। অর্থাৎ দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই কারার বলা হয়।

আল ইনজিয়ায

ইনজিয়াযের আভিধানিক অর্থ চঞ্চলতা, অস্থিরতা। সুফিদের পরিভাষা অনুযায়ী মানুষ তওহিদবাদী হওয়া সত্ত্বেও যখন চঞ্চল ও বেকারার থাকে তখন উক্ত অবস্থাকে ইনজিয়ায বলা হয়।

তওহিদের ব্যাখ্যায় তরিকতপন্থীদের পরিভাষা

আল আলম

আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় কিছুই আলম এবং সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। এই আলম দুভাগে বিভক্ত। আলমে উলুবী এবং আলমে সিফলী তথা পরকাল ও দুনিয়া।

আল কাদীম

অনাদি। অর্থাৎ যার প্রথমে আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই কাদীম নেই। এই পবিত্র সত্তাই সর্বক্ষণ বিরাজমান।

আল মুহদাছ

যা প্রথমে ছিল না পরবর্তী সময়ে অস্তিত্বে এসেছে। সকল আলমই মুহদাছ।

আল আযাল

যার কোন আদি নেই তা-ই আযাল।

আল আবাদু

যার কোন শেষ নেই।

আজ্ জাত

কোন কিছুর অস্তিত্ব ও হাকিকত।

আস সিফাত

যা নিজ সত্তার সাথে বিদ্যমান নয় এবং কোন বিশেষ সত্তাকেও গ্রহণ না করে। যেমন সুন্দর ন্যায়পরায়ণতা।

শাইয়ান

এমন দুটি বস্তু যার অস্তিত্ব একটির সাথে সম্ভবপর এবং বৈধ। যেমন ন্যায়পরায়ণতা ও করুণা।

আজ জিদ্দান

এমন দুটি বিষয় যার একটির অস্তিত্ব অন্যটির অনস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ একটি অন্যটির বিপরীত। যেমন কপটতা ও সরলতা।

আল গায়রান

এমন দুটি বিষয় যার একটি অপরটির ধ্বংস চায়। যেমন সত্য ও মিথ্যা।

আল জওহার

যা নিজের মূল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। যেমন আত্মা।

আল আরজ

যা জওহারের সাথে সম্পর্কীত তাকে আরজ বলা হয় মনুষ্যত্বের সাথে মানুষ নামে পরিচিত। মনুষ্যত্বের অভাব হলেই পশুতে পরিণত হয়।

আল জিসম

জিসম বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশের সমন্বয়কে জিসম বলা হয়। এই অংশগুলো পৃথক করলে জিসম অবশিষ্ট থাকে না।

আস সওয়াল

হাকিকত জানার অনুসন্ধানকে সওয়াল বলা হয়।

আল জওয়াব

সওয়ালে যা জানার অভিপ্রায় থাকে তার উত্তর দেওয়াকে জওয়াব বলা হয়।

আল হুসন

আল্লাহর হুকুম মোতাবেক যা করা হয় তাকে হুসন বলা হয়।

আল কুবহ

হুসনের বিপরীত বস্তুকে কুবহ বলা হয়।

আস্ সাফাহ

হুকুম অমান্য ও পালনে অলসতাকে সাফাহাত বলা হয়।

আজ জুল্ম

কোন কাজ ঠিকমতো না করাকে জুলম বলা হয়।

আল আদল

কোন কাজ যথাযথভাবে করার নামই আদল।

আল মালিক

যাঁর হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করা হয় তিনি মালিক।

আল খাতের

মানুষের মনে কুধারণা এবং প্ররোচনার সৃষ্টি হতে থাকা এবং তাতে মানুষের বিপদের আশংকা রয়েছে। কিন্তু এটা অন্তরে স্থায়িত্ব লাভ করে না।

আল ওয়াকে

যেসকল কুধারণা ও প্ররোচনা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে তাকে ওয়াকে বলে।

খাতরা ও ওয়াকে বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ খাতরা সাময়িক এবং ওয়াকে স্থিতিশীল। ফলে শায়েখগণ বলেছেন– খতরা অন্তরের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল আর ওয়াকে জমে বসল।

সুফিদের ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিভাষা

আল এখতিয়ার

নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাধিকারে দেওয়া এবং পছন্দ করাই এখতিয়ার। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার নিজের এখতিয়ার হতে অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় বে-এখতিয়ার করে দিতে পারতেন। অথচ তিনি তা করেন নি। বরং বান্দাকে ইচ্ছা-অনিচ্ছার মালিক করে দিয়েছেন। বন্দেগি ও অনুগ্রহের চাহিদা হচ্ছে বান্দার নিজের এখতিয়ারে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ নিজের জন্য অনুসরণ করা।

মানুষেরা হজরত আবু ইয়াযিদ (র) এর নিকট জিজ্ঞেস করল: আমীন কাকে বলে?

তিনি বললেন: যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আপন করে নেয় সেই আমীন।

হজরত জোনায়েদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে– একবার তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন– হে আল্লাহ! আমাকে এই জ্বর থেকে মুক্তি দান কর।

তিনি তার অভ্যন্তর হতে আওয়াজ এলো, হে জোনায়েদ! তুমি কে যে আমার মালিকানায় অনধিকার চর্চা করছ? আমি আমার মালিকানায় কীভাবে প্রভুত্ব করব তা আমি জানি তোমার কর্তব্য আমার এখতিয়ারের সামনে মাথাবনত করা। তোমার এখতিয়ারকে প্রাধান্য দেওয়া নয়।

আল এমতেহান

নানা ধরনের বিপদাপদ চাপিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের যে পরীক্ষা করেন– তাকে এমতেহান বলা হয়।

আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের স্থান নির্বাচন করার স্বয়ং তা তাদের নিকট প্রকাশ করার অধিক মর্যাদা লাভ করার শক্তি, প্রতিপালন করার জন্য নানা প্রকার বিপদাপদ দিয়ে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। এই জাতীয় লোক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞

"এরা ঐ সকল লোক যাদের অন্তঃকরণকে আল্লাহ তায়ালা পরহেযগারীর জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাঁদের জন্য ক্ষমা ও মহান প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা: হুজরাত– ৩)

আরও ঘোষণা করেছেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۞

"আমি নিশ্চয় তোমাদের ভয়ভীতি ক্ষুধা-তৃষ্ণার এবং জানমালের ক্ষতি ও আমদানিতে লোকসান করে পরীক্ষা করব। এই অবস্থায় যারা ধৈর্যের সাথে কাজ করবে তাঁদের শুভ সংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা: আল-বাকারা– ১৫৫)

আল-বালা

বিপদাপদ রোগ-শোক এবং অন্যান্য প্রকার বাধা-বিঘ্নকে বালা বলা হয় আর এটা দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। বালা যত বেশি হয়; আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ততই বেশি হয়। এই বালা যেন ওলিদের পোশাক এবং সুফিদের দোলনা; আর নবিদের আহার্য।

এই ব্যাপারে মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً –

"আমাদের নবি সম্প্রদায়ের উপরই সবচেয়ে অধক বিপদ অবতীর্ণ হয়ে থাকে।"

আরও এরশাদ করেছেন:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ –

"অন্যান্য সব লোকের চেয়ে নবিদের উপরই বেশি বিপদাপদ চেপে থাকে। তারপর ওলিদের উপর। তারপর ক্রমবর্ধমান ধারায় বিপদ নাযিল হতে থাকে।"

মূলত বালা নেকবখতদের জন্য আল্লাহর নেয়ামত। দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ বাহ্য আকৃতি মাত্র। ধৈর্যসহকারে বিপদাপদ বরণ করে নিলে পুণ্যের ভাগী এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। অপরদিকে কাফের এবং নাফরমানের উপর যে বিপদাপদ নিপতিত হয় তা বালা নয় বরং তাদের দুর্ভেদ্য এবং শাস্তি।

আত্-তাহাল্লী

অভিধান অনুযায়ী তাহাল্লীর অর্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অলঙ্কৃত করা। তাহাল্লী যেন বাহ্য সাজ-সজ্জারই নাম। তরিকতপন্থীদের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির হাকিকতে দৃষ্টি না করে তার কথা ও কাজকে বাহ্যভাবে কোন সম্প্রদায়ের অনুরূপ করা এমন মানুষ পৃথিবীতে অধিকাংশ সময় খুব তাড়াতাড়ি বদনাম হয়। পরকালে বদনামের তো কোন কথাই নাই।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন–

বাহ্য সাজ-সজ্জা এবং মুখের দাবির নামই ঈমান নয়। যতক্ষণ অবধি ঐসব বিষয়ে অন্তরে স্থান লাভ না করে– ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের দাবি করা অনর্থক।

আত্-তাজাল্লী

মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের হৃদয়ে নূরের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন– তাকে তাজাল্লী বলা হয়। ফলে তিনি ইচ্ছা করলে অন্তর্চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পারেন। চর্ম চক্ষু ও অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখার পার্থক্য রয়েছে যে অন্তর দ্বারা দেখার লোক দেখতে চাইলে দেখতে পারেন আর না দেখতে চাইলে না দেখতে পারেন। কিংবা এক সময় দেখেন আবার অন্য সময় দেখেন না।

অপরদিকে চোখের দেখার সময় অবশ্য দেখে থাকেন। যেমন জান্নাতবাসী জান্নাতে দেখবেন। সেখানে এমন হবে না যে কেউ না দেখতে চাইলে দেখবে না। কারণ, তাজাল্লীতে পর্দার অন্তরায় হতে পারে দেখার মধ্যে কোন অন্তরায় নেই।

আত্-তাখাল্লী

تخلى منه وعنه-এর অর্থ কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা আর তা থেকে পৃথকতা অবলম্বন করা। তাসাউফপন্থীদের পরিভাষায়– যেসব বিষয়বস্তু বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ হতে গাফেল রাখে তা পরিত্যাগ করা এবং তা হতে দূরে সরে থাকা।

আশ শুরুদ

বিপদাপদ, অন্তরায় ও চঞ্চলতা হতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সত্যের সন্ধান করা। যেমন এই উদ্দেশ্যে সালেক বিদেশ ভ্রমণ করে ও প্রশংসনীয় কাজের সাথে শরিক থাকে; অন্যায়ের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করে। অন্তরায়কে দূর করার উদ্দেশ্যে সালেক যে পরিশ্রমই করে তাকেই শুরুদ বলা হয়।

আল কুসুদ

স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে দৃঢ় হওয়াকে কুসুদ বলে।

আল ইসতিফা

ইসতিফা অর্থ– চয়ন করা এবং সম্মানিত করা। সুফিদের পরিভাষা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ মারেফাতের জন্য বান্দার অন্তঃকরণকে খালি করা। এই স্তরে সকল মুমিন এক সমতুল্য। এতে বিশেষ, সাধারণ, বাধ্য, অবাধ্য, ওলি হোক কিংবা নবি সকলেই সমান। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ –

তাই মহানবি ﷺ দোয়া করতেন– হে আল্লাহ! আমার নিকট প্রতিটি বস্তুকে তার আসল রূপে প্রদর্শন কর।

আশ-শুরব

আল্লাহর আনুগত্যে যে স্বাদ এবং তার প্রেমপ্রীতিতে যে আনন্দ পাওয়া যায় সুফি সম্প্রদায় তাকে শুরব বলেন। আসলে শুরব ব্যতীত কেউ দীর্ঘকাল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির কষ্টসহ্য করতে সক্ষম হয় না। দেহ যেমন পানি স্নাত হয়ে উৎফুল্ল হয়, তার চেয়েও মুমিনের হৃদয় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে বেশি আনন্দমুখর হয়ে উঠে।

আজ জওক

জওক ও শুরব সমগোত্রীয় ও সমার্থবোধক। উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটা যে শুরব শুধু আনন্দ ও স্বাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। জওক আরাম ও কষ্ট উভয়ের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। এটা স্বাদ, আরাম এবং বিপদাপদে সকলের প্রতিই ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ذُقْتُ الْوَدَّةَ وَذُقْتُ الْبَلَاءَ وَذُقْتُ الرَّاحَةَ ـ

"আমি মিষ্টির স্বাদ পেয়েছি; কষ্টের মজা পেয়েছি এবং আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছি।"

প্রেমাস্পদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার স্বাদ যে-কোন প্রকার কষ্ট আনন্দের স্বাদের অপেক্ষায় কোন অংশে কম নয়। চিন্তা করে দেখুন যে কোন ব্যক্তিই তার সন্তান-সন্ততির জন্য অম্লান বদনে সর্বপ্রকার কষ্টই সহ্য করে থাকে।

সামা

সামার হাকিকত ও গুরুত্ব

জ্ঞানার্জন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব সম্প্রদায়কে পঞ্চশক্তি দান করেছেন। শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, স্বাদ গ্রহণ শক্তি ঘ্রাণ শক্তি ও স্পর্শ শক্তি। দেখার জন্য শুধু চোখ, শ্রবণ করার জন্য শুধু কান, ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য শুধু নাক এবং স্বাদ গ্রহণ করার জন্য শুধু জিহ্বা দান করেছেন।

কিন্তু ঠাণ্ডা, গরম, নরম, শক্ত জানার অনুভূতি শক্তি সারা শরীরে ছড়িয়ে রেখেছেন। যেমন দেখা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ গ্রহণ করা, স্পর্শ করার শক্তির প্রয়োগ জায়েয না জায়েয, মোবাহ মাকরুহ হওয়ার সীমা তাতে সীমিত যে তাকে কোথায়, কীভাবে এবং কোন নিয়তে ব্যবহার করা হয়েছে (তদ্রূপ শ্রবণ শক্তির তথা সামা) জায়েয না জায়েয হওয়ায় সীমা হচ্ছে কোন অবস্থায় কী শোনা হলো এবং কোন নিয়তে শোনা হলো।

কাজেই শুধু সামার ওপর কোন প্রকার হুকুম লাগানো যায় না। যেই হুকুমই লাগানো হবে তা শ্রুত বিষয়বস্তুই অবস্থা ও নিয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে লাগাতে হবে।

মোটকথা জ্ঞান লাভের সবচেয়ে প্রশস্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যমই শ্রবণ করা তথা সামা। কাজেই আহলে সুন্নত কালকে চোখের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেননা মানুষ শুনেই ঈমান গ্রহণ করে। নবিদের আহ্বান শোনার পরই নবিদের অনুগত হওয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে।

সামার প্রকারভেদ

কোন কোন বিষয় সামা (শ্রবণ করা) বান্দার জন্য ওয়াজিব। কোনটা পছন্দনীয় কোনটা নির্দোষ আবার কোনটা হারাম। আবার কোনটা মাকরুহ ও অপছন্দনীয়।

যার সামা ফরজ

কুরআন মজীদ এবং রাসূলের শিক্ষা সামা (শ্রবণ) ফরজ। সকল মানুষ বিশেষ করে যারা ঈমানদার তাঁদের জন্য চুপ করে মনোযোগের সাথে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণী শোনা ফরজ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

যখন তোমাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ করে মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। হয়ত তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে।" (সূরা: আল-আরাফ– ২০৪)

আরও এরশাদ করেছেন:

فَبَشِّرْ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ ۞

"আমার যে বান্দা মনোযোগসহকারে কান লাগিয়ে কথা শুনে এবং তার উত্তম অংশকে গ্রহণ করে তাঁদের সুসংবাদ দান করুন। এঁরাই ঐসব লোক যাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এরাই জ্ঞানী।"

(সূরা: আয্-যুমার– ১৭-১৮)

আরও এরশাদ করেছেন:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۞

"প্রকৃত ঈমানদার তো ঐসব লোক আল্লাহর জিকর শুনে যাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে।" (সূরা: আল-আনফাল– ২)

আরও বলেন:

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۞

"তাদের মতো হয়ো না যারা বলে আমরা শুনেছি। অথচ তারা শুনে না।" (সূরা: আল-আনফাল– ২১)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই জাতীয় লোক কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করে বলবে:

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

"হায় আফসোস! আমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করতাম এবং জ্ঞানের দ্বারা কাজ করতাম তাহলে আজ দোযখবাসী হতাম না।"

হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ - فَقَالَ اَنَا اَقْرَأُهٗ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهٗ مِنْ غَيْرِىْ -

একবার মহানবি ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে এরশাদ করলেন, আমাকে কুরআন শুনাও!

তিনি আরজ করলেন– আপনাকে কুরআন শুনাব? অথচ আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এরশাদ করলেন নিঃসন্দেহে আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অন্যের নিকট হতে শোনা আমার অধিক পছন্দ।

উক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম বলেন– কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা অপেক্ষা শ্রবণ করা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ কথা বলায় এক প্রকার গর্ব পরিলক্ষিত হয় এবং শোনায় বিনয়তা প্রকাশ পায়। নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও ফজিলত প্রমাণিত হয়।

عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رض كُنْتُ فِيْ عَصَابَةٍ فِيْهَا ضُعَفَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَتِرُ بَعْضًا مِنَ الْعُرْى وَقَارٍ يَقْرَءُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ الْقِرْاَةَ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَاٰهُ الْقَارِئُ سَكَتَ، قَالَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ مَاذَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قُلْنَا كَانَ قَارٍ يَقْرَاُ لِقَرَاُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ بِقِرْاَتِهٖ ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ وَسْطِنَا لِيَعْدِلَ نَفْسَهٗ فِيْنَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَعْرِفْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ اَحَدٌ، قَالَ فَكَانُوْا ضَعَفَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْشِرُوْا صَعَالِيْكَ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالْفَوْزِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِكُمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسُ مِاَئَةِ عَامٍ ـ

হজরত আবু সাঈদ খুদরী (র) বলেন, আমি একদিন এক গরিব মুহাজিরের দলের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় না থাকায় তারা জড়সড় হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন কারি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন আর আমরা শুনছিলাম।

হজরত আবু সাঈদ (র) বলেন: ইত্যবসরে মহানবি ﷺ তাশরীফ আনলেন। এমনকি আমাদের মাথার নিকট এসে পড়লেন। কারি তাঁকে দেখে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন।

হজরত খুদরী (রা) বলেন: মহানবি ﷺ আমাদের সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছ?

আমরা আরজ করলাম: কারি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন আর আমরা শুনছিলাম।

এরশাদ করলেন: আল্লাহর শুকরিয়া যিনি আমার উম্মতে এমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তাদের সাথে শরীক হই।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, অতঃপর মহানবি ﷺ আমাদের মধ্যে এমনভাবে বসে গেলেন যেন তিনি আমাদেরই একজন। তারপর তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, এমন কর। ফলে লোকে গোল হয়ে বসল। এখন মহানবি ﷺ-কে কেউ অন্য লোক হিসেবে ভাবতে পারছিল না।

অতঃপর মহানবি ﷺ এসব গরীব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে দরিদ্র মুহাজিরগণ! পরকালে তোমাদের জন্য পূর্ণ বিজয়ের সুসংবাদ, তোমরা তোমাদের ধনী সাথিদের চেয়ে অর্ধ দিবস পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সেই অর্ধ দিবস পাঁচ শত বছরের সমান হবে।

কুরআন মাজীদ সামার কয়েকটি প্রতিক্রিয়া

মহানবি ﷺ এর উপর প্রতিক্রিয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– একদিন মহানবি ﷺ তাঁর গৃহে ছিলেন। দাঁড়ানোর সময় মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। হজরত আবু বকর (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অবস্থা দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কী হলো? মাশাআল্লাহ! আপনি তো এখনও যুবক ও স্বাস্থ্যবান।

এরশাদ করলেন: সূরা হুদ এবং তার বিষয়বস্তুর সমতুল্য সূরা আমাকে বৃদ্ধ বানিয়েছে।

একবার সাহাবায়ে কেরাম মহানবি ﷺ এর নিকট এই আয়াত পাঠ করলেন:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

"আমার নিকট বেড়ি, আগুনের আসবাবপত্র এবং গলা ঘোটার আহার্য এবং মর্মান্তিক আজাব রয়েছে।" (সূরা: মুয্যাম্মিল– ১২-১৩)

এই আয়াত শুনে মহানবি ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

হজরত ওমরের উপর প্রতিক্রিয়া

বর্ণিত আছে একবার কোন এক ব্যক্তি হজরত ওমর (রা) এর সামনে এই আয়াত পাঠ করলেন:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ۝

"তোমার প্রভুর আজাব আসা এক স্থির সিদ্ধান্ত বিষয়। কেউ তাকে বাধা দিতে সক্ষম হবে না।" (সূরা: তূর– ৭-৮)

এই আয়াত শুনে হজরত ওমর (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহর ভয়ে তিনি একমাস পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহর উপর প্রতিক্রিয়া

বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা)-এর নিকট এই আয়াত পাঠ করেন:

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۝

"তাদের জন্য জাহান্নামেরই বিছানা হবে আর জাহান্নামেরই ওড়না (চাদর) হবে।" (সূরা: আল-আরাফ– ৪১)

এই আয়াত শুনামাত্রই তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। লোকে মনে করল, তাঁর প্রাণপাখি উড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পড় সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

লোকে বলল– বসুন। তিনি বললেন, এই আয়াতের ভয় আমাকে বসতে দিচ্ছে না।

হজরত যারারাহ ইবনে আবু আওফা

হজরত জারারাহ (রা) প্রখ্যাত সাহাবা এবং সর্বজন প্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি কুরআনের একখানি আয়াত তেলাওয়াত করে খুব জোরে চিৎকার করে উঠেন। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)

আবু বকর শিবলী (র)

হজরত আবু বকর শিবলী (র)-এর সামনে কেউ এই আয়াত পাঠ করলেন:

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ۝

'যখন তুমি ভুলে যাও তখন তোমার প্রভুর জিকর কর।"

(সূরা: কাহ্ফ– ২৪)

সারা পৃথিবী একত্রিত হয়েও আমার প্রভুর জিকর করতে অক্ষম– একই কথা বলে তিনি চিৎকার করে জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি বললেন, আল্লাহর কালাম শোনার পর যে তার কাঠামো হতে পৃথক না হয় তার কথা চিন্তা করে আমি বিস্মিত হই।

শায়খ আবুল আব্বাস আশকানী (র)

একবার আমি আবুল আব্বাস আশকানী (র) এর কাছে পৌঁছে দেখলাম তিনি এই আয়াত পাঠ করছেন–

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَيَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ ۞

"আল্লাহ্ তায়ালা একজন গোলামের উদাহরণ দিচ্ছেন– অন্যের সম্পত্তি এবং কোন কিছুর উপরই যার অধিকার নেই।" (সূরা: আন্-নাহাল– ৭৫)

এই আয়াত পাঠ করছেন আর ক্রন্দন করছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আমার মনে হলো তিনি আর ইহজগতে নেই। আমি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, হে শায়খ! আপনার কী হয়েছে?

তিনি বললেন: এগার বছর ধরে এখানেই রয়েছি, আর সম্মুখে এগুতে পারলাম না।

শায়খ আবু আব্বাস আত্তার (র)

আবুল আব্বাস আশকানী (র) শায়খ আবুল আব্বাস আত্তার (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন: হে শায়খ! আপনি দৈনিক কতবার করআন খতম করেন?

তিনি বললেন: প্রথমে তো দিন ও রাতে দু' খতম করতাম। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা তো এই যে চৌদ্দ বছর হলো শুরু করে সূরা আনআম পর্যন্ত পৌঁছেছি।

আবুল আব্বাস আত্তার (র) কারিকে বললেন– পড়।

কারি পড়লেন:

يَآاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجَةً ۞

"হে আমাদের ক্ষমতাবান নেতা! আমরা এবং আমাদের পরিবারগণ বিপদে নিপতিত। আমরা সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে এসেছি।"

(সূরা: ইউসূফ– ৮৮)

তিনি আবার বললেন– পড়।

কারি পড়লেন:

قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۞

"হজরত ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা বললেন: যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ তার ভাইও ইতঃপূর্বে চুরি করেছিল।" (সূরা: ইউসূফ– ৭৭)

তিনি আরও বললেন– আবার পড়।

কারি পাঠ করলেন:

لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰ حِمِيْنَ ۞

"আজ তোমাদের পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ তোমাদের মাফ করবেন। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান।" (সূরা: ইউসূফ– ৯২)

এটা শুনে আবুল আব্বাস আত্তার বললেন: হে আমার মাওলা! তুমি ইউসুফের চেয়ে অধিক দয়ালু। ইউসুফ তাঁর ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন, তুমি আমার সাথে সেই ব্যবহার কর।

একজন নেককার মহিলার ঘটনা

হজরত ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন: একবার আমি কুফার একটি গ্রামে যাই। এক বৃদ্ধাকে আমি সেখানে নামাযরত অবস্থায় দেখি। তার মুখমণ্ডলে নেক জ্যোতির চিহ্ন ফুটে উঠছিল। তার নামায শেষ হলে দোআর জন্য আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: বৎস! তুমি কুরআন তেলাওয়াত করতে জান?

আমি বললাম: জি হাঁ।

তিনি বললেন: তাহলে আমাকে কিছু তেলাওয়াত করে শুনাও। আমি দুটি আয়াত পাঠ করতে না করতেই তিনি এমন জোরে চিৎকার করে ওঠলেন যে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

আহমদ ইবনে আবুল জাওয়ারী বলেন: একবার আমি এক জঙ্গলে কূপের পাশে একজন যুবককে ময়লা গুদরী পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। যুবক আমাকে দেখে বলল: হে আহমদ! তুমি ঠিক যথা সময়ে পৌঁছেছ। এই সময় আমার সামা শোনার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে। আমাকে কিছু কুরআনের আয়াত শুনাও।

আহমদ বলেন: আমি এই আয়াত তেলাওয়াত করলাম:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞

"যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। তারপর তাতে তারা অটল থাকে। তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে (তাদের বলে) ভয় করো না; চিন্তা করো না। বরং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সংবাদে আনন্দিত হও।"
(সূরা: হা-মীম সাজদাহ- ৩৭)

যুবক বলল, হে আহমদ! তুমি ঐ আয়াতই তেলাওয়াত করলে যা এখনই আমার সম্মুখে ফেরেশতাগণ পাঠ করছিলেন। এই কথা বলার সাথে সাথে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জিনদের উপর প্রতিক্রিয়া

তায়েফ সফরের সময় মহানবি ﷺ পথিমধ্যে ফজরের নামায পড়াকালীন একদল জিন তার কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সাথে সাথেই তারা ইসলাম গ্রহণ করল।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন আমাদের বলেন:

أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۞

"জিনদের একটি দল কুরআন শুনল। তারপর তারা তাদের জাতির কাছে গিয়ে বলল, আমরা এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা সত্যের পথ প্রদর্শন করে। ভাইসব, আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন হতে আমরা আর কাউকেও আমাদের প্রভুর সাথে অংশীদার করব না।" (সূরা: জিন- ১-২)

একজন বুযুর্গ বলেন, একবার আমি এই আয়াত পাঠ করছিলাম:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۞

"সেই দিনের ভয়াবহতাকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা: আর-বাকারা- ২৮১)

এমন সময় আমি আওয়াজ আসল- আস্তে পড়। তোমার এই আয়াত শুনে তার ভয়ে চারজন জিন মারা গেছে।

কাফেরদের উপর কুরআনের প্রতিক্রিয়া

কুরআনের একটি অন্যতম মুজিযা এই যে যেসকল কুরাইশ কাফের এমনকি তাদের নেতৃবৃন্দ কুরআন ও কুরআনের বাহক মহানবি ﷺ এর নাম শুনে মুখ বিকৃত করত তারাও লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনত। বিশুদ্ধ ভাষী নাজার ইবনে হারেস, ভাষাবিদ উৎবাহ ইবনে রবীয়া এবং সুবক্তা আবু জাহল ইবনে হিশামও অতি সংগোপনে মহানবি ﷺ এর কুরআন তেলাওয়াত করা শুনত। এমনকি এক রাতে লুকিয়ে মহানবি ﷺ এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে উতবাহ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। পরে সে আবু জাহলকে বলেছিল, এটা যে মানুষের বাণী নয় তা আমি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছি।

হজরত ওমর (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি বরং তিনি ইসলামের একজন প্রধান শত্রু। তিনি তখনকার নিজের একটি ঘটনা সম্পর্কে বলেন- আমার ইচ্ছা হলো কুরআন শুনার। এই উদ্দেশ্যে আমি কাবার দিকে রওয়ানা

হলাম। এদিকে মহানবি ﷺ-ও কাবার দিকে যাচ্ছিলেন। আমি কিছু দূরে থাকতেই তিনি কাবা গৃহে প্রবেশ করে নামায শুরু করলেন। নামাযে তখন তিনি সূরা পড়া শুরু করলেন। সে পবিত্র বাণী শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ধারণা হচ্ছে আল্লাহর কসম এত বড় কবি। এই ধারণার উদ্রেক হতে তিনি পাঠ করলেন–

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ـ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ

"এটা রাসূল করীমের বাণী। কোন কবির কবিতা নয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কম সমংখ্যক মানুষই ঈমান আনয়ন করে।" (সূরা: হা-ক্কাহ- ৪০-৪১)

এটা শুনার সাথে সাথেই আমার মনে হলো আরে এতো আমার মনের বিষয় জানতে পেরেছে। দেখা যাচ্ছে– কবিই শুধু নয় বরং যাদুকরও।

আমার এই চিন্তা শেষ হতে না হতেই তিনি পাঠ করলেন–

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ـ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

"এটা কোন যাদুকরের বক্তব্য নয়। তোমাদের কম সংখ্যকই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। এটা বিশ্ব প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।"
(সূরা: হা-ক্কাহ- ৪২-৪৩)

হজরত ওমর (রা) বলেন: মহানবি ﷺ সূরা শেষ করার পর আমার মনে হলো, ইসলামের নূর ধীরে ধীরে আমার অন্তরে প্রবেশ করছে।

মূলত মানুষ যদি সুষ্ঠু বিবেক বুদ্ধি ও মনোযোগের সাথে কুরআনের প্রতি খেয়াল করে– তাহলে তার ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল আর কিছুই হতে পারে না। তার উপদেশ সকল উপদেশ অপেক্ষা উত্তম, বর্ণনা ভঙ্গি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোমুগ্ধকর। তার নির্দেশ সূক্ষ্ম ও প্রাঞ্জল, তা সবচে সতর্ককারী, তার কাহিনী সকল কাহিনির চেয়ে উপদেশমূলক।

কুরআনের অনুসারী দুনিয়ার সবখানেই বিজয়ী, পরকালে সম্মানী। অমান্যকারী যেখানে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরকালে অনন্ত নরকবাসী হয়।

অন্যান্য বিষয়ের সামা

কুরআন ও হাদীসের সামা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের সামা সম্পর্কে এই মূলনীতি সম্মুখে রাখতে হবে যে যেমন যাবতীয় হালাল ও উপকারী সৌন্দর্যময় বস্তু, হালাল বস্তু খাওয়া, দেহের জন্য নরম বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তেমনি অশোভন উক্তি ও রাগ রাগিনী শুনা ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় আওয়াজের সামা (শোনা) জায়েয। তা কবিতাই হোক ; বা গদ্যই হোক, একা পড়া হোক, বা সুর করেই পড়া হোক। কারণ, সুকণ্ঠ এবং সুমধুর স্বর খুবই প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু কেউ যদি বলে সুমধুর স্বর– আমার ভালো লাগে না তাহলে বুঝতে হবে সে মিথ্যা বলছে অথবা কপটতা করছে কিংবা সে মানবজাতির মধ্যে পরিগণিত নয়। বরং সে যাবতীয় জীবের মধ্যে পৃথক কোন জীব। কারণ, সুললিত কণ্ঠে শুধু মানুষই নয় বরং অন্যান্য জীবও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে।

সুললিত কণ্ঠের প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ

১. বর্ণিত আছে একবার ইসহাক মুসেলি বাগানে বসে একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তার কবিতা পাঠ একটি বুলবুল চুপ করে শুনছিল। তার মধুর কণ্ঠস্বর এমনই প্রতিক্রিয়াশীল হলো যে বুলবুলটি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে মারা গেল।

২. ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন: আমি একবার এক আরব গোত্রের সর্দারের মেহমান হলাম। দেখলাম একজন কৃষ্ণবর্ণ গোলামকে পিঠমোড়া বাঁধা অবস্থায় রৌদ্রের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। তার এই কষ্টকর অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। সুতরাং আমি তার ব্যাপারে সুপারিশ করার আশা করলাম।

কিছুক্ষণ পর খাবার এলে, সর্দার বললেন: হে সম্মানিত অতিথি! আসুন এবার খাওয়া যাক।

আমি বললাম: না আমি কিছুই খাব না। একজন মেহমান খাবে না, এর চেয়ে অপমানজনক বিষয় একজন আরব মেজবানের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

আমার কথায় আরব সর্দার ব্যথিত হয়ে বললেন: ভাই আমার কী অপরাধ যে আপনি আহার গ্রহণ করবেন না। যতক্ষণ আপনি আমার মেহমান ততক্ষণ আমার সকল সম্পদের উপর আপনার অধিকার রয়েছে।

আমি বললাম: আপনার কোন সম্পদেরই আমার দরকার নেই শুধু এই দুর্ভাগা গোলামটি আমাকে দিয়ে দিন।

সর্দার বললেন: প্রথমে তার অপরাধের কথা শুনুন তারপর তার মুক্তির কথা ভাবুন।

আমি বললাম: সে এমন কী অপরাধ করেছে?

সর্দার বললেন: এই গোলাম অতি মধুর স্বরে হুদী (উট চালানোর সময় উট চালক যে গান করে) গাইতে পারে। আমি তাকে উটের ঘাস আনতে পাঠিয়েছিলাম। সে প্রতিটি উটের পিঠে দ্বিগুণ বোঝা চাপিয়ে হুদী গাওয়া শুরু করে। তার হুদী শুনে উট পাগলের ন্যায় পথ অতিক্রম করে বাড়ি পৌঁছে। পিঠের বোঝা নামানোর পর একটি একটি করে সকল উটই মারা পড়ে। আমি বললাম– হে সম্মানিত সর্দার, দৃঢ় বিশ্বাস আপনি সত্যের অপলাপ করবেন না। কিন্তু এই বিস্ময়কর কাহিনি আমি প্রমাণ ছাড়া কীভাবে গ্রহণ করতে পারি?

আমরা এই আলাপ-আলোচনার মুহূর্তে কয়েকটি উট পানি পান করতে আসল। সর্দার গোলামদের জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কয়দিন ধরে পানি পান করে না?

তারা বলল: আজ তিনদিন ধরে।

সর্দার সেই গোলামকে হুদী গাওয়ার নির্দেশ দিলেন। গোলাম হুদী শুরু করতেই তৃষ্ণার্ত উটগুলো পানির পাত্র হতে মুখ উঠিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল। ক্ষণিকের মধ্যেই উটগুলো পানি পান না করেই জঙ্গলের দিকে দৌড়িয়ে চলে গেল।

এরপর সর্দার আমাকে গোলামটি দান করলেন। আর এ কথা পরীক্ষিত যে উট ও গাধাচালক যখন মধুর স্বরে গান ধরে তখন উট ও গাধার মাঝে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা তাদের চলার ঢং দেখেই বুঝা যায়।

৩. খোরাসান ও ইরাকের লোক রাতের অন্ধকারে হরিণ শিকার করার উদ্দেশ্যে কাসার থালা বাজিয়ে এক প্রকার মধুর আওয়াজ সৃষ্টি করে। হরিণ উক্ত আওয়াজ শুনে বিমোহিত হয়ে ধরা পড়ে।

ভারতের এক শ্রেণির লোক জঙ্গলে গিয়ে বেহালা বাজাতে শুরু করে। বেহালার সুর শুনে হরিণ এসে তাদের চারপাশে ঘুরতে থাকে। সেই সুরের মূর্ছনায় এক পর্যায়ে চোখ বন্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপর শিকারীর দল তাদের বেঁধে নিয়ে যায়।

সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

زَيِّنُوْا اَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْاٰنِ ـ

"মধুর স্বরে কুরআন তেলাওয়াত কর।

মুফাসসিরগণ– يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَايَشَآءُ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন– মধুর স্বরের দানও এর মধ্যে পরিগণিত যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অন্যের তুলনায় তাকে অধিক দান করেন।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَسْمَعَ صَوْتَ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَسْتَمِعْ صَوْتَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ ـ

"যে ব্যক্তি হজরত দাউদ (আ) এর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছে করে সে যেন আবু মূসা আশআরীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে।"

কবিতার সামা

কবিতা সম্পর্কে মহানবি ﷺ এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এরশাদ করলেন:

كَلَامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ ـ

"কবিতাও এক প্রকার বাণী। ভালো হলে ভালো-মন্দ হলে মন্দ।"

এই ব্যাপারে মহানবি ﷺ আরও এরশাদ করেছেন:

اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةٌ ـ

"কোন কোন কবিতা হেকমত বিশিষ্ট কথায় পরিপূর্ণ।"

তিনি আর বলেছেন:

اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وُجِدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ـ

"হেকমত মুমিনদের লুপ্ত বস্তু। যেখানেই তা পাওয়া যায় তাতে তাদের অধিকারই বেশি।"

সাহাবাগণ কবিতা পাঠ করতেন মহানবি ﷺ শুনতেন। মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন–

اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيْدٍ

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَا اللهِ بَاطِلُ

وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَامُحَالَةَ زَائِلُ

আরববাসীদের মাঝে লবীদের এই কবিতায় সত্য মূর্তমান হয়ে উঠেছে

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।

পৃথিবীর সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল।

আমর ইবনে শুরীদ (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

اِسْتَنْشَدَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تُرْوِىْ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ ابْنِ اَبِى الصَّلْتِ شَيْئًا؟ فَاَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا مَرَرْتُ عَلٰى بَيْتٍ قَالَ هِيْهِ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ يُسْلِمُ فِىْ شِعْرِهٖ

মহানবি ﷺ আমাকে এরশাদ করলেন, উমাইয়া ইবনে আবু সালতের কোন কবিতা যদি তোমার জানা থাকে তাহলে বল। আমি তাঁকে একশত কবিতা শুনালাম। একটি কবিতা শেষ হতেই বলতেন, আরও শুনাও। পরে মহানবি ﷺ এরশাদ করলেন, সে তার কবিতার মধ্য দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

হজরত ওমর (রা) কবিতার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে নসিহত করতেন। কারণ কবিতার মধ্যে লোকে অনেক বাড়াবাড়ি করে থাকে। ফলে দেখা গেছে একটি সম্প্রদায় সর্বপ্রকার কবিতা শুনাকেই হারাম বলে। অথচ দিনরাত তারা পরনিন্দা করে বেড়ায়। তাতে তারা কোন দোষ দেখে না। অন্য একটি সম্প্রদায় যে কোন প্রকার কবিতাকেই হালাল বলে। দিনরাত প্রেমিক প্রেমিকার নাক মুখ এবং দেহ সৌষ্ঠব গেয়ে বেড়ায়।

কাজেই এই প্রসঙ্গে মহানবি ﷺ এর বাণীই যথেষ্ট যে, কবিতাও এক প্রকার বাণী। ভালো হলে ভালো-মন্দ হলে মন্দ।

গান ও রাগ শোনা

এর প্রকৃত প্রমাণ হজরত আয়েশা (রা) এর এই বর্ণনা–

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِىْ جَارِيَةٌ تُغَنِّىْ فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ رض فَلَمَّا اَحَسَّتْهُ وَسَمِعَتْ حِسَّهُ فَرَّتْ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ رض تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَااَضْحَكَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ كَانَتْ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تُغَنِّىْ فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّكَ فَرَّتْ، فَقَالَ

عُمَرُ: لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى اَسْمَعَ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَمِعَ -

হজরত আয়েশা (রা) বলেন: আমার পাশে বসে এক দাসী গান গাইছিল। তখন হজরত ওমর আগমন করেন এবং ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চান। হজরত ওমরের আগমন টের পেয়ে দাসী সেখান থেকে পালিয়ে যোয়।

হজরত ওমর ভেতরে প্রবেশ করতেই মহানবি ﷺ মুচকি হাসি হাসছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন হাসছেন?

এরশাদ করলেন: দাসী আমাদের পাশে বসে গান করছিল। তোমার আগমন টের পেয়ে পালিয়ে যায়।

হজরত ওমর বললেন: আপনি যা শুনেছেন আমি তা না শোনা পর্যন্ত দাসীকে ছাড়ব না।

মহানবি ﷺ দাসীকে ডেকে গান শুনাতে বললেন।

রাগ ও গান সম্বন্ধে সুফিদের অভিমত

এ ধরনের কিছু হাদীস সাহাবাদের দ্বারা বর্ণিত আছে। শায়খ আবু আবদুর রহমান সালমী (র) তার রচিত কিতাবুস সামা'তে প্রমাণ করেছেন– 'সামা' মোবাহ।

অবশ্য সুফিদের মতে কোনকিছু মোবাহ হলে তার প্রতি আমল করতে হবে– এমন কোন কথা নেই। বরং তারা বলেন: যা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় এমন কাজই বান্দার করা কর্তব্য। শুধু বৈধ সন্ধান করা সাধারণ লোকের কাজ ও পশু প্রবৃত্তি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শরীয়তের দায়িত্ব পালন করার এবং সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষের কর্তব্য উপকারী কাজে লিপ্ত থাকা এবং অনোপকারী কাজ করা হতে বিরত থাকা।

গ্রন্থকারের অভিমত

আমি একবার মারদে ছিলাম। সেখানে একজন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস ইমাম ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন সামা নির্দোষ আমি এই ব্যাপারে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছি।

আমি বললাম: যে কাজ ধর্মের অনিষ্টের মূল তাকে আপনি মোবাহ হিসেবে প্রমাণ করে তো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে রাখলেন।

তিনি বললেন: আপনি তাকে হালাল মনে না করলে সামা কেন করেন?

আমি বললাম: অন্তরে প্রতিক্রিয়া হয় তা হালাল, মোবাহ হলে মোবাহ। নতুবা হারাম।

অন্তরে সামার প্রতিক্রিয়া দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

১. যা কিছু শুনা হয় তা কেমন?

২. শ্রবণকারী কে এবং কোন স্বভাবের।

যদি বিষয়বস্তু ভালোও হয় কিন্তু শ্রোতা যদি বদ স্বভাবসম্পন্ন হয় তাহলে তার মধ্যে বদই সৃষ্টি হবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلاً - يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۞

"যারা সত্যকে গ্রহণকারী হয় তারা তা শুনে জেনে নেয় যে, তা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে এসেছে। আর যারা মানে না তারা তা শুনে বলতে থাকে এমন কিছুর সাথে আল্লাহর কী সম্পর্ক বা তার কী প্রয়োজন? এভাবে আল্লাহ তায়ালা একই বিষয়বস্তু দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করে থাকেন আবার অনেককে সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা: আল-বাকারা– ২৬)

হজরত জুননূন মিসরির অভিমত

এই ব্যাপারে হজরত জুননূন মিসরি (র) বলেন:

আল্লাহর পক্ষ হতে সামা বান্দার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তা হৃদয়কে সত্যের প্রতি পরিচালিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যের জন্য তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে সে সৎ পথপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যে নফসের বাসনাকে পূর্ণ করার ইচ্ছা করে সে বেদীনীর পথের পথিক হয়।

হজরত আবু বকর শিবলীর অভিমত

তিনি বলেন যেই ব্যক্তির আপাদমস্তক আল্লাহর পথে নিমজ্জিত নয় তার জন্য সামা বিপজ্জনক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হজরত আবু আলী রুদবারী (র)

তাঁর নিকট কোন এক ব্যক্তি রাগ রাগিনী শোনার ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন: আফসোস! আমি যদি তা হতে মুক্তি পেতাম। তাই সুফিদের একটি সম্প্রদায় বিপদে পড়তে যাতে না হয় সে কারণে তাদের মুরিদদের সামা শুনতে নিষেধ করেন।

হজরত জোনায়েদ বাগদাদি (র)

হজরত জোনায়েদ (র) উপদেশ হিসেবে তার এক মুরিদকে বললেন: যদি তুমি তোমার ধর্মকে নিরাপদ রাখতে চাও এবং স্বীয় তওবাতে সুদৃঢ় থাকতে চাও তাহলে সুফিদের সামায় কখনও শরীক হবে না। যতদিন তুমি যুবক থাক ততদিন তুমি নিজকে সামা শোনার উপযুক্ত মনে করবে না এবং তাকে ঘৃণা করবে। অবশ্য যখন বৃদ্ধ হবে তখন কোন অযথা কাজ করবে না। সামা যুবকদের জন্য বিপদ এবং বৃদ্ধদের জন্য অনর্থক কাজ।

সতর্ক সুফিদের নীতি

নীতিবান ও সতর্ক সুফিগণ বলেন: যখন জনসাধারণের জন্য সামা বিপজ্জনক আমরা শুনলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস খারাপ হয় এবং আমাদের দেখাদেখি তারা অহেতুক কাজে লিপ্ত হয় তখন জনসাধারণের প্রতি খেয়াল করেই সামা থেকে আমাদের বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ, মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ -

"মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অহেতুক বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করা।"

অর্থাৎ পাপ ও অন্যায় কাজই সে পরিত্যাগ করুক এটাই নয় বরং যে কাজে কোন উপকার নেই তাও পরিবর্তন করতে হবে। তথাপি গান সম্বন্ধে এটাও বর্ণিত আছে যে–

১. দাসীদের দ্বারা গান করানোর জন্য মহানবি ﷺ হজরত হাসান ইবনে ছাবেতকে ধমকি দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।
২. গান করার জন্য হজরত ওমর (রা) সাহাবাদের কোড়া মারতেন।
৩. হজরত মুআবিয়া (রা)-এর প্রতি হজরত আলী (রা) এর অভিযোগসমূহের মধ্য হতে একটি অভিযোগ এটাও ছিল যে তিনি দাসীদের গান শুনতেন।
৪. হজরত আলী (রা) পুত্র হজরত হাসান (রা)-কে হাবসী বাঁদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করে বলেছিলেন, সে তো শয়তানের সঙ্গিনী।

অজদ

وجد-অজদ এর অর্থ পাওয়া, চিন্তিত হওয়া এবং মালামাল হওয়া। অর্থাৎ বান্দার এই অবস্থা যে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার আনন্দে কিংবা অভীষ্ট বস্তুর চিন্তায় আত্মহারা হওয়া। যদিও জনসাধারণ অজদকে উন্নত মান এবং বেলায়েতের চিহ্নস্বরূপ মনে করে তদুপরি বুযুর্গগণ জ্ঞানরত অবস্থা থাকাকেই শ্রেষ্ঠতম মনে করেন। কারণ, অজদ এর অবস্থায় লোক বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে এবং জ্ঞানরত অবস্থায় নিরাপদ থাকে। তালেবকে সর্ব অবস্থায় শরীয়ত ও এলমের অনুসারী থাকতে হবে। কিন্তু অজদের হালতে সে শরীয়তের সীমারেখার বাইরে থাকে। এই অবস্থায় সে মাস্তির হালতে থাকে। যখন হাল এলমের বিপরীতে জয়ী হয় তখন বান্দা আল্লাহর

সীমারেখা হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। জ্ঞানরত অবস্থায় সে আদেশ-নিষেধের আশ্রয়ে থাকে।

কাপড় ছেঁড়া

কাপড় ছেঁড়া সুফিদের একটি সম্প্রদায়ের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বড় বড় মজলিসে যেখানে বড় বড় বুযুর্গদের আগমন হয় সেখানে তো প্রথায় প্রচলিত হয়ে গেছে। অথচ আলেম সম্প্রদায় এটাকে নাজায়েয বলেছেন।

মূলত কাপড় ছেঁড়া তরিকার কোন কিছুই নয়। সামার সুস্থাবস্থায় কখনও এরূপ করা নিষেধ। কারণ এটা অহেতুক কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অবশ্য সামা শ্রবণকারী যদি বেকাবু অবস্থায় এরূপ কিছু করে তবে তাকে মাজুর মনে করতে হবে।

সামার আদব

সামার আদব ও শর্ত–

১. সামার সময় মানুষের প্রবৃত্তি কেবল খেল-তামাশার প্রতিই অনাসক্তি থাকবে না বরং তাকে ঘৃণা করবে। অর্থাৎ অন্তরকে কোমল করার এবং আত্মাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যেই সামা শোনার নিয়ত করবে।

২. উক্ত নিয়ত ছাড়া কখনও সামার মজলিসে যোগদান করবে না।

৩. সামার সময় অবশ্য পীরকে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

৪. সামার মজলিশে সাধারণ ব্যক্তি থাকতে পারবে না।

৫. গায়কের সামার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকতে হবে।

৬. কোন প্রকার বানোয়াটী থাকতে পারবে না। সকল কাজ হতে একাগ্রতার পরই সামার মজলিশে বসবে।

৭. যুবকদের সামার মজলিসে রাখবে না যাতে জাহেল সুফিগণ তাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে অকর্ম করার সুযোগ না পেতে পারে।

৮. প্রথম স্তরের মুরিদদের সামার অংশগ্রহণ করতে দিবে না।

৯. গায়ক ভালো-মন্দ যাই গায় তজ্জন্য তাকে বাহবা দিতে কিংবা মন্দ বলতে পারবে না। সবকিছু আল্লাহকে সোপর্দ করবে। অন্য কারও সামার মজলিশে অনধিকার প্রবেশ করবে না।

১০. অজদ ছাড়া সামার যে কোন অবস্থার সৃষ্টিই হোক না কেন তা দূর করার চেষ্টা করবে না। অপরদিকে কোন প্রকার বানোয়াটের (লোক দেখানো ওয়াজদের) আশ্রয় গ্রহণ করবে না। অতিব পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল কিছু ব্যক্তিবর্গ মিথ্যা ওয়াজদের আশ্রয় নিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য ও বুযুর্গী যাহির করার চেষ্টা করে– যা কিনা জঘন্য অপরাধ ও বরবাদির লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা এ থেকে আমাদের হেফাজত করুন– আমীন ॥

সমাপ্ত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক– সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী প্রণীত ও অনূদীত আরো কিছু মূল্যবান বই সংগ্রহ করুন:

- মা'রেফাতের গোপন ভেদ
- সিরাতুল মোস্তাকিম
- কোরআন-হাদীসের আলোকে কেয়ামত অতিনিকটবর্তী
- ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- মিশকাতুল আনওয়ার –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- সৃষ্টির রহস্য –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- সিররুল আসরার –মূল: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ –মূল: আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (র)
- আল-কওলুল জামিল –মূল: শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)
- ফয়সালায়ে হাফতে মাশয়ালা –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- জিয়াউল কুলুব –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- জা-আল হক্ব –মূল: হজরত মুফতী আহমাদ ইয়ারখান নঈমী (র)

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞

"তাদের পা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে তারা দুনিয়ায় কী উপার্জন করেছে।"
(সূরা: ইয়াসীন- ৬৫)

দরবেশদের কর্তব্য চলার সময় ঘুরাফেরা করতে এবং এদিক সেদিক লক্ষ করা থেকে বিরত থাকা। অন্যান্য লোকের সাথে গমন করলে আগে চলা হতে বিরত থাকবে। কারণ এতে আত্মগর্ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পেছনে চলা এবং বানোয়াট বিনয়তা প্রকাশ করবে না। কারণ এটাও এক প্রকার গর্ব। সাধারণ লোকের ন্যায় চলাফেরা করবে। পথ চলাকালীন ময়লা বা অপবিত্র বস্তু যেন জুতায় না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবে।

কয়েকজনের সাথে চললে পথিমধ্যে কারও সাথে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলবে না এবং নিজের জন্য অপরকে অপেক্ষমান রাখবে না। দ্রুতবেগে চলবে না। কারণ এটা লোভীদের অভ্যাস। আর খুব আস্তেও চলবে না। এটা গর্বিত লোকের চলন। মধ্য গতিতে চলাফেরা করবে।

নিদ্রার আদব

নিদ্রা যাওয়া সম্পর্কে শায়েখদের মতবিরোধ:

নিদ্রা যাওয়া সম্পর্কে শায়েখদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। একটি দলের মতে ঘুমে অত্যন্ত কাতর না হওয়া পর্যন্ত মুরিদের জন্য নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয়। শিবলী (র) বলেন: আল্লাহ তায়ালা আমাকে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রা যায় সে অলস হয় আর যে অলস হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়।

হজরত আলী ইবনে সহল (র) বলেন, যে নিদ্রা যায় তাকে অলসতায় পায়। কাজেই প্রেমিকের কর্তব্য দিবারাত্র কোন সময়ই নিদ্রা না যাওয়া। কারণ তন্দ্রাভিভূত হলেই তার উদ্দেশ্য তার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা হজরত দাউদ (আ)-কে ওহি পাঠালেন, হে দাউদ! যে ব্যক্তি আমার মহব্বতের দাবি করে এবং রাত আগমন করলে নিদ্রিত হয়ে পড়ে সে তার দাবিতে মিথ্যুক।

অপর দিকে অন্য সম্প্রদায়ের মতে জাগ্রত থাকার চেয়ে নিদ্রা যাওয়া মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাকে বান্দার জন্য আল্লাহর দান মনে করে। হজরত জোনায়েদ (র) বলেন, জাগ্রত থাকা আল্লাহর পথে আমাদের বিষয় আর নিদ্রিত হওয়া আমাদের জন্য আল্লাহর কাজ। যে কাজ আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা আমাদের ইচ্ছাধীন কাজের চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়।

হজরত জোনায়েদ (র) বলেন: নিদ্রা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে দান। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: পাপী লোকের নিদ্রিত হওয়া অপেক্ষা অধিক চিন্তিত হওয়ার বিষয় শয়তানের নিকট আর কিছুই নেই। শয়তান বলে, এই ব্যক্তি কখন জাগ্রত হবে আর আল্লাহর নাফরমানী করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ ধরে শয়তান তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে।

মহানবি ﷺ এরশাদ করেছেন:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَنْتَبِهَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ -

"তিন ধরনের লোক যাদের আমলনামা লেখা হতে কলম বিরত রাখা হয়েছে। প্রথম নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়। দ্বিতীয় শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। তৃতীয় উন্মাদ যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্থ না হয়।"

সঠিক সিদ্ধান্ত

মোট কথা ফরজ, ওয়াজিব এবং স্বীয় দায়িত্বকে অবহেলা করে নিদ্রা যাওয়া যেমন ভুল তেমনি জোর জবরদস্তি করে নিদ্রাকে ঠেকিয়ে রাখাও ভুল।

যেমন হজরত শিবলী (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রাতে লবণ মিশ্রিত এক পেয়ালা পানি নিজের নিকট রাখতেন। নিদ্রা আসলে সেই পানি দিয়ে চোখ ধৌত করতেন। ফলে নিদ্রা দূর হয়ে যেত। কিন্তু মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করাই আল্লাহর শরীয়তের নিয়ম।